— কর্ম্মযোগী —

অবিনাশচন্দ্র সেন

তীরের সন্ধান তোর পড়ে থাক তীরে
তাকাস্‌নে ফিরে।
সম্মুখের বাণী—
নিক্‌ তোরে টানি
মহা স্রোতে
পশ্চাতের কোলাহল হ'তে
অতল আঁধারে অকূল আলোতে।

—রবীন্দ্রনাথ

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

মূল্য চারি টাকা

৩৭এ, মহানির্ব্বাণ রোড হইতে শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত কালিকা প্রেস লিঃ ২৫, ডি. এল. রায় ষ্ট্রীট হইতে শ্রীশশধর চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

অবিনাশচন্দ্রের

সহধর্ম্মিণী—শ্রীযুক্তা গিরিবালা দেবী

ও

তাঁহার পুত্রকন্যাগণের হস্তে—এই গ্রন্থখানি

শ্রদ্ধার সহিত উপহৃত হইল

নিবেদন

এমার্সনের একটি কথা আছে: "Every true man is a Cause, a Country and age." —কথাটি কর্ম্মযোগী অবিনাশচন্দ্র সেন মহাশয়ের সম্বন্ধে অনায়াসেই গ্রহণ করা যাইতে পারে। মানুষ নানাভাবে আপনার প্রতিভার বিকাশ করিয়া থাকে,—কেহ—সাহিত্যে, কেহ ধর্ম্মে ও সমাজে, কেহ রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে—অবিনাশচন্দ্রের প্রতিভা পূর্ণ বিকশিত হইয়াছিল—কর্ম্মক্ষেত্রে ব্যবসায় ও বাণিজ্যে। মানুষ জীবনে শত বাধা বিঘ্ন জয় করিয়া কিভাবে সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারে—অবিনাশচন্দ্রের জীবন তাঁহার আদর্শস্থানীয়।

আমাদের দেশে এই শ্রেণীর কর্ম্মযোগীদের জীবনী সম্বন্ধে কেহ বড় একটা আলোচনা করেন না, কিন্তু এই সকল কর্ম্মবীরেরাই জাতির পথপ্রদর্শকরূপে সর্ব্বদা সম্মানিত হইয়া থাকেন। কে ভুলিতে পারে—স্বনামধন্য স্যার রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, বটকৃষ্ণ পাল, কুমিল্লার স্বনামখ্যাত মহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, ইণ্ডিয়ান প্রেসের প্রতিষ্ঠাতা চিন্তামণি ঘোষ মহাশয়ের নাম! বাঙ্গালাদেশে এইরূপ বহু প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তি আছেন, যাঁহাদের জীবনাদর্শ আমাদের ভবিষ্যদ্বংশীয়গণের নিকট কর্ত্তব্যের পথ প্রদর্শন করিয়া দিবে।

আমরা এই গ্রন্থে অবিনাশচন্দ্রের জীবনকথা আলোচনা করিতে গিয়া প্রসঙ্গতঃ সেকালের বাঙ্গালার সমাজ, শিক্ষা, সাহিত্য প্রভৃতি নানা বিষয়েরই আলোচনা করিয়াছি। তিনি ছিলেন সেকালের একজন আদর্শ স্বামী, আদর্শ পিতা, আদর্শ গৃহী ও দানব্রত মহাপুরুষ। তিনি ছিলেন সেকালের একজন আদর্শ সামাজিক, প্রকৃত ভদ্র বিনয়ী ও সজ্জন। ছোট বড় সকলের প্রতি ছিল তাঁর স্নেহ, প্রেম ও ভালবাসা। কোনরূপ ঐশ্বর্য্যের আড়ম্বর তাঁহার ছিল না। তাঁহার

সৌজন্য ও মহাপ্রাণতা, হাস্যকৌতুক ও আনন্দময় প্রফুল্ল মুখশ্রী সকলকে সাদরে আহ্বান করিত। আমার ব্যক্তিগত জীবনে তাঁহার যে স্নেহ ও ভালবাসা লাভ করিয়াছিলাম, সেকথা স্মরণ করিলে শুধু এই কথা মনে হয়, এই শ্রেণীর মানুষদের আমরা চিরদিনের জন্য হারাইতে বসিয়াছি। মৃত্যু তাঁহাকে যে অমর লোকে লইয়া গিয়াছে, সেখান হইতে তাঁহার শুভ আশীর্ব্বাদ অমৃতের ধারার মত তাঁহার বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন সকলের উপর বর্ষিত হইতেছে।

অবিনাশচন্দ্র এক শান্তির পরিবার রচনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সহধর্ম্মিণী শ্রীযুক্তা গিরিবালা দেবী সর্ব্বতোভাবেই ছিলেন—তাঁহার,

গৃহিণী সচিবঃ সখী মিথঃ
প্রিয় শিষ্যা ললিতে কলা বিধৌ।

এই জীবনী প্রকাশে অবিনাশচন্দ্রের পত্নী, পুত্র ও কন্যাগণ সকলেই আমাকে নানা ভাবে সাহায্য করিয়াছেন, এজন্য তাঁহাদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি!

আমরা আশা করি, কর্ম্মযোগী অবিনাশচন্দ্রের এই জীবনী পাঠ করিয়া আমাদের দেশের তরুণ সম্প্রদায় জীবনের প্রথম যাত্রাপথে নূতন আলোর সন্ধান পাইবেন। জীবন নশ্বর—কীর্ত্তি অবিনশ্বর। অবিনাশচন্দ্র তাঁহার নামের সার্থকতা রাখিয়া গিয়াছেন তাঁহার অবিনাশী কীর্ত্তি দ্বারা। বাঙ্গালী তরুণেরা যদি অনিশচন্দ্রের জীবনের আদর্শ, শিক্ষা, সংযম, অধ্যবসায়কে আশ্রয় করিয়া বাঙ্গালার গৌরব ও যশঃ অর্জ্জন করিতে পারে, তবেই স্বাধীন ভারতে কর্ম্মযোগী অবিনাশচন্দ্রের জীবনী প্রকাশের সার্থকতা অনুভব করিব।

কলিকাতা,
ফাল্গুন, ১৩৫৫ সাল

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়

দ্বিতীয় অধ্যায়

তৃতীয় অধ্যায়

চতুর্থ অধ্যায়

বিষয় পৃষ্ঠ

পশ্চাতে দণ্ডায়মান (বাম হইতে) শচীন্দ্রনাথ (কনিষ্ঠ জামাতা), ইন্দ্রনাথ (পঞ্চম জামাতা), অবনীবন্ধু (তৃতীয় জামাতা), শচীন্দ্রকুমার (দ্বিতীয় জামাতা), দুর্গামোহন (•ভ্রাতা), অনুপম (কনিষ্ঠ পুত্র), অমিয়কুমার (জ্যেষ্ঠ পুত্র), প্রবোধকুমার (দ্বিতীয় পুত্র), অনিলকুমার (তৃতীয় পুত্র)। উপবিষ্ট —রেণু (কনিষ্ঠা কন্যা), প্রতিমা (পঞ্চম কন্যা), সুষমা (তৃতীয়া কন্যা), নীলিমা (দ্বিতীয়া কন্যা), অবিনাশচন্দ্র সেন, গিরিবালা সেন (পত্নী), বাসন্তী (জ্যেষ্ঠা পুত্রবধূ), শোভনা (দ্বিতীয়া পুত্রবধূ), স্বর্গত ভারতী (তৃতীয়া পুত্রবধূ)। নীচে উপবিষ্ট —নাতি-নাতিনী সকল

কর্ম্মযোগী

অবিনাশচন্দ্র সেন

প্রথম অধ্যায়

জন্ম—বংশ ও পূর্ব্বপুরুষদিগের পরিচয়

পৃথিবীতে মানুষ আপনার কৃতিত্ব ও প্রতিভার দ্বারাই আপনাকে স্মরণীয় করিয়া রাখে। কবি বলিয়াছেন :—"Man is his own star," প্রত্যেক মানুষ নিজেই হইতেছে তাঁহার আপনার ভাগ্যনিয়ন্তা। নদী যেমন অবিশ্রান্তভাবে বহিয়া চলে, বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই, সাগরেই তাহার পরিণতি সেখানেই আপনাকে সে মিলাইয়া দেয়। মানুষের জীবনও ঠিক্ নদীরই মত তেমনি ভাবে বহিয়া চলিয়া অবশেষে মৃত্যুরূপী মহা-সমুদ্রে আপনাকে বিলীন করে। নদীর স্রোতোধারা যেমন উষর ভূমিকে সরস ও সুন্দর শ্যামল-শ্রীতে শোভন করিয়া আপনার স্রোতো-ধারার সার্থকতা করে, মানুষ তাহার জীবনেও নানারূপে আপনাকে জনসাধারণের, প্রিয়-পরিজনের এবং স্বদেশের কল্যাণ-সাধনা করিয়া সার্থকতা লাভ করে। এইরূপ মানুষ

যাঁহারা, তাঁহাদিগকেই আমরা গৌরবের সহিত স্মরণ করি। এইরূপ কৃতী ও মনস্বী পুরুষ ও নারী সৌরভময় কুসুমের ন্যায় সমাজের শীর্ষস্থানেই অবস্থান করেন। এই শ্রেণীর মানুষদের জন্মে দেশ ধন্য হয়, সমাজ ধন্য হয়, কুল পবিত্র হয় এবং প্রিয় পরিজনও আনন্দে ও গৌরবে তাঁহাদের নাম স্মরণ করিয়া ধন্য হন।

প্রত্যেক মানুষের কর্ম্মকেন্দ্র বিভিন্নরূপ। কেহ কবি, কেহ কর্ম্মী, কেহ শিল্পী, কেহ জনসেবক, কেহ বাগ্মী, কেহ সাহিত্যিক। বিধাতা কাহারও হাতে তুলিয়া দেন—বাঁশী, কাহারও হাতে তুলিয়া দেন—কর্ম্মের পশরা। সকল মানুষের কামনা ও আকাঙ্ক্ষা একরূপ হয় না। এখানেই সৃষ্টির বৈচিত্র্য, স্বভাবের বৈচিত্র্য ও বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। কবি রবীন্দ্র-নাথ—অতি তরুণ বয়সেই লিখিয়াছিলেন :—

'কবি হোয়ে জন্মেছি ধরায়,
ভালবাসি আপনা ভুলিয়া,
গান গাহি হৃদয় খুলিয়া,
ভক্তি করি পৃথিবীর মত,
স্নেহ করি আকাশের প্রায়।'

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার জীবনের শৈশব-স্বপ্ন সার্থক করিয়া বিশ্ব-কবি নামে আপনাকে অমর করিয়া গিয়াছেন। সেইরূপ প্রত্যেক মানুষই জীবনের একটা আদর্শ ও লক্ষ্যপথ নির্দ্দেশ করিয়া পথ চলেন। রবীন্দ্রনাথের কথা দৃষ্টান্ত-স্বরূপ উল্লেখ করিলাম।

আমরা যাঁহার জীবন-চরিত আলোচনা করিতে যাইতেছি—সেই কর্ম্মবীর, উৎসাহী ও দেশহিতৈষী অবিনাশচন্দ্র জন্মগ্রহণ

করিয়াছিলেন—ভিন্ন আদর্শে—ভিন্ন ভাবে স্বদেশ ও স্বজাতির কল্যাণ কামনা লইয়া; ভিন্ন পথ আশ্রয় করিয়া। ব্যবসায়-বাণিজ্য-ক্ষেত্রে অনন্যসাধারণ প্রতিভা লইয়া, তিনি সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া গিয়াছেন। যে ত্রিপুরা জেলায় মহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের ন্যায় একজন কর্ম্মবীরের জন্ম হইয়াছিল, অবিনাশচন্দ্র ও সেই ত্রিপুরা জেলায়ই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

অবিনাশচন্দ্রের সম্বন্ধে কোনও কথা বলিবার পূর্ব্বে তিনি যে বংশে, যে পরিবারে ও যে পল্লীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তৎসম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা আবশ্যক। নোয়াখালি সহরে

জন্ম ও বংশপরিচয়

১৮ই সেপ্টেম্বর, ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে অবিনাশচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। পিতা কৃষ্ণমোহন তথাকার মুন্সেফকোর্টের নাজির ছিলেন। কৃষ্ণমোহনের কথা বলিবার আগে আমরা অবিনাশচন্দ্রের প্রিয় বাসপল্লী চুণ্টা গ্রামের কথা ও তাঁহার পূর্ব্ব পুরুষগণের পরিচয় দিব।

চুণ্টা, ত্রিপুরা জেলার অন্তর্গত একটি প্রসিদ্ধ পল্লী। গ্রামটি মেঘনা নদীর তীরবর্ত্তী ও সরাইল থানার অন্তর্ভুক্ত।

চুণ্টা পল্লী ও সেন-বংশের কথা

মেঘনা নদীর পূর্ব্ব পারে আজবপুর নামক একটি ষ্টীমার ষ্টেশন আছে। এই ষ্টেশনের দেড় মাইল উত্তর-পূর্ব্বে এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়া সহরের ১১ মাইল উত্তরে চুণ্টা গ্রাম অবস্থিত। চুণ্টা গ্রাম সরাইল পরগণার অন্তর্গত। বর্ত্তমানে সরাইল পরগণা ত্রিপুরা জিলাভুক্ত। পূর্ব্বে এই পরগণা কখনও শ্রীহট্ট জিলা, কখন ঢাকা জিলা এবং কখন বা ময়মনসিংহ জিলার অন্তর্গত ছিল।

এক সময়ে ঢাকা জালালপুর ও ঢাকা সদর এই দুইটি ভাগে

ঢাকা জিলা বিভক্ত ছিল। জালালপুর ঢাকা, ফরিদপুরের অন্তর্গত একটি বৃহৎ পরগণার নাম। ফরিদপুর তখন ঢাকা জালালপুরের অন্তর্গত ছিল। ঢাকা ও জালালপুর পরে একাঙ্গীভূত হয়। [Reg. 5. of 1 8 5 3]। সে সময়ে

বৃহত্তর ঢাকা

ঢাকাতে দুইটি দেওয়ানি-আদালত ছিল। একটিতে ঢাকা জালালপুর সংক্রান্ত সমুদয় বিষয়ের বিচার চলিত অপরটি ছিল শুধু ঢাকা সদরের (For the city of Dacca) জন্য। ১৮১২ খৃষ্টাব্দে ঢাকা জালালপুরের দেওয়ানি আদালতটি ফরিদপুর সহরে স্থানান্তরিত হয়। [Bengal Administration Report for 1872-73 Page 45) কাজেই আমরা দেখিতে পাইতেছি যে এক সময়ে ঢাকা বিভাগ, ঢাকা জেলা, শ্রীহট্ট, আটিয়া, কাগমারী, বরবাজু, ফরিদপুর ও বাকরগঞ্জ সহ এক বৃহত্তর ভূভাগ লইয়া গঠিত ছিল। যেমন এক দিন ছিল বৃহত্তর বঙ্গ, তেমনি ঢাকা জেলাও বৃহত্তর বঙ্গের অন্তর্ভুক্ত থাকিয়া এক বৃহত্তর ঢাকা বিভাগ ছিল এবং ত্রিপুরার অধিকাংশ ভূ-ভাগ ঢাকা জেলাভুক্ত ছিল।

চুণ্টার সেন-বংশের ইতিহাস লেখক স্বর্গত দক্ষিণাচরণ সেন মহাশয় তাঁহার 'চুণ্টার সেন' নামক সুলিখিত এবং প্রামাণিক গ্রন্থে চুণ্টার ভৌগোলিক পরিচয় দিতে গিয়া লিখিয়াছেন— "বর্ত্তমান চট্টগ্রাম, নওয়াখালি ও শ্রীহট্ট জিলা সকলের ভূমি, ঢাকা জিলার সোনারগাঁও এবং মহেশ্বরদি পরগণার ভূমি, পূর্ব্ব ময়মনসিংহ ও ত্রিপুরা রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। মুসলমান রাজত্ব-কালে এই সকল ভূমি, পরগণাও জিলা সকলে বিভক্ত হইয়াছিল।

মুসলমানগণ শ্রীহট্ট অধিকার করিয়া ক্রমে ময়মনসিংহ জিলার অধীন বর্ত্তমান নেত্রকোণার অন্তর্গত অধিকাংশ ভূমি, বর্ত্তমান জোয়ানসাহি, সরাইল, বেজোরা এবং তরপ পরগণা সকলের স্থান শ্রীহট্ট জিলার অন্তর্গত করিয়া শাসন করিতেছিল। ১১৬৯ অব্দে [অঃ ১৭৬২ খৃঃ অঃ] সরাইল, জোয়ানসাহি তরপ ও বেজোরা পরগণা সকল শ্রীহট্ট হইতে খারিজ ক্রমে ঢাকা জিলায় ভুক্ত করা হইয়াছিল। আবার পরবর্ত্তী কালে সরাইল, বেজোরা ও তরপ পরগণা সকল ময়মনসিংহ জিলায় ভুক্ত হয়। পুনরায় তরফ হইতে ও বেজোরা পরগণাদ্বয় শ্রীহট্ট জিলায় ভুক্ত হইয়া অদ্য পর্য্যন্ত সেই অবস্থায়ই আছে। এই বলিয়াই জোয়ানসাহি, সরাইল, বেজোরা ও তরপ পরগণার লোক মধ্যে নানা বিষয়ে সম্বন্ধ ছিল। এখনও বেজোরার পরিচয় জন্য লোকে সরাইল বেজোরা বলিয়া থাকে।"

১৭৮১ খৃষ্টাব্দে, ইংরাজ আমলে সরাইল পরগণা ব্যতীত বর্ত্তমান ত্রিপুরা জিলার স্থান সকল ও নওয়াখালি জিলার সমতলক্ষেত্র দ্বারা একটি জিলা গঠিত হইয়া তাহা "রোসনাবাদ ত্রিপুরা" আখ্যা প্রাপ্ত হয়। ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে নওয়াখালিতে একটি স্বাধীন জিলা করিয়া রোসনাবাদ ত্রিপুরা জিলার বাকী অংশ এবং ময়মনসিংহ জিলা হইতে সরাইল পরগণা খারিজ ক্রমে এই উভয় স্থান দ্বারা বর্ত্তমান ত্রিপুরা জিলা সৃষ্টি করা হয়। তদবধি সরাইল পরগণা ত্রিপুরা জিলাভুক্ত আছে এবং চুন্টাগ্রাম সরাইল পরগণার অংশ হওয়ায় তাহা এই পরগণার সঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন জিলার অন্তর্গত হইয়া এ পর্য্যন্ত ত্রিপুরা জিলাভুক্ত আছে।

চুণ্টা একটি প্রসিদ্ধ পল্লী। এ গ্রামে বিভিন্ন জাতির বাস। ব্রাহ্মণ এবং বৈদ্য সংখ্যাই বেশী। চুণ্টাতে বৈদ্য-ব্রাহ্মণ ব্যতীত, নানা গোত্রের সাধারণ ব্রাহ্মণ আছেন। বৈদ্যজাতির মধ্যে বিভিন্ন বংশের বৈদ্যগণ এ গ্রামে বাস করেন। তন্মধ্যে গুপ্ত, নন্দী ও রাজবংশ আছেন।

চুণ্টার সেনেরা এ গ্রামের প্রচীন অধিবাসী। গুপ্তগণ সেনদের বহু পরে, বিদ্যাকুট গ্রাম হইতে আসিয়া চুণ্টাতে বসতি স্থাপন করেন। কেন এবং কি অবস্থায় তাঁহারা চুণ্টায় আসেন তাহা অজ্ঞাত। ইহাদের গোত্র কাশ্যপ এবং প্রবর কাশ্যপ+অপ্সার+নৈধ্রুব। গুপ্তগণ সম্মানিত এবং সেন ও গুপ্তদের মধ্যে বৈবাহিক সম্বন্ধ আছে। গুপ্তবংশের কৃতী সন্তানগণের মধ্যে স্বর্গত ঈশানচন্দ্র গুপ্ত, তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা গিরিশচন্দ্র গুপ্ত বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। ইহারা দুই ভাই—বাঙ্গলা-নবিশ উকিল ছিলেন। ঈশানচন্দ্র কুমিল্লার জজ আদালতে ব্যবসায় করিতেন এবং গিরিশচন্দ্র ব্রাহ্মণবাড়িয়ার মুন্সেফি আদালতে ব্যবসা করিতেন। উভয়েই প্রসিদ্ধ উকীল ছিলেন।

চুণ্টার বৈদ্যগণের পরিচয়

গিরিশচন্দ্রের পুত্রগণ মধ্যে স্বর্গত অন্নদাচরণ গুপ্ত বহুকাল ডেপুটিম্যাজিষ্ট্রেটের পদে নিযুক্ত থাকিয়া সুনামের সহিত কার্য্য করেন, কয়েক বৎসর হইল ইঁহার মৃত্যু হইয়াছে। অন্নদাচরণের কনিষ্ঠ স্বর্গীয় প্যারীচরণ ত্রিপুরা জেলার ডিষ্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন। এই বংশের অন্যতম অবনীমোহন গুপ্ত বি, এল, কুমিল্লার জজ আদালতে ওকালতি

গুপ্ত, নন্দী, রাজ

করিয়া প্রসিদ্ধিলাভ করেন। গুপ্তগণ সকলেই দশ দিন অশৌচ পালন করেন।

নন্দিবংশীয় বৈদ্যেরা উর্ষিউরা হইতে আগত। তাঁহাদের গোত্র অঙ্গিরা। চুণ্টাতে মাত্র একটি নন্দী-পরিবার আছেন। এই বংশে স্বর্গত ব্রজকিশোর নন্দী প্রসিদ্ধ ছিলেন। চুণ্টা গ্রামে রাজবংশ নামে একটি বৈদ্যবংশ এক সময়ে বাস করতেন। ইঁহারা সেনদের বহু পূর্ব্বে চুণ্টা গ্রামে আসিয়া বাস করিতে থাকেন। বাঙ্গালা দেশে রাজ উপাধিক বৈদ্য বড় বিরল। বঙ্গের বাহিরে রাজ উপাধিক বৈদ্য আছে। ইহাদের গোত্র আল্যমান। এ গোত্র বৈদ্য এবং ব্রাহ্মণদের মধ্যেও দেখিতে পাওয়া যায়। রাজবংশীয়েরা রাজ উপাধি ত্যাগ করিয়া দেব উপাধি গ্রহণ করিয়াছেন এবং কায়স্থ নামে পরিচয় দিয়া থাকেন। চুণ্টা গ্রামে শূদ্র মধ্যে অনেকে রাজমিস্ত্রীর কাজ করেন, এই কারণে তাঁহাদের রাজ বলা হয়। বৈদ্যরাজগণ কি কারণে রাজ উপাধি পরিত্যাগ করিয়া দেব উপাধি গ্রহণ করিয়াছেন তাহা বলা যায় না। তাহাদের বাসপল্লী রাজহাটি নামে খ্যাত।

সরাইল উত্তর ত্রিপুরার অন্তর্ভুক্ত। ত্রিপুরা জেলার ত্রিপুরা সদর, উত্তর ত্রিপুরা, বরদাখাত, নুরনগর, সরাইল, প্রভৃতি পরগণার বিভিন্ন পল্লীতে বিভিন্ন বৈদ্য গোত্র বংশ ও উপাধির বৈদ্যগণের বাস। চুণ্টার সেনবংশ এই বিভিন্ন বংশের, গোত্রের বৈদ্যগণ মধ্যে নানারূপে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া আসিতেছেন।

চুণ্টার সেনবংশ শক্তি গোত্রজ এবং বঙ্গদেশের সিদ্ধ অর্থে শ্রেষ্ঠ বৈদ্য। বঙ্গীয় বৈদ্যদিগের কুলপঞ্জিকা প্রণেতা রামকান্ত

দাশ কবিকণ্ঠহার ১৬৫৩ খৃষ্টাব্দে তাঁহার সদ্বৈদ্য-কুলপঞ্জিকায় বৈদ্যদিগের গোত্রের বিষয় আলোচনা করিয়া, সিদ্ধ বৈদ্য বলিতে কোন কোন্ বংশ, গোত্র ও প্রবরের বৈদ্যদিগকে, সিদ্ধ বৈদ্য বলা হয়, তাহার পরিচয় দিয়াছেন।

"কণ্ঠহার" মতে বৈদ্যদিগের গোত্র দ্বাবিংশতি। তন্মধ্যে—
"শক্তি কাশ্যপ মৌদ্গল্য ধন্বন্তরি কুলোদ্ভবাঃ।
বৈদ্যাঃ কুলীনাঃ সিদ্ধাঃ স্যুঃ তদন্যে সাধ্যম্সিংজ্ঞিতাঃ॥
সেনো দাশশ্চ গুপ্তশ্চ সিদ্ধিনাং পদ্ধতিঃ স্মৃতাঃ॥
শক্তি ধন্বন্তরি সেনৌ মৌদগল্যো দাশ পদ্ধতিঃ
কাশ্যপস্তু ভবেয়দ্ গুপ্ত ইতি সিদ্ধ নিরূপণম্॥"

ইহার ভাবার্থ, শক্তি, কাশ্যপ, মৌদ্গল্য এবং ধন্বন্তরি গোত্রীয় বৈদ্যগণ কুলীন। কুলীনদিগের অপর নাম সিদ্ধ। তদ্ভিন্ন অন্য বৈদ্যগণ সাধ্য সংজ্ঞক। সিদ্ধবৈদ্যদিগের পদ্ধতি সেন। মৌদ্গল্য গোত্রের পদ্ধতি দাশ। কাশ্যপ গোত্রের পদ্ধতি গুপ্ত। ইহারা সিদ্ধ বৈদ্য নামে সমাজে পরিচিত ও সম্মানিত। মহামহোপাধ্যায় ভরতমল্লিক ১৬৭৫ খৃষ্টাব্দে একখানি রাঢ়ীয় বৈদ্যকুল পঞ্জিকা লেখেন তাঁহার মতে বৈদ্যদিগের গোত্র পঞ্চাশটি। সেনের গোত্র ৮ ধন্বন্তরি, শক্তি, বৈশ্বানর, আদ্য, মৌদ্গল্য, কৌশিক, কৃষ্ণাত্রেয় এবং আঙ্গিরস। শক্তিগোত্রের সেনের তিন প্রবর—শক্তি, পরাশর, বশিষ্ঠ। বশিষ্ঠের পুত্র মহর্ষি শক্তি, শক্তির পুত্র মহর্ষি সেন ও মহর্ষি পরাশর প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। সেনের বংশধরগণ সেন, শক্তি, বশিষ্ঠ ও পরাশরের এই বলিয়াই তাহারা পরিচয় দিতে গৌরবান্বিত বোধ করে।

চূড়ার সেনবংশ
সদ্বৈদ্য কুলপঞ্জিকা
ও চন্দ্রপ্রভা

পূর্ব্ব রীতিমতে সেনের নাম বীজিপুরুষস্বরূপ, শক্তির নাম গোত্র বা আদি পুরুষ স্বরূপ এবং প্রবর বা বংশের বিখ্যাত লোকস্বরূপ শক্তি, বশিষ্ঠ ও পরাশরের নাম উল্লেখ করিয়া থাকে। বঙ্গদেশে শক্তি গোত্রের ব্রাহ্মণ বা কায়স্থ দেখা যায় না। সেদিক্ দিয়া শক্তি গোত্রীয় সেন বংশীয় বৈদ্যগণের একটা বিশেষত্ব আছে।

চুণ্টার সেনবংশের আদিপুরুষ সূর্য্যদাস সেন মাধবের বংশধর। শক্তি কুশলী মাধবের ধারা বিখ্যাত ও পরিচিত বংশ। শক্তি গোত্রের ধোয়ি সেন যিনি হুহিনামে খ্যাত, তিনি লক্ষ্মণ সেনের রাজসভায় একজন প্রধান সভাসদ ছিলেন। লক্ষ্মণ সেন যেমন পরাক্রমশালী নৃপতি ছিলেন, তেমনি তিনি গুণগ্রাহী এবং বিদ্যানুরাগী ব্যক্তি ছিলেন। মহারাজা লক্ষ্মণসেন নিজে সুপণ্ডিত ও কবি ছিলেন। তাঁহার সভার গৌরব বর্দ্ধন করিয়াছিলেন, গোবর্দ্ধন, শরণ, জয়দেব, উমাপতি, ধোয়ি এই পঞ্চরত্ন। রূপ সনাতন লক্ষ্মণসেনের সভামণ্ডপ দ্বারে খোদিত দেখিয়াছিলেন—

"গোবর্দ্ধনশ্চ শরণো জয়দেব উমাপতি :।
কবিরাজশ্চ রত্নানি পঞ্চৈতে লক্ষ্মণস্য চ।"

শ্রুতিধরো ধোয়ি, কবিরাজ নামে পরিচিত ছিলেন। শক্তি গোত্রের ধোয়ি সেন রাঢ়দেশের হামুরিয়া গ্রামে বাস করিতেন। তাঁহার পুত্রগণ মধ্যে কাশী রাঢ় দেশেই স্থিত ছিলেন এবং পূর্ব্ববঙ্গে বা বঙ্গদেশে স্থিত কুলীনের সম্মান ভোগ করিয়াছিলেন। কুশলীর পুত্র মাধব ও কুলীনরূপে সম্মানিত

চুণ্টার সেনেদের আদিপুরুষ

ছিলেন। মাধবের সম্মান হেতু, তাঁহার পরবর্ত্তীগণ এখনও পূর্ব্ববঙ্গের বৈদ্যসমাজে কুলীন বলিয়া সম্মানিত হইয়া আসিতেছেন।

চুণ্টার সেন বংশীয়েরা মাধবের বংশধর। এজন্যই চুণ্টার সেনগণ পরিচয় দিবার সময় আপনাদের পরিচয়ার্থ দুবছি এবং মাধবের নাম উল্লেখ করেন। চুণ্টার সেনগণ নিজ সমাজে কুলীন বলিয়া সম্মানিত।

সূর্য্যদাস সেন এদেশে আসিয়া প্রথমতঃ চুণ্টার উত্তর-পশ্চিম-কোণে তিন মাইল দূরে এক অনাবাদি স্থানে বাসস্থান নির্ম্মাণ করেন। বর্ত্তমান সময়ে ঐ স্থান ভুই সহর ও ব্রাহ্মণ গ্রাম নামে খ্যাত। এই দুইটি গ্রাম পাশাপাশি স্থিত এবং দেখিতে এক গ্রামই দেখা যায়। ভুই সহর গ্রামে সেনের পুকুর নামে একটি অতি প্রাচীন পুষ্করিণী এখনও বর্ত্তমান আছে। সম্ভবতঃ এই পুকুর সূর্য্যদাস কি তাঁহার পরবর্ত্তী কেহ খনন করাইয়া-ছিলেন। এখন সে গ্রামে সেন বংশের কেহই বাস করেন না। অনেকে অনুমান করেন, ব্রাহ্মণ গ্রামে সম্ভবতঃ সেনবংশের পুরোহিতেরা বাস করিতেন, সেজন্যই পল্লীর নাম ব্রাহ্মণ গ্রাম হইয়াছে। বর্ত্তমান সময় ঐ গ্রামে কোন ব্রাহ্মণের বাস নাই। সম্ভবতঃ সূর্য্যদাস সেনের সময় এই স্থান ত্রিপুরা রাজ্যের অন্তর্গত ছিল।

কি কারণে সূর্য্যদাস পৈত্রিক বাসস্থান পরিত্যাগ করিয়া এদেশে আসিয়াছিলেন, তাহা জানা যায় না। কিংবদন্তী এই যে তিনি এদেশে আসিবার সময় গৃহদেবতার দৈনিক পূজা কার্য্য করার জন্য সাবর্ণ্য (সাবর্ণ) গোত্রের অরুণ মিশ্র নামক পুরোহিত,

নাপিত, ধোপা এবং কয়েকজন ভাণ্ডারী সঙ্গে আনিয়াছিলেন। চুণ্টার সাবর্ণ্য গোত্রের পুরোহিতগণ এই অরুণ মিশ্রের বংশধর। তাঁহারা এখনও এই গ্রামে পুরুষানুক্রমে বাস করিতেছেন।

সেকালের পল্লী গঠনের ইতিহাসে ইহা ছিল স্বাভাবিক। এজন্যই বাঙ্গালার যে কোন পল্লীতেই প্রসিদ্ধ ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ কোন গ্রামে বসতি স্থাপন করিতে হইলেই পূজা পার্ব্বণ এবং নিত্য নৈমিত্তিক কার্য্যাদি নির্ব্বাহের জন্য ব্রাহ্মণ হইতে আরম্ভ করিয়া বিভিন্ন জাতিকে ব্রহ্মোত্তর, দেবোত্তর এবং অন্যান্য জাতি ও বর্ণ নির্বিশেষে ভূমি দান, বৃত্তি দান এবং বার্ষিক একটা বেতন নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিতেন। সূর্য্যদাস সেনও সেইরূপ ব্যবস্থাই করিয়াছিলেন।

কথিত আছে সূর্য্যদাস সেন ভোষণা নামক গ্রাম হইতে চুণ্টা গ্রামে আসেন। ভোষণা গ্রাম কোথায় ছিল সঠিক ভাবে জানা যায় নাই। কেহ কেহ ঐ গ্রাম ফরিদপুর জেলার অন্তর্ভুক্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কাজেই দেখা যাইতেছে—সূর্য্যদাস সেন পূর্ব্ববাঙ্গলার অধিবাসী ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র তৎপ্রণীত—"সীতারাম" উপন্যাসের প্রথম খণ্ডের প্রথম পরিচ্ছেদে লিখিয়াছেন—"পূর্ব্বকালে পূর্ব্ব বাঙ্গালায় ভূষণা নামে এক নগরী ছিল। এখন উহার নাম "ভূষণো"? যখন কলিকাতা নামে ক্ষুদ্র গ্রামের কুটিরবাসীরা বাঘের ভয়ে রাত্রে বাহির হইতে পারিত না, তখন সেই ভূষণায় একজন ফৌজদার বাস করিতেন। ফৌজদারেরা স্থানীয় গভর্ণর ছিলেন; এখনকার স্থানীয় গভর্ণর অপেক্ষা তাঁহাদের বেতন অনেক বেশী ছিল। সুতরাং ভূষণা স্থানীয় রাজধানী ছিল।"

সূর্য্যদাস সেনের বাসস্থান ভোষণা কি ভূষণা ভূষণো

সীতারাম রায় বাঙ্গালা দেশের একজন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার মহত্ত্ব, বীরত্ব, সাহসের পরিচয় ইতিহাস পড়িয়া আমরা জানিতে পারি। সীতারাম উচ্চ রাঢ়ীয় বংশীয় কায়স্থ ছিলেন। তিনি নিজ বীরত্ব দ্বারা মহম্মদপুর নামক স্থানে রাজধানী স্থাপন করেন। রাজা সীতারাম ৪৪ পরগণার অধীশ্বর ছিলেন বলিয়া প্রবাদ আছে। তিনি যে সময় রাজত্ব করেন, তখন নিজ রাজধানীতে দশভুজামন্দির, লক্ষ্মীনারায়ণমন্দির, কৃষ্ণমন্দির প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। সীতারাম বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত ছিলেন। সীতারামের ব্রাহ্মণ ভক্তি, দান ও মহত্ত্বের অনেক পরিচয় আমরা সেকালের বাঙ্গলার ইতিহাস হইতে জানিতে পারি। সীতারামের মৃত্যুর পরও বহুদিন পর্য্যন্ত মহম্মদপুর একটি অতি সমৃদ্ধ জনবহুল স্থান ছিল। যশোহর জেলার মধ্যে এক সময়ে এ স্থানটি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান বলিয়া বিবেচিত হইত। সরকারি বিবরণী হইতে জানিতে পারা যায়, যে এক সময়ে যশোহর জেলার কেন্দ্র স্থানটি স্থানান্তরিত করিয়া মহম্মদপুরে প্রতিষ্ঠা করা হইবে। কিন্তু সে প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হয় নাই। ১২৪৪ সালে মহম্মদপুরে এক ভীষণ মড়ক হয়—সেই মড়কে রাজধানী মহম্মদপুরের অবস্থা অতি শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইল। যাহারা বাঁচিল তাঁহারা স্থান ছাড়িল, দেখিতে দেখিতে মহম্মদপুর-ভীষণ জঙ্গলে পরিণত হইল। সীতারাম তাঁহার রাজত্বকালে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, বৈদ্য, কায়স্থ বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোক লইয়া একটি সমাজ গঠন করিয়াছিলেন। সে সমাজের নাম ছিল—'রাজ-সমাজ।' সেই রাজ-সমাজের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন বিজ্ঞ ব্রাহ্মণ, সুপণ্ডিত বৈদ্য চিকিৎসক ও বৈদ্য রাজকর্ম্মচারী। সেকালে সীতারামের নিকট

চুন্টার বাড়ী
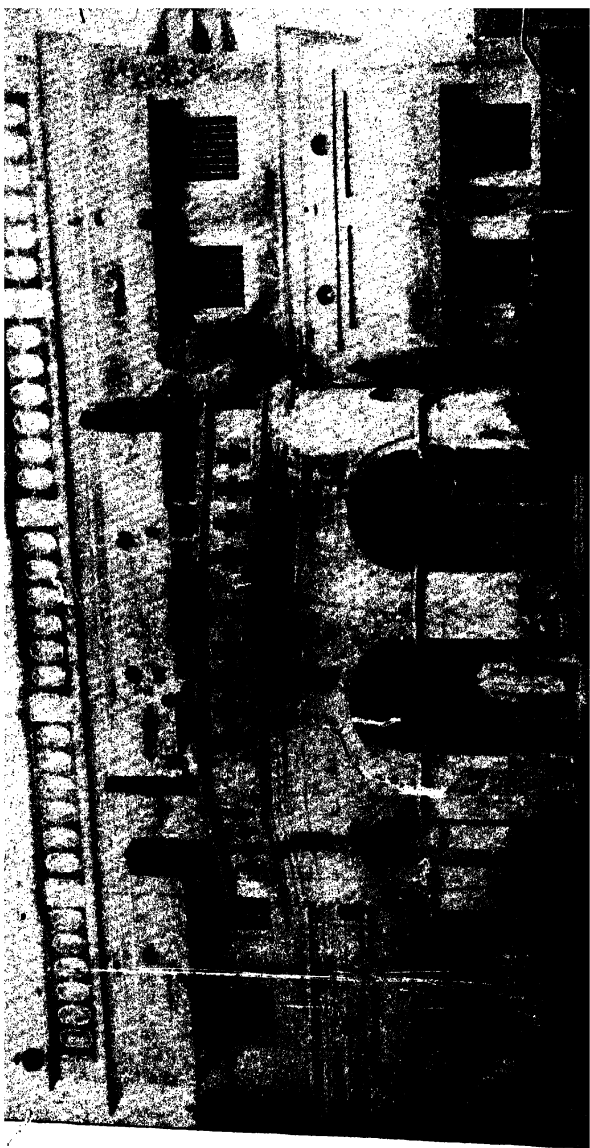
হইতে ব্রাহ্মণেরা যেমন ব্রহ্মোত্তর পাইতেন বৈদ্যও কায়স্থ সমাজের পণ্ডিতেরা ও গুণগ্রাহী রাজার নিকট হইতে তেমনি ভূমি, অর্থ এবং সর্ব্ববিষয়ে সাহায্য লাভ করিতেন।

সূর্য্যদাস সেন সম্বন্ধেও আমাদের মনে হয় পূর্ব্বে তাঁহার পূর্ব্বপুরুষেরা ভূষণো বা ভোষণাতেই সগৌরবে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, পরে যখন দেখিলেন যে ভূষণা গ্রামে বাস করা সম্ভবপর নহে, তখন ভাগ্যান্বেষণে পূর্ব্বাঞ্চলে আগমন করেন। সে সময়ে ত্রিপুরার মহারাজার বদান্যতা এবং গুণীজনের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ ও সদয় ব্যবহারের কথা সর্ব্বত্র প্রচারিত ছিল। মনে হয় যশোহর জেলায় বাস করা কোন দিক্ দিয়াই সুবিধাজনক না হওয়ায় ত্রিপুরার চুণ্টা গ্রামে আসিয়া সূর্য্যসেন বাসস্থান নির্ম্মাণ করেন।

ইতিহাসের দিক্ দিয়া বিচার করিতে গেলেও ইহাই সত্য বলিয়া মনে হয়। সীতারাম ১৭০০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৭১৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত পূর্ণ চতুর্দ্দশ বর্ষকাল সম্পূর্ণ স্বাধীন ভাবে রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর দেখিতে দেখিতে রাজ্য গেল, রাজধানী ধ্বংস হইল, লোকের বাসের অযোগ্য হইল,—এরূপ অবস্থায় সেখানে কি আর মানুষ থাকিতে পারে?—যে যেদিকে পারিল বাসস্থানের সন্ধানে ছুটিল।

একটা আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে—মহম্মদপুরে যে মড়ক দেখা দিয়াছিল, তাহার মূলে ছিল ম্যালেরিয়া। বাঙ্গালা দেশে কলেরা ও ম্যালেরিয়া নামে যে দুই ভীষণ ব্যাধি এখন পর্য্যন্তও বাঙ্গলার সুখ-শান্তি নষ্ট করিতেছে, সে দুইটির উৎপত্তি স্থান যশোহর। ১৮২৫ খৃষ্টাব্দে নলডাঙ্গায় কলেরা প্রথম দেখা দেয়

এবং ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে মহম্মদপুরে ম্যালেরিয়া উদ্ভূত হয়। এই ভীষণ ম্যালেরিয়া মড়কে মহম্মদপুর উৎসন্ন গিয়াছিল। তাহারই দরুন একটা প্রসিদ্ধ স্থান শ্মশানভূমে পরিণত হয়। ঐ সময়েই সূর্য্যদাস পূর্ব্বাঞ্চলে আসেন এইরূপ অনুমান অসঙ্গত নহে।

মুর্শিদকুলি খাঁ যখন বাঙ্গালার মসনদে আসীন ছিলেন, সেই সময়ে সীতারাম ভূষণায় অসাধারণ প্রতাপশালী জমিদার, তিনি সীতারামকে দমন করিতে চেষ্টা করেন এবং ফৌজদার বখ্‌স আলিখাঁকে প্রেরণ করেন,—অবশেষে চতুর্দ্দিক হইতে সদলবলে সীতারামের পলায়নের পথ রুদ্ধ করা হয়। বখ্‌স আলি খাঁ সীতারামকে সপরিবারে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া মুর্শিদাবাদে প্রেরণ করিলেন কিন্তু এ বিষয়ে "দেশীয় প্রবাদ এই যে, সীতারামের শাসনের জন্য নবাব মুর্শিদকুলি খাঁ—যখন আয়োজন করেন, সেই সময়ে রঘুনন্দনের পরামর্শেই জমিদারবর্গের উপর সীতারামকে অবরুদ্ধ করিবার ভার অর্পণ করা হয়। নাটোর রাজবাটীর প্রতিভাশালী নবীন কর্ম্মচারী দয়ারাম নাটোরের জমিদারী ফৌজ লইয়া পশ্চিম দ্বারে অপেক্ষা করিতেছিলেন। মেনাহাতী নামক সীতারামের এক বরবপু অমানুষিক বলশালী সেনাপতি ছিলেন। দয়ারামের নির্দ্দয় কৌশলে প্রত্যূষে কুজ্ঝটিকার সুযোগে মেনাহাতী নিহত হইলেন। সেনাপতির মৃত্যুতে সীতারাম নিরুৎসাহ হইয়া পড়িলেন। এদিকে সংগ্রামসিংহের অধীনে সৈন্যদল সীতারামের রাজ্যে প্রবেশ করিল। এইরূপে চতুর্দ্দিকে জমিদারী ও সুবাদারী সৈন্যে পরিবেষ্টিত হইয়া সীতারাম সপরিবারে বন্দী হইলেন। বীরবর সীতারাম শূলদণ্ডে প্রাণনাশের আদেশ শুনিয়া মুর্শিদাবাদ কারাগারে বিষাক্ত অঙ্গুরীয়ক চুম্বন করিয়া প্রাণ ত্যাগ করেন।"

আমাদের মনে হয় অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে সীতারামের পতনের পর কিংবা মহম্মদপুর মড়কে ধ্বংস হইয়া গেলে পর সূর্য্যদাস সেন ভূষণা হইতে ত্রিপুরা অঞ্চলে আসেন। এইরূপ অনুমান করা অসঙ্গত নহে। আমরা এখানে চুণ্টার আদি সেনবংশাবলীর পরিচয় দিতেছি।

শ্রীবৎস বা শক্তিধর সেন
|
২। পুণ্ডরীক—ত্রিপুরধরসুতা
|

৩। ধোয়ি সেন : তুহি সেন—গুপ্তবংশসুতা কন্যা—
রামগুপ্ত—কায়ু

[খৃঃ ১১০৭—১১৯৯। গৌড়পতি লক্ষ্মণসেনের নিকট হইতে ধোয়ি কবিরাজ বিনায়ক সেনের ন্যায় নানাবিধ উপহার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই বৃত্তান্ত কবিরাজ ধোয়ীসেন স্বপ্রণীত বিখ্যাত "পবনদূত" গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন :

"দন্তিব্যূহং কনকলতিকাং চামরং হেমদণ্ডং
যো গৌড়েন্দ্রাদলভত কবিক্ষ্মাভৃতাং চক্রবর্ত্তী।
শ্রীধোয়ীক সকল রসিকপ্রীতিহেতোর্ম্মনস্বী
কাব্যং সারস্বতমিব মহামন্ত্রমেতজ্জগাদ ॥]

খোয়ী সেন

এই খোয়িবংশের সূর্য্যদাস সেন ত্রিপুরা আসেন। তাহার ধারা এইরূপ—

৫। জগদানন্দ ৫। চন্দ্র ৫। নারায়ণ ৫। যদুনন্দন ৫। লক্ষ্মীনারায়ণ, অষ্টগ্রাম, জোয়ানসাহি

এই বংশধারা ক্রমশঃ বিস্তার লাভ করিয়া বিভিন্ন ধারার সৃষ্টি করিয়াছে। আমরা পরিশিষ্টে অবিনাশচন্দ্রের বংশধারার উল্লেখ করিলাম। এখানে মুলবংশের আদিধারার পরিচয় দেওয়া হইল।

চুণ্টার সেনবংশীয়েরা ছুহিসেন মাধবের ধারা। শ্রেষ্ঠ ও সিদ্ধ বৈদ্য কুলীন। শক্তি গোত্র। 'শক্তি গোত্রে ত্রয়ং প্রবরাঃ শক্তি পরাশর বশিষ্ঠকাঃ। অর্থাৎ শক্তি গোত্রে তিন প্রবর শক্তি, পরাশর, বশিষ্ঠ। (ইতি 'চন্দ্রপ্রভা') 'কুলদর্পণ' বা বৈদ্য-ব্রাহ্মণ-কুলপঞ্জিকা সংগ্রহে, শক্তি গোত্রের ছয়জন বীজি পুরুষ সম্বন্ধে লিখিত আছে যথা—শ্রীবৎস সেন, শিয়াল সেন, পুরু সেন, চন্দ্র সেন, মুণ্ডীর সেন, রায় সেন। এই বীজিপুরুষগণ হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত বংশাবলী ধারাবাহিক চলিয়া আসিতেছে। এই বীজি পুরুষগণের আবির্ভাব এক সময়ে নহে।

'কণ্ঠহারে' আছে :—

"পুণ্ডরীকাখ্যসেনস্য ছুহিসেনঃ সুতোঽভবৎ।
ধরস্য ত্রিপুরাখ্যস্য তনয়াগর্ভসম্ভবঃ॥
অপূর্ব্বপুণ্য-সন্তান-বিস্তারিতযশঃপটঃ।
বিততান বিতানানি ভুবি সোঽয়ং ছুহিস্মৃতঃ॥
কাশীচ কুশলী চৈব তস্য পুত্রৌ বভূবতুঃ।
রাঢ়ায়াং ভূষিতঃ কাশী কুশলী বঙ্গমীয়িবান্॥

কুশলী (বঙ্গদেশ)—কুশলীর পুত্র মাধব। এই মাধবের পরবর্ত্তী সূর্য্যদাস সেন যিনি ফরিদপুর জিলার অন্তর্গত ভূষণা গ্রাম হইতে আসিয়া চুণ্টা গ্রামে স্থিত হইয়াছেন। চুণ্টার সেনগণ তাঁহারই বংশধর। এ-বিষয়ই এখানে বিশদভাবে বিবৃত করিলাম।

দ্বিতীয় অধ্যায়

মানুষ কর্ম্মফল বিশ্বাসী না হইয়া পারে না, নানা কারণেই ইহা সত্য বলিয়া মানিতে হয়। আমরা দেখিতে পাই যেন কোন এক অদৃশ্য শক্তি আমাদের ভাগ্যফল নিয়ন্ত্রিত করিয়া আছেন। মনে হয়, যেমন ব্যক্তিগত জীবনে, তেমনি মানবজাতির ক্রমোন্নতি, আশা, আকাঙ্খা সব বিষয়েরই একটা নির্দ্দিষ্ট পরিণতি রহিয়াছে। 'পরকাল', 'জন্মান্তর' এ সব বিষয়ে মতভেদ থাকিলেও অভিব্যক্তির নিয়মানুসারে ও ব্যক্তি ও সমাজে চরম পরিণতির সম্ভাবনা মানিতেই হয়। অবিনাশচন্দ্রের জীবনে বিশ্বাসের বল, বিচার-বুদ্ধির অনুশাসন সেই শৈশব হইতেই দেদীপ্যমান থাকিয়া নিত্যনিয়ত তাঁহার জীবন-গতি নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে। ব্যক্তিত্ব যে সময় সময় জাতীয়তা অপেক্ষাও বহু শ্রেষ্ঠ ও মূল্যবান্ তাঁহার জীবন হইতেছে তাঁহার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। অবিনাশচন্দ্রের বাল্যজীবনে এই মহামূল্য সত্যের প্রকাশ আমরা দেখিতে পাইয়াছি।

অতি শৈশবে অবিনাশচন্দ্র মাতৃহীন হইয়াছিলেন। তাঁহার প্রথম জীবনের কাহিনী তিনি নিজে অতি করুণভাবে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন :—"আমার ন্যায় দুর্ভাগ্য অতি অল্প লোকের জীবনে হইয়া থাকে। আমার বয়স যখন দশমাস মাত্র সেই সময়ে আমি আমার স্নেহময়ী জননীকে হারাই। মাতৃস্নেহ লাভ আমার ভাগ্যে ঘটে নাই। তারপর আমার বয়স যখন বারো বৎসর সেই সময়ে আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মৃত্যু হয়। কৈশোরের এই গুরু ব্যথা ভুলিবার পূর্ব্বেই ষোল বৎসর বয়সে আমাকে পিতৃহীন

বাল্যজীবন ও প্রথম শিক্ষা

হইতে হইয়াছিল। আমার বাল্যে ও কৈশোরে, পৃথিবীতে আপনার প্রিয়জন বলিতে যাঁহাদিগকে বুঝাইয়া থাকে, তাঁহাদের সকলকেই আমি হারাইয়াছিলাম।"

অবিনাশচন্দ্রের পিতা কৃষ্ণমোহন সেন নোয়াখালি সহরে সরকারি কাজে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি তথাকার মুন্সেফ কোর্টে নাজিরের কাজ করিতেন। অবিনাশচন্দ্রের প্রাথমিক শিক্ষারম্ভ নোয়াখালি সহরেই আরম্ভ হইয়াছিল। সে সময়ে নোয়াখালি সহরে রাজকুমার টি. এন. জুবিলি নামে একটি উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় ছিল। এই বিদ্যালয়েই তাঁহার প্রথম শিক্ষা আরম্ভ হয়। এখানে অল্প কিছুদিন পড়ার পর, পিতা কৃষ্ণমোহন নোয়াখালি জেলার অন্তর্গত বেগমগঞ্জ নামক স্থানে বদলী হইলেন। পুত্র-বৎসল পিতা যাহাতে অবিনাশচন্দ্রের পড়াশুনার কোনরূপ ব্যাঘাত না জন্মে সেজন্য তাঁহাদের গ্রামনিবাসী প্রতাপচন্দ্র সেন মহাশয়ের বাসায় থাকিবার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। প্রতাপ বাবু সম্ভবতঃ সে সময়ে নোয়াখালি লোকেলবোর্ডের হেডক্লার্ক ছিলেন। তখনকার দিনে নোয়াখালি সহরে ইংরাজী-শিক্ষার দিকে সবে মাত্র সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। সেখানে যে সকল শিক্ষক ছিলেন, তাঁহাদের ছাত্রদের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য ছিল, বিদ্যাদানের সঙ্গে সঙ্গে যাহাতে চরিত্রও গঠিত হয় সেদিকে শিক্ষকেরা সর্ব্বদা যত্ন লইতেন। তারপর ছোট সহর, পরস্পরের প্রতি প্রীতি-ভালবাসা এবং হিন্দুমুসলমানগণের বিভিন্ন পরিবারের মধ্যে ছিল অক্ষুণ্ণ প্রীতি ও সৌহার্দ্দ। অবিনাশচন্দ্র দেখিতে সুন্দর ছিলেন, গৌরকান্তি, হাস্যময় মুখমণ্ডল, প্রত্যেকটি কাজে ছিল তাঁহার অদম্য উৎসাহ ও উদ্দীপনা। সে সময়ে তাঁহার

মেধাবী ছাত্র বলিয়া বেশ সুনাম ছিল। তাঁহার একটি প্রধান গুণ সেই শৈশবকাল হইতেই দেখা যাইত, সেছিল তার—পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা এবং প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি কাজ পর্য্যন্ত নিয়ম-শৃঙ্খলার দ্বারা করা। যেখানে বসিয়া পড়াশুনা করিতেন, যেখানে পুঁথিপত্র রাখিতেন সেখানে এমন নিপুণ ভাবে সাজাইয়া রাখিতেন যে সকলেই তাহা দেখিয়া তাঁহার প্রশংসা করিত। প্রতাপবাবু অনেক সময় অবিনাশ-চন্দ্রকে লক্ষ্য করিয়া স্বীয় পুত্রকন্যাগণকে বলিতেন: 'তোমরা অবিনাশের মত সব জিনিষ পত্র কি গুছিয়ে রাখতে পারো না? দেখত সে কেমন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে এবং সব জিনিষ গুছিয়ে রাখে।'

নোয়াখালির ছাত্রজীবনের মেধাবী ছাত্র-ক্রীড়া আমোদ-প্রমোদ

সে কালের স্কুলের ছাত্রদের মধ্যে দেশী ও বিদেশী উভয় রকমের খেলারই প্রচলন ছিল। ক্রিকেট খেলার প্রচলন ছিল খুব বেশী। ফুটবল খেলা তখন ততটা প্রসিদ্ধি লাভ করে নাই এবং সর্ব্বত্র তাহার প্রচারও ছিল না। নোয়াখালি সহরে স্কুলের ছাত্রদের মধ্যে ক্রিকেট খেলার প্রচলন ছিল, আর দেশী খেলার মধ্যে হাডুডু—দেড়েবাঁধা, সাঁতার, কুস্তী ইত্যাদি পুরুষোচিত ব্যায়াম ছিল প্রচলিত। অবিনাশচন্দ্র তাঁহার ছাত্রজীবনে ক্রিকেট খেলায় অনুরাগী ছিলেন এবং বেশ ভাল খেলিতে পারিতেন। দাবা খেলার প্রতিও তাঁহার অনুরাগ ছিল এবং সে-বয়সেই ভাল দাবা খেলিতে জানিতেন। আর একটা বিষয়ও তাঁহার চরিত্রের বিশেষত্ব ছিল, তিনি মিষ্টভাষী এবং কৌতুকপ্রিয় ছিলেন। তাঁহার সরস হাস্যকৌতুকে ছেলেরা তাঁহাকে বড় ভালবাসিত।

সে সময় হইতেই তাঁহার উপর যে কোন কাজের ভার পড়িত তাহা অতি নিষ্ঠার সহিত সম্পন্ন করিতেন। পিতার মৃত্যুর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তিনি নোয়াখালিতে পড়াশুনা করিয়াছিলেন। সে-সময়ে আকস্মিক ভাবে তাঁহার পিতা কৃষ্ণমোহন পরলোকে চলিয়া গেলেন। তখন তাঁহার বয়স ছিল মাত্র পনেরো বৎসর।

পিতা কৃষ্ণমোহন বাঙ্গালা ১২৯২ সনের ২৮শে ফাল্গুন বৃহস্পতিবার রাত্রি নয়টার সময় বেগমগঞ্জ মহকুমায় প্রাণত্যাগ করেন। সে সময়ে তাঁহার বয়স আনুমানিক ৫৪ বৎসর মাত্র ছিল। তিনি দেখিতে ছিলেন শ্যামবর্ণ, মধ্যমাকৃতি ও বলিষ্ঠ।

পিতৃ-বিয়োগ
১২৯২-২৮শে ফাল্গুন

কৃষ্ণমোহন যখন নোয়াখালিতে ছিলেন, তখন তাঁহার বাসায় থাকিয়া অনেক বালক পড়াশুনা করিতেন, তাহাদের সর্ব্ববিধ ব্যয়ভার কৃষ্ণমোহনই বহন করিতেন। অবিনাশচন্দ্রের বড় দুই জ্যেঠামহাশয়ের ছেলেরা ও তাঁহার নিকট থাকিয়া পড়াশুনা করিতেন। তাঁহাদের নাম ছিল রাধামোহন ও হরমোহন।

অবিনাশচন্দ্রের পিতার মৃত্যুর কাহিনীটি বিচিত্র ও অলৌকিক বলা যাইতে পারে। মৃত্যুর পূর্ব্বে তাঁহার কোন পীড়া ছিল না। ২৭শে ফাল্গুন রাত্রিতে সামান্য একটু জ্বর-জ্বর অনুভব করেন। ২৮শে ফাল্গুন অভ্যাসমত অতি প্রত্যূষে উঠিয়া যথারীতি আহ্নিক ও পূজা ইত্যাদি সমাপন করিলেন। মধ্যাহ্নে সামান্য একটু ভোজন করিলেন। তাঁহার এই সামান্য অসুস্থতার সংবাদ শুনিয়া তাঁহার স্বগ্রামবাসী আত্মীয়-স্বজন এবং স্থানীয় ভদ্রমহোদয়গণ তাঁহাকে দেখিতে আসিলেন। এই ভাবে সারা দিন অতিবাহিত হইল। সন্ধ্যার একটু পরে—তিনি বাড়ীর

লোকদের ডাকিয়া বলিলেন: "আমার শরীরটা ভাল নয়, আমার জন্য বাইরে উঠানে বিছানা করে দাও। দেরী করো না।"

তাঁহার মুখে এই কথা শুনিয়া কৃষ্ণমোহনের বিধবা ভগ্নী বিশ্বেশ্বরীদেবী এবং পত্নী বিন্দুবাসিনী দেবী উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে আরম্ভ করিলেন। সে সময়ে বেগমগঞ্জ সহরে কোনও অভিজ্ঞ, ডাক্তার বা চিকিৎসক কেহই ছিলেন না। ঢাকা জেলার অন্তর্গত শুভঢ্যা গ্রাম নিবাসী বসুবংশীয় একব্যক্তি তখন বেগমগঞ্জ-স্থিত মধ্যইংরাজী বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করিতেন, চিকিৎসা-বিদ্যায় ও তাঁহার কিছুটা পারদর্শিতা ছিল। তাঁহাকে আনিবার জন্য দুইজন লোক ছুটিয়া গেল। ইতিমধ্যে বাটীর ও অন্যান্য উপস্থিত ভদ্রমহোদয়গণের কথানুসারে তাঁহার জন্য প্রাঙ্গণে বিছানা করিয়া দেওয়া হইল। কৃষ্ণমোহন ধীরপদে বাহিরে আসিয়া একবার আকাশের দিকে—একবার বাহিরের চারিদিকে তাকাইলেন, তারপর বিছানায় আসিয়া উত্তর দিকে মাথা রাখিয়া শয়ন করিলেন। শুইবার একটু পরে ক্ষীণ কণ্ঠে কহিলেন:— "আমার জপের মালা দেও।" তৎক্ষণাৎ তাঁহার হাতে জপের মালা দেওয়া হইল, তারপর অতি ক্ষীণ-কণ্ঠে নাম জপ করিতে করিতে জপের মালা কপালে ছোঁয়াইবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার মৃত্যু হইল। বাড়ীতে ক্রন্দনের রোল পড়িয়া গেল। উপস্থিত সকলে হাহাকার করিয়া উঠিলেন। এমনি ভাবে একজন পুণ্যবান ব্যক্তি পরপারে চলিয়া গেলেন।

পিতা কৃষ্ণমোহন সেনের প্রথমা পত্নী ইচ্ছাময়ী দেবীর গর্ভে অবিনাশচন্দ্রের জন্ম হয়। ইচ্ছাময়ীর পিত্রালয় ছিল ত্রিপুরা

জেলার অন্তর্গত কসবা থানার যমুনা গ্রাম। নিম্নের সংক্ষিপ্ত বংশ তালিকায় অবিনাশচন্দ্রের পিতামহ ও পিতার পরিচয় প্রদত্ত হইল।

কামিনীমোহন অবিনাশচন্দ্র দুর্গামোহন দেবেন্দ্র মোহন
[প্রথমা স্ত্রীর ইচ্ছাময়ীর গর্ভজাত] (দ্বিতীয়া পত্নী বিন্দুবাসিনীর গর্ভজাত)

কৃষ্ণমোহনের দ্বিতীয়া পত্নী বিন্দুবাসিনীর পিত্রালয় ছিল ত্রিপুরা জেলার অন্তর্গত কমলাসাগর থানায় মুলগ্রাম।

পিতার মৃত্যুসংবাদ সম্পূর্ণ আকস্মিক ভাবে পাইয়া অবিনাশ-চন্দ্র নোয়াখালি হইতে বেগমগঞ্জ আসিলেন। সে দুর্দ্দিনের কথা কতদিন তিনি অশ্রু-সিক্ত নয়নে বন্ধুজনের নিকট এবং আত্মীয় স্বজনের নিকট বলিয়াছেন। সে দিনের করুণ-বেদনা-পূর্ণ কাহিনী বলিতে বলিতে তাঁহার চক্ষু দুইটি অশ্রুসিক্ত হইয়াছে। কোন অবলম্বন নাই, কি করিবেন কোথায় যাইবেন তাহাই হইল প্রধানতম সমস্যা।

পিতৃবিয়োগের পর বেগমগঞ্জ বাস করা আর সম্ভবপর হইল না। বিমাতা বিন্দুবাসিনী এবং বিধবা পিসিমাতা বাসপল্লী চুণ্টা গ্রামে আসাই স্থির করিলেন, তাহা ছাড়া,

বেগমগঞ্জে আর কাহার আশ্রয়ে থাকিবেন? কে এই সংসার পরিচালনা করিবে? অবশেষে চুণ্টাগ্রামের দিকে রওয়ানা হইলেন।

সে-সময়ে রেলগাড়ীর প্রচলন হয় নাই। নৌকা সহযোগে আসিবার ও কোন সুযোগ ছিল না। কাজেই তাঁহাদের গোরুর-গাড়ীতে যাত্রা করিতে হইল। মানুষের মহত্ত্ব ও উদারতা বিপদের সময়ই প্রকৃত ভাবে প্রকাশ পায়। বর্দ্ধমান জেলা নিবাসী ক্ষেত্রমোহন মিত্র মহাশয় তখন বেগমগঞ্জে মুন্সেফ ছিলেন। ক্ষেত্র বাবুর সহিত কৃষ্ণমোহনের বিশেষ সৌহার্দ্দ ছিল। তিনি কৃষ্ণমোহনের প্রতি শ্রদ্ধাবান্ ছিলেন। তাঁহার অকাল মৃত্যুতে অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছিলেন, এই বিপৎকালে তিনি এই পরিবারের যাহাতে কোন অসুবিধা না হয় এবং নিরাপদে বাস-পল্লীতে ইহাঁরা পৌছিতে পারেন, তাহার সর্ব্ববিধ সুব্যবস্থা করিয়া দিলেন। সেকালে গোরুর গাড়ী ব্যতীত অন্যরূপ যান-বাহনের সুবিধা ছিল না। ক্ষেত্রমোহন কয়েকখানি গোযান স্থির করিয়া দিলেন এবং কৃষ্ণমোহনের পরিবারি ও পরিজনের পথে যাহাতে কোনরূপ ক্লেশ না হয়, দস্যু তস্করের হাতে না পড়িতে হয়, সেজন্য তিন জন পেয়াদা সঙ্গে দিলেন। এই হিতৈষী বন্ধু ক্ষেত্রমোহনের পুত্র ধীরেন্দ্রনাথ মিত্র পরবর্ত্তীকালে অবিনাশচন্দ্রের পুত্র অমিয়ের বন্ধুরূপে সর্ব্বদা সেন-পরিবারের সহিত পূর্ব্ব সৌহার্দ্দ অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন।

বিপদের বন্ধু মুন্সেফ ক্ষেত্রমোহন মিত্র

সেকালের পল্লীর পথ-ঘাট ছিল বিপদসঙ্কুল। চোর-ডাকাতের ভয়ে যাত্রীরা ভীত ও চকিত থাকিতেন। কিন্তু সঙ্গে পেয়াদা

কনিষ্ঠ বৈমাত্রেয় ভ্রাতা স্বর্গত দেবেন্দ্রচন্দ্র সেন ও তদীয়
পত্নী সুধা দেবী

থাকায় তাহাদিগের সেইরূপ কোনও আশঙ্কার কারণ ঘটে নাই।

সেকালের গ্রাম্য পথ

তাঁহাদের যাত্রা-পথ ছিল বেশ মনোরম প্রাকৃতিক দৃশ্যে পূর্ণ। গ্রামের পর গ্রাম, সুপারি, নারিকেল, আম কাঁঠালের সারি, দীঘি ও পুষ্করিণী—সবুজ শস্যশ্যামল—মাঠের পর মাঠ যেন অন্নপূর্ণার ভাণ্ডার। অবিনাশচন্দ্র সেই শোকাচ্ছন্ন দিনের যাত্রা-পথের কথা ভাববিহ্বল ভাষায় বর্ণনা করিতেন। তিনি বলিয়াছেন— "আমাদের গোরুর গাড়ী, কাঁচা রাস্তা এবং চষা মাঠ দিয়া চলিত। কখনও সে পথ ছিল কোন গ্রামের পাশ দিয়া বা মধ্য দিয়া, যখন গ্রামের পথে অগ্রসর হইত, তখন গ্রামবাসী পুরুষ ও নারীরা আসিয়া নানা প্রশ্ন করিত, পেয়াদাদের কাছে কিংবা পিসিমা ও ক্রন্দনরতা জননীর মুখে আমাদের ভাগ্যবিপর্য্যয়ের কথা শুনিয়া তাহারা সমবেদনা প্রকাশ করিত এবং আমাদের সাহায্যের জন্য অগ্রসর হইত। কোনও ছায়াশীতল তরুচ্ছায়াতলে গাড়ী রাখিয়া গাড়োয়ানরা বিশ্রাম করিত, গোরুগুলি যথেচ্ছ বিচরণ করিয়া উদর পূরণ করিত। পেয়াদারা কেহ প্রহরায় থাকিত, কেহবা খাদ্য দ্রব্যাদি সংগ্রহের জন্য গ্রামের বাজার বা হাটের দিকে চলিয়া যাইত। মা ও পিসীমাতা দীঘির শীতল জলে বা নদীর জলে স্নান করিয়া আমাদের জন্য হবিষ্যান্ন রন্ধন করিতেন। সন্ধ্যা যখন ঘনাইয়া আসিত, চারিদিক অন্ধকারে আচ্ছন্ন করিত তাহার পূর্ব্বে কোন ও নিরাপদ পল্লী, হাট বা বাজারের নিকট আমাদের থাকিবার ব্যবস্থা হইত। মধ্যাহ্নে আমরা ঐরূপভাবে নিকটবর্ত্তী পল্লীতে আসিয়া আশ্রয় লইতাম। হবিষ্যান্ন গ্রহণ ও সঙ্গীয় গাড়োয়ান ও পেয়াদাদের আহারাদির

পর আবার আমরা গন্তব্য পথের দিকে অগ্রসর হইতাম। কখনও কোন হিন্দু-পল্লীতে আশ্রয় লইয়াছি—কখন ও কোন মুসলমান-পল্লীতে আশ্রয় লইতে হইয়াছে। কি হিন্দু, কি মুসলমান সকলেই আমার পিতার মৃত্যুতে যেমন দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন, তেমনি আমাদের ভবিষ্যৎ বিষয়ে আলোচনা করিয়া শুভ কামনা করিয়াছেন। সেই সম্প্রীতি ও সহানুভূতির কথা স্মরণ হইলে আমি এখনও মনে করি কেমন করিয়া এত পরিবর্ত্তন আসিল।"

এইরূপ ভাবে সাতদিন দিবা-রাত্র পথ চলিয়া সকলে ব্রাহ্মণবাড়িয়া আসিয়া পৌঁছিলেন। সেখান হইতে নিজ বাস-পল্লী চুণ্টা গ্রামে আসিলে পর এই শোকার্ত্ত পরিবারের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশের জন্য গ্রামের সকলে সমবেত হইলেন। প্রায় শতবর্ষ পূর্ব্বের পল্লী-জীবনে যে সহানুভূতি, সহযোগিতা ছিল, পরস্পরের সুখে-দুঃখে বিপদে ও সম্পদে যে আন্তরিকতা ছিল, তাহা এখন আর নাই!

চুণ্টা আগমন
পিতৃশ্রাদ্ধ

গ্রামের লোকেরা কৃষ্ণমোহনের অকাল-মৃত্যুতে বিশেষ দুঃখিত হইলেন—এবং যাহাতে এই বিপন্ন পরিবারের গভীর শোকবেদনার মধ্যে তাহাদের কোন বিষয়ে কোনরূপ অসুবিধা না হয়, সেজন্য পল্লীবাসী পুরুষ ও মহিলা সকলেই আগ্রহান্বিত হইলেন এবং যাহার যেমন ক্ষমতা তদনুরূপ সাহায্য করিতে লাগিলেন।

শ্রাদ্ধকার্য্যাদি নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইল। শোকের প্রথম আঘাত ও ক্রমশঃ হ্রাস পাইতে লাগিল—ইহাই হইতেছে

সংসারের নিয়ম। কিন্তু এখন দেখা দিল দুইটি প্রধান সমস্যা। প্রথমতঃ অবিনাশচন্দ্রের শিক্ষা দ্বিতীয়তঃ সংসারের ব্যয় নির্ব্বাহ। কে এই বিপৎকালে আসিয়া আশ্রয় দিবে? কৃষ্ণমোহন সঞ্চয়ী ছিলেন না, পূজাপার্ব্বণ আত্মীয়-স্বজন-পোষণ, দয়া-দাক্ষিণ্য, প্রভৃতি নানাকার্য্যে অর্থব্যয় করিতেন। কাজেই তিনি এমন কিছু অর্থ রাখিয়া যাইতে পারেন নাই, যাহার দ্বারা সংসার প্রতিপালিত হইয়া অবিনাশচন্দ্রের শিক্ষা-ব্যয় নির্ব্বাহিত হইতে পারে। ইহাই দাঁড়াইল গুরুতর সমস্যা!

আমরা অনেকে জীবনে একটা আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিতে পাই—বিধাতা পুরুষ কখন কোন্ ভাবে যে বিপন্ন পরিবারকে সাহায্যের পথ নির্দ্দেশ করিয়া দেন, তাহা মানব বুদ্ধির অগোচর। প্রত্যেক মানুষের জীবনে কোন না কোন সময়ে এইরূপ শুভ সুযোগ আসিতে দেখা যায়। কৃষ্ণমোহনের পরিবারেও বিপদবারণ মধুসূদন তেমনি এক সুযোগের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন।

সে-সময়ে অবিনাশচন্দ্রের পিতা কৃষ্ণমোহনের সাক্ষাৎ জ্যেষ্ঠতাত ভ্রাতা আনন্দশঙ্কর সেন, দুর্দ্দিনের বন্ধুরূপে এই পরিবারের কল্যাণ-কল্পে আসিয়া দেখা দিলেন। তিনি হইলেন এই পরিবারের হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধু ও আত্মীয়। অবিনাশচন্দ্র কৃতজ্ঞতার সহিত বলিতেন—"জ্যেঠা মহাশয় আনন্দশঙ্কর, আমাদের সেই দুঃখ-দুর্দ্দশার দিনে যে রূপে সর্ব্বতোভাবে সাহায্য করিয়াছিলেন, তাহা জীবনে কোন দিন ভুলিতে পারিবনা। ঈশ্বর যে মঙ্গলময়

আনন্দশঙ্কর সেন

তাহা সেই বাল্যজীবনের ভীষণ দুঃসময়ের মধ্যে নানারূপ সাহায্য ও সহানুভূতির দ্বারা উপলব্ধি করিয়াছি। সেইসব আত্মীয় ও বন্ধুগণের মধ্যে অনেকে এখন পরলোকে—কিন্তু আমার দৃঢ়বিশ্বাস তাঁহাদের সকলের শুভ আশীর্ব্বাদ ও পুণ্যফলে আমি আজ মানুষ হইতে পারিয়াছি।”

আনন্দশঙ্কর ছিলেন সেকালের একজন সাধু ও কর্ম্মকুশল দারোগা। পুলিশ বিভাগে তাঁহার ন্যায় চরিত্রবান্ ও ন্যায়-পরায়ণ কর্ম্মচারী তখন বিরল ছিল। অবিনাশচন্দ্রের পিতার মৃত্যু সময়ে আনন্দশঙ্কর অবসর গ্রহণ করিয়া বাস-পল্লী চুণ্টাতে বাস করিতেছিলেন। ইনি পর পর তিনটি বিবাহ করিয়াছিলেন। দুঃখের বিষয় এই যে তাঁহার কোন স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তানই জীবিত ছিলনা এবং কোন স্ত্রী-ই শেষ জীবনে জীবিতা ছিলেন না। সংসারের প্রতি এজন্য তাঁহার বীতরাগ জন্মিয়াছিল। অর্থ ছিল, মান সম্ভ্রম ও প্রতিপত্তি ছিল, কিন্তু পারিবারিক সুখ শান্তি তাঁহার ছিল না। এই সব নানা কারণে তাঁহার মন ধর্ম্মের দিকে আকৃষ্ট হইল। তিনি ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন। ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রহণের পর তিনি কখন কখন ঢাকা সহরে আসিয়া বাস করিতেন। ঢাকা সহরে আসিলে নববিধান পল্লীতে থাকিতেন, তবে বৎসরের অধিকাংশ সময় গ্রামে থাকিতেন। এই আনন্দশঙ্কর সেন মহাশয় অবিনাশচন্দ্রের শিক্ষার ভার গ্রহণ করিলেন এবং বিপন্ন পরিবারের ভরণ-পোষণের ভার ও স্বেচ্ছায় গ্রহণ করিয়া দুর্দ্দশাগ্রস্ত পরিবারের আশ্রয়স্বরূপ হইলেন।

আনন্দশঙ্কর ও ব্রাহ্ম ধর্ম্ম নববিধান পল্লী

তিনি—অবিনাশচন্দ্রকে ঢাকায় আনিয়া তথাকার বিখ্যাত উচ্চইংরাজী বিদ্যালয় পোগোস্ স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিলেন।

এ-প্রসঙ্গে সেই শতবর্ষ পূর্ব্বের ঢাকা সহরের কথা কিছু বলিতে হইবে। সেকালের ঢাকার সহিত বর্ত্তমানের ঢাকা সহরের কত প্রভেদ। ঢাকা সহরে তখন ঢাকা পোগোস্ স্কুল, গণি মিঞার স্কুল, গ্রেগরি স্কুল, ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল, প্রভৃতি কয়েকটি স্কুল ছিল প্রধান। এ সমুদয় স্কুলের মধ্যে পোগোস্ স্কুলের খ্যাতি ও প্রতিপত্তি ছিল খুব বেশী। সেখানকার শিক্ষা-প্রণালী এবং শিক্ষকগণের ছাত্রদের চরিত্র গঠন করিবার জন্য ছিল অখণ্ড মনোযোগ।

ঢাকা সহর ও সূত্রাপুরের ছাত্র নিবাস

এখানে প্রসঙ্গ-ক্রমে ইহা উল্লেখযোগ্য যে ঢাকাতে ইংরাজী শিক্ষা বিস্তারের সূত্রপাত হইয়াছিল, অবিনাশচন্দ্রের জন্মের প্রায় চৌত্রিশ বৎসর মাত্র পূর্ব্বে—মিশনারীদের চেষ্টায় ও উদ্যোগে এবং গভর্মেণ্টের অর্থসাহায্যে ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দের ১৫ই জুলাই ঢাকা ইংরাজী স্কুল প্রতিষ্ঠাপিত হয়। ইহাই মফস্বলের প্রথম উচ্চইংরাজী বিদ্যালয়। ১৮৪১ সনের ২০শে নভেম্বর তারিখে কলিকাতার লর্ড বিশপ আসিয়া ঢাকা কলেজের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৪৬ সনে ২৪৫০০ টাকা ব্যয়ে কলেজ-গৃহ প্রস্তুত হইয়াছিল। পূর্ব্বে ঢাকা কলেজ গৃহের স্থানে ইংরাজের বাণিজ্য-কুঠি ছিল। ঢাকা কলেজ স্থাপিত হইলে উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়টি ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল নামে পরিচিত হয়।

ঢাকা সহরে ইংরাজী শিক্ষার সূত্রপাত

ঢাকা সহরে ইউরোপীয় শিক্ষাবিদ্‌গণের তত্ত্বাবধানে যে সমুদয় বিত্তালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহার মধ্যে—রেভারেণ্ড ও লেওনার্ড (Rev O. Leonard) নামক একজন ব্যাপটিষ্ট মিশনারী কর্ত্তৃক ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে সাতটি বিত্তালয় স্থাপিত হয়—তাহার পাঁচটিতে বাঙ্গালাভাষা ও সাহিত্য, একটিতে ইংরাজী এবং একটিতে পার্শী ভাষা শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা হইয়াছিল। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে ঢাকা সহরে কলেজিয়েট স্কুল স্থাপিত হইলে পর, মিঃ টেলার (Mr. Taylor) সাহেব লিখিয়াছেন :—"The natives of this part of the country evinced great eagerness to acquire a knowledge of the English Language, and accordingly the school which has lately been established in the city by Government is well attended, and altogether is in a most flourishing and promising condition. The institution is admirably conducted, and under the able tuition of the present masters the pupils have made great proficiency not only in reading, writing and arithmetic but in the higher branches of education as geography, history and geometry." অর্থাৎ এ-অঞ্চলের অধিবাসীরা ইংরাজী শিক্ষা লাভ করিবার জন্য বিশেষ উৎসাহী, তাঁহাদের আগ্রহাতিশয্যের দরুন গভর্ণমেণ্ট ঢাকা সহরে একটি উচ্চ ইংরাজী বিত্তালয় স্থাপন করিয়াছেন। বিত্তালয়টি অত্যন্ত দক্ষতার সহিত পরিচালিত হইতেছে—যোগ্য শিক্ষকগণের শিক্ষানৈপুণ্যে

বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা অতি অল্প সময়ের মধ্যে ইংরাজী পড়িতে, লিখিতে এবং অঙ্ক, ভূগোল, ইতিহাস ও জ্যামিতি প্রভৃতিতে উপযুক্ত পারদর্শিতা দেখাইতেছে।

ঢাকা সহরে ও ঢাকা জেলায় ধীরে ধীরে শিক্ষার বিস্তৃতি হইতে থাকে। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে সমগ্র ঢাকা জেলায় মাত্র ১৬৯টি বালকবিদ্যালয় ছিল। ইংরাজী শিক্ষার প্রতি হিন্দু অধিবাসীদের আগ্রহ ছিল অত্যন্ত বেশী। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে এ, এইচ ক্লে সাহেব ঢাকা জেলার শিক্ষা-প্রসঙ্গে লিখিয়াছিলেন:—"The natives, especially the Hindus, as a rule evince a most laudable desire to obtain an English education, and will often pinch and screw and almost starve themselves in order to be able to pay their school or college fees."

১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে ঢাকার শিক্ষা

সহরের হিন্দু অধিবাসীরা ইংরাজী শিক্ষার জন্য এতদূর আগ্রহশীল ছিলেন যে সর্ব্বপ্রকার ব্যয় সঙ্কোচ করিয়াও স্কুল ও কলেজের বেতন দিতে যত্নবান্ ছিলেন।

এ সকল তথ্য হইতে আমরা দেখিতে পাইতেছি যে অবিনাশচন্দ্র যখন ঢাকাতে আসেন, তখন ঢাকা সহরে শিক্ষা বিস্তারের মাধ্যমিক অবস্থা। তখনকার দিনে ঢাকা সহরের বিদ্যালয়ের পরিচালকমণ্ডলী এবং শিক্ষকগণ সকলেই শিক্ষাব্রতী ছিলেন, তাঁহাদের মহৎ উদ্দেশ্য ছিল, ছাত্রদিগকে মানুষ করিয়া দেশের গৌরব বৃদ্ধি করা—এ বিষয়ে সেকালের শিক্ষকেরা খ্যাতি ও প্রতিপত্তি অর্জ্জন করিয়াছিলেন।

অবিনাশচন্দ্র যখন ঢাকার স্কুলে আসিয়া ভর্ত্তি হন, তখন তাঁহার বয়স চৌদ্দ পনেরো বৎসর মাত্র। শিশুকালে মাতৃহারা, কৈশোরে পিতৃহারা—এই তরুণ কিশোরের আপনার জন বলিতে কেহ ছিলনা। বিমাতা বিন্দুবাসিনী ও পিসীমাতা সংসারের কাজে দেশে থাকিতেন—শিশু ভাই বোন্দের লালন-পালন করিতেন। এরূপ অবস্থায় তাঁহার জীবনের প্রথম শিক্ষা ও স্বতন্ত্র ভাবে একক থাকিবার এবং নিজের প্রত্যেকটি কার্য্য দেখা শুনা এবং পড়িবার ও মানুষ হইবার আকাঙ্ক্ষা লইয়া তিনি অগ্রসর হইলেন।

ঢাকার ছাত্রাবাস সমাজ ও ধর্ম্ম

তৎকালে ঢাকা সহরে কলেজ-হোষ্টেল বা অন্য কোনরূপ ছাত্রাবাস একরূপ ছিল না বলিলেই চলে। ছাত্রদের মধ্যে অনেকে নিজ নিজ পরিবারে থাকিয়া পড়াশুনা করিতেন কিংবা কোনও সদাশয় ভদ্রলোকের বাড়ীতে আহার ও বাসস্থান পাইয়া শিক্ষা-লাভ করিতেন। অনেক ছাত্র বৈষ্ণবদের প্রতিষ্ঠিত আখড়া-বাড়ীতে আহার ও থাকিবার ব্যয় বাবদ কিছু কিছু অর্থ দিয়া থাকিবার ব্যবস্থা করিয়া লইতেন। আবার কোনও কোনও জেলার ছাত্রেরা এক সঙ্গে মিলিত হইয়া এক একটি ছাত্রাবাস স্থাপন করিয়া থাকিতেন। ঠাকুর, চাকর রাখিয়া ও বাসা ভাড়া দিয়া ছাত্রেরা একসঙ্গে থাকিতেন এবং নিজ নিজ জেলা বা পল্লীর নামানুসারে মেসের নাম দিতেন, যেমন ত্রিপুরা মেস্, চুণ্টা মেস্, ময়মনসিংহ মেস্, বিক্রমপুর মেস্ প্রভৃতি নানা নামের মেস্ ছিল। অবিনাশচন্দ্রও তাঁহার সমবয়সী কয়েকজন ছাত্র সূত্রাপুর পল্লীতে একটি মেস্ করিয়া বাস করিতেছিলেন।

তাহার নাম দেওয়া হইয়াছিল—'চুণ্টা—ত্রিপুরা মেস্'। সেই মেসে পরবর্ত্তীকালের প্রসিদ্ধ ডেপুটিম্যাজিষ্ট্রেট চুণ্টা গ্রাম-নিবাসী অন্নদাচরণ গুপ্ত, অন্নদাচরণের কনিষ্ঠ ভ্রাতা প্যারীচরণ গুপ্ত, বিপ্রগুপ্ত, মহেশ্বরদী নিবাসী সুকুমার সেন প্রভৃতি সে মেসে থাকিয়া পড়াশুনা করিতেন। সে-সময় ঢাকা সহর থাকিবার খাইবার এবং পড়িবার সর্ব্ববিষয়ে সুবিধাজনক স্থান ছিল বলিয়া ঢাকা, ময়মনসিংহ, শ্রীহট্ট, কুমিল্লা, চাঁদপুর, ত্রিপুরা, বিক্রমপুর এমন কি উত্তর বঙ্গের বহু ছাত্র অল্পব্যয়ে পড়াশুনার সুবিধা হয় বলিয়া এখানে আসিতেন।

কোন কোন মানুষ থাকেন যাঁহারা সংসারের শত দুঃখ-দৈন্য হাহাকার ও নির্য্যাতনের মধ্যেও অবিচলিত ভাবে কর্ত্তব্য পালনে অগ্রসর হন, শতবাধা বিঘ্ন কিছুতেই তাঁহাদিগকে বিচলিত করিতে পারে না। বাল্যজীবন হইতে অবিনাশচন্দ্রের চরিত্রে এইরূপ নির্ভীকভাব বিদ্যমান ছিল। সে-সময়ে ঢাকার ব্রাহ্মগণ দেশের সর্ব্বপ্রকার হিতসাধন কার্য্যে ব্রতী ছিলেন। "Principal Heads of the History and statistics of the Dacca District" সঙ্কলিয়তা ক্লে সাহেব তৎকালীন ঢাকার ব্রাহ্মসমাজের কথা-প্রসঙ্গে বলেন :—"The modern Hindoo sect of Brahmos, which has of late made such a sensation in the religious world, has made many converts in Dacca; and it is, I am told, in contemplation to erect a hall in the city for the use of members of the new communion."—হিন্দুসম্প্রদায়ের ব্রাহ্ম-ধর্ম্মানুরক্ত ব্যক্তিগণ

ঢাকা সহরে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছেন এবং তাঁহারা শীঘ্রই ঢাকা সহরে একটি বাড়ী নির্ম্মাণ করিয়া নিজ সম্প্রদায়ের দৈনন্দিন প্রার্থনার সুব্যবস্থা করিবেন।

এই ব্রাহ্মসমাজের কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগকে নীতি শিক্ষাদানের জন্য সুব্যবস্থা করিয়াছিলেন এবং ১২৮৫ সালে জগন্নাথ স্কুলে—একটি 'রবিবাসরীয়' বিদ্যালয় (Sunday School) সংস্থাপিত করিয়াছিলেন। ঢাকার আদর্শ শিক্ষক রজনীকান্ত ঘোষ, জগবন্ধু লাহা, নবকান্ত চট্টোপাধ্যায়, শীতলাকান্ত চট্টোপাধ্যায়, নবকুমার চক্রবর্ত্তী, হরিমোহন চৌধুরী প্রভৃতি ধার্ম্মিক এবং সমাজসংস্কারক ব্যক্তিগণ সেখানে শিক্ষাদান করিতেন। এই বিদ্যালয় দ্বারা ছাত্রদের চরিত্র গঠন সম্বন্ধে প্রভূত উন্নতি হইয়াছিল।

ছাত্রদিগকে নীতি শিক্ষাদান

তৎকালে ঢাকার নৈতিক আবহাওয়া নানারূপে কলুষিত ছিল। বাল্যবিবাহ, সুরাপান, বহুবিবাহ, প্রভৃতি বিবিধ অনাচারে সমাজ কলুষিত হইয়া উঠিয়াছিল। এই সব অনাচারের বিরুদ্ধে নবপ্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মসমাজের নেতৃবৃন্দ আন্দোলন, আলোচনা এবং পত্রিকা ও পুস্তিকা প্রভৃতি প্রকাশ করিয়া সমাজের যে উন্নতির পথ প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন তাহার ফলে আমরা এক নবযুগের শুভ প্রভাতের অভ্যুদয় দেখিতে পাইয়াছি। ১২৫৩ সালের ২২শে অগ্রহায়ণ (৯ই ডিসেম্বর, ১৮৪৬ খৃঃ) রবিবার সুবিখ্যাত ব্রজসুন্দর মিত্র প্রভৃতি দ্বারা সংস্থাপিত "ঢাকা ব্রাহ্মসমাজ" ১২৭৬ (১৮৬৯ খৃঃ অঃ) 'পূর্ব্ব বাঙ্গলা ব্রাহ্ম সমাজ' নাম ধারণ করে। অবিনাশচন্দ্র

যখন তরুণ বয়সে ঢাকা অধ্যয়ন করিতে আসিলেন—তখন ব্রাহ্ম-সমাজের প্রভাব ঢাকার শিক্ষিতসমাজের মধ্যে পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান, ছাত্রসমাজের ত কথাই নাই। ছাত্রগণ ব্রাহ্ম-সমাজের উপাসনার দিনে, ছাত্রসমাজের অধিবেশনে পরম উৎসাহের সহিত যোগদান করিতেন এবং ব্রাহ্মসমাজ যে সকল সংস্কারের দিকে মনোযোগী ছিলেন ছাত্রগণও সেই দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছিলেন এবং নিজ নিজ বাসপল্লীতে সংস্কার-কার্য্যে ব্রতী হইতেন। অবিনাশচন্দ্রের হিতৈষী অভিভাবক আনন্দশঙ্কর ব্রাহ্মসমাজভুক্ত ছিলেন, তাহারই ফলে এবং সেকালের ছাত্রসমাজের পরস্পরের আলাপ-আলোচনা ও প্রভাব বশতঃ অবিনাশচন্দ্র ও সংস্কারপন্থী এবং ব্রাহ্মসমাজের প্রত্যেকটি অনুষ্ঠানে আনন্দ ও উৎসাহের সহিত যোগদান করিতেন।

পূর্ব্ববাঙ্গলা ব্রাহ্ম সমাজ

তখন ঢাকা সহরে সর্ব্ববিধ সামাজিক সংস্কারকার্য্যে ব্রতী হইয়াছিলেন ব্রাহ্মসমাজের নেতৃবৃন্দ। ঢাকার ব্রাহ্মগণের যত্নে 'ঢাকা শুভসাধিনী সভা' (Dacca Philanthropic society) ১২৭৭ সনে (১৮৭০ খৃঃ) প্রতিষ্ঠিত হয়। সুরাপান-নিবারণ, স্ত্রী-শিক্ষাদান, বাল্যবিবাহ-নিবারণী সভা ও মহাপাপ বাল্যবিবাহ পত্রিকা, ঢাকা অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষা-সভা, ঢাকা যুবতী বিদ্যালয় (Dacca Adult Female School), শিশু বিদ্যালয় (Infant School) প্রভৃতি বিবিধ সংস্কার-মূলক প্রতিষ্ঠানের দ্বারা সমাজের মধ্যে একটা গভীর আন্দোলনের সৃষ্টি হইয়াছিল।

ঢাকা শুভসাধিনী সভা

'ঢাকা শুভসাধিনী সভা হইতে 'শুভসাধিনী'নামে (১৮৭০সনে) একখানি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হইয়াছিল। এ-পত্রিকা খানির মূল্য ছিল মাত্র এক পয়সা। এসমুদয় সংস্কারের প্রভাব অবিনাশচন্দ্রের ছাত্র-জীবনে বিশেষ ভাবে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। অবিনাশচন্দ্র যখন ঢাকাতে পড়িতে আসিলেন, সে-সময়ে ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য ও ধর্ম্মপ্রচারকগণের মধ্যে অনেক খ্যাতনামা ব্যক্তি ছিলেন। সেকালে তরুণদিগের প্রাণে স্ত্রীশিক্ষার জন্য অত্যন্ত আগ্রহ ছিল। তখনকার দিনে 'অবলাবান্ধব' সম্পাদক স্বর্গীয় দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় বিরচিত নিম্নলিখিত সঙ্গীতটি যুবকগণের কণ্ঠে কণ্ঠে গীত হইত—

(কতকাল পরে—সুর)

না জাগিলে সব ভারত ললনা,
এ ভারত আর জাগেনা জাগেনা।
অতএব জাগ, জাগগো ভগিনী,
হও "বীরজায়া", বীর প্রসবিনী।"
শুনাও সন্তানে, শুনাও তখনি,
বীরগুণ গাথা, বিক্রম কাহিনী,
স্তন্য-দুগ্ধ যবে পিয়াও জননী।
বীর গর্ব্বে তার, নাচুক ধমনী,
তোরা না করিলে এ মহাসাধনা,
এ ভারত আর জাগে না জাগে না।'

পূর্ব্ববঙ্গের নারীশিক্ষার উন্নতির মূলে, স্ত্রীজাতির দুঃখ-দুর্দ্দশা দূর করিবার জন্য বিক্রমপুরনিবাসী দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় যে মহৎ কাজ করিয়া গিয়াছেন তাহা বাঙ্গালার নারী-

সমাজ কোন কালে বিস্মৃত হইতে পারে না। তাঁহার সম্পাদিত "অবলাবান্ধব" পত্রিকার দ্বারা সমাজের প্রভূত উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। সে-সময়কার সমাজ-সংস্কারের প্রেরণা অবিনাশচন্দ্রের চিত্তের মধ্যে যে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, তাহার ফলে তিনি ভবিষ্যত জীবনে "ত্রিপুরা-হিতসাধিনী সভার"—সভাপতিরূপে নিজ জেলার কতনা কল্যাণ করিয়া গিয়াছেন। সেকথা যথা-স্থানে বলিব।

সেকালের হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে অত্যন্ত প্রীতি ছিল। পরস্পরে একই পল্লীতে মিলিত ভাবে বাস করিতেন, সুখে-দুঃখে আমোদে-প্রমোদে যোগদান করিতেন। টেইলার সাহেব ও ক্লে সাহেব (Taylor & Mr. Clay, Magistrate & collector) বলেন :—"Religious quarrels between Hindoos and Mahomedans are of rare occurrence, both classes living together in perfect peace and harmony." অর্থাৎ হিন্দু মুসলমানদের ধর্ম্ম বিষয়ক কোন দ্বন্দ্ব বা সাম্প্রদায়িক মতভেদ ছিল না, উভয় সম্প্রদায় শান্তি ও প্রীতির সহিত মিলিত ভাবে বাস করিতেন। প্রত্যেকটি কার্য্যে পরস্পরে সহযোগিতা করিয়া চলিতেন।

অবিনাশচন্দ্র আমোদপ্রিয় এবং ক্রীড়ামোদী ছিলেন। তখনকার দিনে ঢাকার ঘুড়ির খেলা, ক্রিকেট খেলা, হাডুডু, কুস্তি প্রভৃতি শারীরিক ব্যায়ামের জন্য প্রসিদ্ধি ছিল। অধর ঘোষ, পার্শ্বনাথ, শ্যামাকান্ত প্রভৃতি শক্তিশালী পুরুষগণের নাম ও তাঁহাদের ব্যায়াম-কৌশল ছাত্রদের নিকট বিশেষ প্রিয় ছিল। তারপর ঢাকা সহরে বারো মাস তেরো পার্ব্বণ লাগিয়াইছিল।

ঝুলন, জন্মাষ্টমী, রথযাত্রা চরকপূজা, দোলযাত্রা প্রভৃতি উৎসবে যোগ দান করিয়া ছাত্রগণ অত্যন্ত আনন্দ লাভ করিতেন। ঢাকার জন্মাষ্টমী মিছিলের সেকালের ঝুলন ও রথ যাত্রার মেলার বিষয় তিনি অতি সুন্দরভাবে বর্ণনা করিতেন।

ঢাকা সহরের আমোদ-প্রমোদ ক্রীড়া-কৌতুক

সে-সময়ে ঢাকার নবাব বাহাদুর, রূপলাল দাস, রঘুলাল দাস, মোহিনীমোহন দাস, ভাওয়ালের, মুড়াপাড়ার, কাশিমপুর, ত্রিপুরার মহারাজা এবং অন্যান্য স্থানের রাজা ও জমিদারেরা আসিয়া জন্মাষ্টমীর মিছিলে যোগ দিতেন। অবিনাশচন্দ্র বলিয়াছেন:—"ঢাকার জন্মাষ্টমী মিছিলের বিচিত্র জাঁকজমক, হাতী-ঘোড়ার মিছিল, ছোট চৌকী, বড় চৌকী ও বিবিধ সংয়ের গান ও নাচ দেখিয়া আমরা যে আনন্দ পাইয়াছি তাহা বলিবার নহে। মিছিলের জন্য আমাদের হাফ্ স্কুল হইত। আমরা দল বাঁধিয়া গেণ্ডারি (ইক্ষু) কিনিয়া, চীনাবাদাম কিনিয়া খাইতে খাইতে কোনও নিরাপদ স্থানে বসিয়া মিছিল দেখিবার জন্য উদ্গ্রীব হইয়া থাকিতাম। নবাবপুরের মিছিল কি ইসলামপুরের মিছিল ভাল হইল, তাহা লইয়া মেসে তর্ক করিতাম। কোন্ পক্ষের সং ভাল হইল তাহা লইয়া কিছু দিন আলোচনা চলিত। নবাবপুরের খালে নৌকার পর নৌকা থাকিত, তাহাতে দূর গ্রাম হইতে পল্লীবাসীরা আসিতেন মিছিল দেখিতে। আমাদের গ্রামবাসীরা ও দলে দলে সে-সময়ে ঢাকা আসিতেন। আমাদের মেসে ও আসিতেন। তখন আমাদের মধ্যে একটা আনন্দের সাড়া পড়িয়া যাইত। মাঝে মাঝে বৃষ্টির জন্য জন্মাষ্টমীর মিছিল যদি দুই একদিনের

জন্য পিছাইয়া যাইত, তাহা হইলে আমাদের আনন্দের আর সীমা থাকিত না! আমরা দেখিতাম সূত্রাপুরের বাজারের নীচে দোলাই খালে জল থই থই করিতেছে। লোহার পুলের নীচে কি বেগেই না জলের স্রোত ছুটিয়া চলিয়াছে! অতিথি-অভ্যাগতদের আগমন উপলক্ষ্যে আমাদের মেসে যায়গার সংকুলান হইত না, ঘরের মেজে, ছাতে যে যেখানে যে ভাবে পারিতাম শুইতাম, গল্প করিতাম, এমনিভাবে কত না উৎসব ও আনন্দের মধ্য দিয়া দিনগুলি কাটিয়া গিয়াছিল। বকল্যাণ্ড বাঁধে অর্থাৎ বুড়ি-গঙ্গার বাঁধা রাস্তার উপর দিয়া বেড়াইতে বড় ভাল লাগিত। আমাদের সান্ধ্যভ্রমণের সঙ্গী শুধু যে মেসের বন্ধুরা হইতেন তাহা নহে, স্কুলের সহধ্যায়ী বন্ধুরা ও মিলিতেন—সান্ধ্যসমীরণ সেবন করিতে করিতে দেখিতাম কত পিনিস, বজরা, গহনার নৌকা, ডিঙ্গি, ঘাটে লাগানো রহিয়াছে, কত নৌকা, লঞ্চ ও ষ্টীমার বুড়ী-গঙ্গার সাদা জলে ঢেউ তুলিয়া বেগে ছুটিয়া চলিয়াছে, সে-সব কথা মনে হইলে আমার মনে হয় যেন আবার সেই শৈশবের খেলাধূলার জীবন ফিরিয়া পাই। সে-সময়ে হিন্দুদের উৎসব গুলির ন্যায়—মুসলমানদের—মহরম, বকরি-ইদ, প্রভৃতি পর্ব্ব উপলক্ষ্যে স্কুল ও কলেজ ছুটি হইত।"

জন্মাষ্টমীর মিছিল

অবিনাশচন্দ্রের কাছে তাঁহার এই বাল্য ও কৈশোরের কাহিনী যাঁহারা শুনিয়াছেন তাঁহারা জানেন অতীতের কথা বলিতে বলিতে তাঁহার চোখে ও মুখে কেমন একটা উজ্জ্বল বিভা ফুটিয়া উঠিত।

১৮৭২ খৃষ্টাব্দে কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় কলিকাতা সহরে

মহিলাগণের উচ্চশিক্ষার্থ একটি বয়ঃস্থা বিদ্যালয় ও তৎসহ স্ত্রী নর্ম্মাল বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ঐ বিদ্যালয়ের আদর্শে বাঙ্গালার সর্ব্বত্র বঙ্গ-মহিলা-বিদ্যালয় ও বালিকাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা এবং সে-সময় হইতে বাঙ্গালার নানা স্থানে বিশেষতঃ ঢাকা সহরে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তার সম্পর্কে আন্দোলন গভীর ভাবে চলিতে থাকে। কলিকাতাতে যেমন ১৮৭৭ হইতে ১৮৯০ খৃষ্টাব্দ মধ্যে যশোহর ইউনিয়ান, বাকরগঞ্জ ইউনিয়ন, শ্রীহট্ট ইউনিয়ান, বিক্রমপুর সম্মিলনী, ফরিদপুর—সুহৃৎসভা, ত্রিপুরা-হিতসাধিনী সভা প্রভৃতি সভার প্রতিষ্ঠা হয়, তেমনি ঢাকা সহরেও শ্রীহট্ট, বিক্রমপুর, ফরিদপুর, বাকরগঞ্জ, ত্রিপুরা, যশোহর প্রভৃতি জেলার ভদ্রলোকদের ও ছাত্রদের উৎসাহে ঐ সমুদয় সভা সুপরিচালিত হইত। পরবর্ত্তীকালে অবিনাশচন্দ্র নিজ গ্রামে স্ত্রী-শিক্ষা প্রচারের জন্য এবং ত্রিপুরাহিতসাধিনীর কল্যাণ-কল্পে যে আত্মনিয়োগ করিতে পারিয়াছিলেন তাহা তাঁহার যৌবনের স্বপ্ন সফল করিবার জন্যই বলিতে পারা যায়। গ্রামের উন্নতি করিব, দেশের কল্যাণ করিব, হিন্দু সমাজের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিয়াও সমাজ ও দেশের হিতে ও সংসার কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিব—ছাত্রজীবন হইতে এই ভাব তাঁহার হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়াছিল।

অবিনাশচন্দ্র ছাত্রজীবনে নানা অভাবের মধ্যে থাকিয়াও হাসিমুখে পড়াশুনা করিতেন, কৌতুকপ্রিয়, অধ্যয়নে মনোযোগী পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এই তরুণকে দেখিয়া কেহ মনে কল্পনা করিতে ও পারিত না যে তাঁহার সাংসারিক কোনও অভাব অভিযোগ আছে।

১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে আঠারো বৎসর বয়সে অবিনাশচন্দ্র ঢাকা পোগোস্ স্কুল হইতে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তখন সম্ভবতঃ ঢাকা পোগোস্ স্কুলের হেড্‌মাষ্টার ছিলেন স্বনামধন্য বৃন্দাবন ধর। অবিনাশচন্দ্র যখন ঢাকা সহরে আসিয়া পড়াশুনা করিতেছিলেন, তখন তাঁহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা শ্রীযুত দুর্গামোহন, তাঁহাদের জ্যেষ্ঠতাত বোন্ জয়দুর্গা দেবীর বাড়ীতে থাকিয়া লেখাপড়া করিতেন। জয়দুর্গা দেবীর শ্বশুরালয় ছিল ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নিকটস্থ মেড্ডা নামক একটি পল্লী।

ঢাকা হইতে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া অবিনাশচন্দ্র কলিকাতা আসিলেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল কলিকাতায় কলেজে পড়িয়া উচ্চশিক্ষা লাভ করেন। অভিভাবক আনন্দশঙ্করও এ-বিষয়ে তাঁহার সহিত একমত হইলেন। গুরুজনদের আশীর্ব্বাদ লইয়া তিনি কলিকাতায় আসিয়া রিপণ কলেজে ভর্ত্তি হইলেন। হলওয়েল লেনের একটি মেসে তখন তাঁহারা থাকিতেন। সে মেসে চুণ্টা গ্রামের আর দু'একজন সমবয়সী ছাত্র ও ত্রিপুরা জেলার কয়েকজন বিদ্যার্থী ও তখন সেই মেসে থাকিতেন।

১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা আগমন

সে প্রায় ষাট বৎসর পূর্ব্বের কলিকাতার সহিত বর্ত্তমান কলিকাতার কত প্রভেদ! সে-সময়কার কলিকাতা এত জন-বহুল, এত বিস্তৃত রাজপথ, পার্ক ও উদ্যানে পূর্ণ ছিল না। পথঘাটও এইরূপ পরিচ্ছন্ন ছিল না। তাঁহাদের মেসের বাড়ীটি দ্বিতল হইলেও—ঘরগুলি ছিল ছোট ছোট। সেইরূপ এক একটি ক্ষুদ্র কক্ষে, অবস্থা বিবেচনায় তিন চারখানি সীটও পড়িত। তখনকার কলিকাতার শিক্ষিত-সম্প্রদায় ও দেশ-

হিতৈষী ও সমাজ-সংস্কার প্রয়াসী ব্যক্তিরা যাহা করিতেন তাহা তাঁহারা মনে ও প্রাণে মহান্ কর্ত্তব্য বলিয়া করিতেন। কলিকাতা আসিয়া—এখানকার বাড়ী-ঘর, দোকান-পসারি, কলেজের শিক্ষা, সভা-সমিতি ও বক্তৃতা সকলই তাঁহার নিকট অভিনব বলিয়া মনে হইল। কলিকাতা আসিবার পর তাঁহার কল্পনাপ্রিয় মনে একটা উচ্চাভিলাষ জাগিল কেমন করিয়া বড় হইব, কেমন করিয়া এই মহানগরীর কীর্ত্তিমান্ পুরুষদের মত কর্ম্মক্ষেত্রে কৃতকার্য্য হইব, সংসার ও সমাজের দারিদ্র্য ঘুচাইব, ইহাই হইল তাঁহার পণ। এমন সময় তাঁহার ভাগ্যাকাশে দেখা দিল দুর্দ্দিনের মেঘ। যে-বৎসর অবিনাশচন্দ্র এফ. এ. পরীক্ষা দিতে প্রস্তুত হইয়াছেন, সে-বৎসর অগ্রহায়ণ মাসে তাঁহার অভিভাবক ও পরম হিতৈষী এবং সাহায্যকারী আত্মীয়—আনন্দশঙ্কর সেন মহাশয় চুণ্টা গ্রামে প্রাণত্যাগ করেন। পড়াশুনায় ব্যাঘাত জন্মিল। এইবার তাঁহার চিন্তা হইল কেমন করিয়া সংসার প্রতিপালন করিবেন। সংসারের সমুদয় ব্যয়-নির্ব্বাহের ভার পড়িল উনিশ বৎসরের যুবক অবিনাশ-চন্দ্রের উপর। পরীক্ষা দিলেন কিন্তু পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিলেন না। তাঁহার সেই আন্তরিক নিরাশা ও বেদনার কথা এখানে তাঁহার নিজের ভাষায় বলিতেছি :—"আজ মনে পড়িতেছে সেদিনের কথা, যেদিনে অতি শৈশবেই নিরাশ্রয় হইয়াছিলাম। আমার বাল্যে ও কৈশোরে পৃথিবীতে আপনার প্রিয়জন বলিতে যাহাদিগকে বুঝাইয়া থাকে তাঁহাদের সকলকেই আমি হারাইয়াছিলাম। ষোল বৎসর বয়স্ক তরুণের নিকট এই অসহায়

আনন্দশঙ্কর সেনের মৃত্যু

অবস্থা ও গুরুতর অর্থকৃচ্ছ্রতা চতুর্দ্দিকে বিপদের কালো মেঘই ঘনীভূত করিয়া তুলিয়াছিল। এ সমুদয় দুর্দ্দৈবের সহিত সংগ্রাম করিয়া আমাকে বিদ্যাভ্যাস করিতে হইয়াছিল। কাজেই যৌবনের প্রথম প্রভাতেই আমাকে কলেজ প্রাঙ্গণ হইতে বিদায় গ্রহণ করিতে হয়।"

অধ্যয়নের পরিসমাপ্তি

ছাত্রজীবনের শেষে আরম্ভ হইল তাঁহার কর্ম্মময় জীবন।

তৃতীয় অধ্যায়

অবিনাশচন্দ্র ঢাকা সূত্রাপুরের যে মেসে থাকিতেন, সে মেসে ময়মনসিংহ মধ্যপাড়া নিবাসী কৈলাসচন্দ্র দাশ নামক একজন যুবক থাকিয়া পড়াশুনা করিতেন। কৈলাসবাবুরা ছিলেন পাঁচ ভাই। জগচ্চন্দ্র দাশ, নবীনচন্দ্র দাশ, গগনচন্দ্র দাশ, ঈশ্বরচন্দ্র দাশ ও কৈলাসচন্দ্র দাশ। কৈলাসচন্দ্রের সহিত অবিনাশচন্দ্রের সেই ছাত্রজীবন হইতে সৌহার্দ্দ ছিল। কৈলাসবাবু অবিনাশচন্দ্রের পারিবারিক অবস্থা জানিতেন, তবু তিনি সেই ছাত্রাবস্থায় অবিনাশচন্দ্রের প্রতিভামণ্ডিত সুন্দর মুখশ্রী, প্রত্যেকটি কার্য্যে শৃঙ্খলা, কর্ত্তব্যে দৃঢ়তা, এবং কৌতুকপ্রিয় মধুর স্বভাব ও সুমিষ্ট বাক্যালাপ, তাঁহাকে অবিনাশচন্দ্রের দিকে আকৃষ্ট করিয়াছিল। কৈলাসবাবুর—অবিনাশচন্দ্রের সহিত একটা আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ হইবার ইচ্ছা ছিল। তাঁহার মধ্যম ভ্রাতা নবীনচন্দ্র দাসের জ্যেষ্ঠা কন্যা গিরিবালার সহিত অবিনাশচন্দ্রের বিবাহ দিবার জন্য তিনি ইচ্ছুক

বিবাহ ও কর্ম্মজীবন

হইলেন। এ-বিষয়ে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাদের সহিত আলাপ-আলোচনার পর তাঁহারা সম্মতি দিতে আপত্তি করিলেন না। বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হইবার সময় হইতে দাশ-পরিবার অবিনাশচন্দ্রের শিক্ষার সমুদয় ব্যয়ভার বহন করিতে সম্মত হইলেন।

বিবাহ ১২৯৯ সাল ৫ই আষাঢ় শনিবার

অবিনাশচন্দ্রের বিবাহ হইয়াছিল বাঙ্গলা ১২৯৯ সালের ৫ই আষাঢ় শনিবার। বিবাহ নবীনবাবুর বাসগ্রাম ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত মধ্যপাড়া গ্রামে হইয়াছিল। বিবাহের সময় গিরিবালা দেবীর বয়স ছিল মাত্র বারো বৎসর।

চুণ্টা হইতে মধ্যপাড়া গ্রামের দূরত্ব বড় কম ছিল না। ৩রা আষাঢ় বৃহস্পতিবার দিন বরযাত্রী দল, পুরোহিত, নাপিত এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সহ গ্রাম্য বিশিষ্ট সামাজিক ভদ্র-মহোদয় সহ যাত্রা করেন। বর ও বরযাত্রীদলকে মধ্যপাড়া

বরযাত্রা

গ্রামে নেওয়াইবার জন্য পাত্রীপক্ষ হইতে কন্যা-পক্ষের একজন বিশিষ্ট আত্মীয় ছয়খানি নৌকা তৎসহ ভৃত্য ও পাচক ব্রাহ্মণসহ চুণ্টা আসিয়াছিলেন।

বরযাত্রীদলের মধ্যে অবিনাশচন্দ্রের ভ্রাতা শ্রীযুক্ত দুর্গামোহন, জ্ঞাতি সম্পর্কে খুল্লতাত অপূর্ব্বকৃষ্ণ সেন, অবিনাশচন্দ্রের মাতুল-ভ্রাতা বিপিনচন্দ্র সেন, পুরোহিত সুদর্শনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ও পণ্ডিত সদয়চন্দ্র তর্করত্ন মহাশয় এবং অবিনাশচন্দ্রের কয়েকজন বন্ধুও ছিলেন।

আষাঢ় মাস। বর্ষাকাল। সারাদিন আকাশ মেঘে ঢাকিয়া ফেলিয়াছে। মাঝে মাঝে বৃষ্টি পড়িতেছে—বিদ্যুৎ চমকাইতেছে মেঘ ডাকিতেছে, এমনি এক দুর্য্যোগের দিনে অবিনাশচন্দ্র বিবাহ

শ্রীযুক্তা গিরিবালা দেবীর মাতা—স্বর্গীয়া কুলসুন্দরী দেবী

করিতে বরবেশে আনন্দ ও কৌতুকের সহিত গল্প করিতে করিতে :বেশ উৎসাহের সহিত কন্যার পিত্রালয়ের দিকে যাত্রা করিলেন। গিরিবালা দেবীর খুল্লতাত কৈলাসচন্দ্রের নিকট পূর্ব্ব হইতে কন্যার রূপগুণ শিক্ষা ও স্বভাবের মাধুর্য্য সম্বন্ধে অনেক কথা শুনিয়াছিলেন। কাজেই ভাবী পত্নীর সম্বন্ধে তরুণ যৌবনের আশা ও আকাঙ্ক্ষা কল্পনার রঙীন স্বপ্ন রচনা করিয়া দিয়াছিল।

চুণ্টা গ্রাম হইতে মেঘনা নদীর মধ্য দিয়া সারি সারি নৌকা চলিল। যাত্রা করিবার সঙ্গে সঙ্গে মেঘনার কালো জলে ঢেউয়ের নাচনি আরম্ভ হইয়াছিল। তাঁহারা যখন পানিশ্বর নামক গ্রামের কাছে আসিয়া পৌঁছিলেন, তখন ভয়ানক ঝড় ও বৃষ্টি আরম্ভ হইল। বাতাসের সেই ভীষণ শব্দ, মেঘের কড়্ কড় ডাক, প্রবল বর্ষণে যাত্রিগণ বিপন্ন হইয়া পড়িলেন। মেঘনা তখন প্রলয়ঙ্কর মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। ঢেউগুলি মাতিয়া উঠিয়াছে। ঝড়ের কি গর্জ্জন, মাঝিরা ভীত হইয়া তাড়াতাড়ি অসাধারণ দক্ষতার সহিত পানিশ্বর গ্রামের মধ্যবর্ত্তী একটি খালের মধ্যে পিনিশগুলি লইয়া গিয়া নিরাপদ স্থানে নোঙ্গর করিল। সারারাত্রি প্রবল বেগে ঝড়-বৃষ্টি সমভাবে চলিয়াছিল। পরদিন দুর্য্যোগের রাত্রি শেষে প্রাতঃকালে আকাশ পরিষ্কার হইল, তখন আবার সকলে যাত্রাপথে অগ্রসর হইলেন। মধ্যপাড়া গ্রামে পৌঁছিতে সারাদিন ও সারারাত্রি কাটিয়া গেল। রাত্রিশেষে তাঁহারা নিরাপদে মধ্যপাড়ার নিকটবর্ত্তী বেতালের ঘাটে আসিয়া পৌঁছিলেন। বরযাত্রীদল বরসহ নৌকাতেই রহিলেন। কন্যাপক্ষ হইতে একজন কর্তৃপক্ষীয় ব্যক্তি প্রচুর পরিমাণে মৎস্য, দুগ্ধ, দধি, ক্ষীর, তরিতরকারি, উৎকৃষ্ট

দুর্য্যোগ-ঝড়-বৃষ্টি

তণ্ডুল প্রভৃতি লইয়া আসিয়া বরযাত্রীদের ভোজনের আয়োজন করিয়া দিলেন এবং কন্যাপক্ষের ও গ্রামের ভদ্রমহোদয়েরা আসিয়া বরপক্ষের উপযুক্তরূপ সম্বর্দ্ধনা করিলেন। বরযাত্রিগণ পরম উৎসাহের সহিত রন্ধন ও ভোজন করিয়া পরিতৃপ্ত হইলেন। পুরোহিত সুদর্শনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য রন্ধন করিবার উপদেশ দিতে পরম আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

অবিনাশচন্দ্র বলিতেন—পুরোহিত সুদর্শনের সহিত পণ্ডিত সদয়চন্দ্র তর্করত্ন মহাশয়ের রহস্যালাপ সময় সময় যে বাক্‌বিতণ্ডার সৃষ্টি করিত, তাহা আমরা অত্যন্ত আনন্দের সহিত উপভোগ করিয়াছি। তর্করত্ন মহাশয়ের উপাধি সার্থক ছিল, কেননা তিনি অতি সাধারণ বিষয় লইয়াও এমন তর্ক করিতেন এবং তাঁহার প্রতিপাদ্য বিষয় সমর্থনের জন্য এত শ্লোকের পর শ্লোক আবৃত্তি করিতেন যে আমরা তাহার অর্থ না বুঝিলেও সংস্কৃত শ্লোক সিদ্ধান্তের সুস্পষ্ট উচ্চারণ আমাদের পরম উপভোগ্য ছিল। সময় সময় শ্লোকের অর্থও বিশদ ভাবে বুঝাইয়া দিতেন। তর্করত্ন সদয়চন্দ্র সত্য সত্যই একজন সুপণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন।

বরযাত্রীদিগকে দিনের বেলা এক ভদ্রলোকের বাড়ীতে থাকিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। সকলে নৌকাতে পরম তৃপ্তির সহিত ভোজন-পর্ব্ব শেষ করিয়া সেই ভদ্রলোকের বাড়ীতে উঠিয়া আসিলেন। সেখানেও আদর অভ্যর্থনার অভাব ছিল না।

অপরাহ্ণ সময়ে অনুমান বেলা চারিটার সময় বর ও বরযাত্রীদের বিবাহবাসরে লইবার জন্য দলে দলে লাঠিয়াল,

হাতী, পাল্কী, ঢোল, সানাই, জয়ঢাক এবং ঢাকা হইতে আনীত ইংরাজী ব্যাণ্ডপার্টি আসিয়া বরযাত্রীদলকে প্রমোদিত করিতে লাগিল।

বিবাহের লগ্ন ছিল রাত্রি সাড়ে আটটার পর। এজন্য সন্ধ্যার অব্যবহিত পরে বর ও বরযাত্রিগণ, পুরোহিত ও পণ্ডিত সকলে কন্যাপক্ষের প্রেরিত যান-বাহনে আরোহণে বিবাহ বাসরে উপস্থিত হইলেন। শুভলগ্নে-শুভমুহূর্ত্তে অবিনাশচন্দ্র ও গিরিবালার পরিণয়-ক্রিয়া সুসম্পন্ন হইল। সেদিন দুইটি তরুণ প্রাণ, প্রেমের যে পবিত্র দৃঢ়বন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছিলেন, সে বন্ধন যে কত বড় দৃঢ় এবং কল্যাণজনক হইয়াছিল, তাহা সকলেই জানেন।

বিবাহের তৃতীয় দিবসে বেলা দশটার সময় আহারাদির পর বর কনে সহ বরযাত্রীদল চুণ্টা অভিমুখে রওয়ানা হইলেন। ৭ই আষাঢ় সোমবার বেলা দশটার সময় যাত্রা করিয়া পরদিন ৮ই আষাঢ় মঙ্গলবার মধ্যাহ্ন সময়ে তাঁহারা নির্ব্বিঘ্নে চুণ্টা আসিয়া পৌঁছিলেন। এমনি দুর্ভাগ্য যে নববধূকে গৃহে বরণ করিয়া লইবার মত সৌভাগ্যবতী একজনও সধবা মহিলা অবিনাশচন্দ্রের বাড়ীতে ছিলেন না। পাশের বাড়ীর জ্ঞাতি খুল্লতাত কেদার সেন মহাশয়ের পত্নী আসিয়া নববধূকে গৃহে বরণ করিয়া লইয়াছিলেন। আমরা এখানে গিরিবালা দেবীর বাল্য-স্মৃতিকথা হইতে সে-সময়কার অনেক কথা জানিতে পারিতেছি। ষাট সত্তর বৎসর পূর্ব্বের পূর্ব্ববঙ্গের সামাজিক ইতিহাস অনেকের কাছেই ভাল লাগিবে। তাঁহার লিখিত বাল্যস্মৃতি হইতে তাঁহার

নববধূ গিরিবালাদেবীর চুণ্টা আগমন

বাল্য জীবনী ও বিবাহিত জীবনের প্রথম কথা এখানে উদ্ধৃত করিলাম। ইহা হইতে অবিনাশচন্দ্রের চরিত্র-চিত্রও পরিস্ফুট হইয়া উঠিবে।

গিরিবালা দেবীর বাল্যস্মৃতি

গিরিবালাদেবী লিখিত বাল্য স্মৃতি

জীবন বেদ-পুণ্য কথা। মহৎ জীবনের কাহিনী ভবিষ্যৎ বংশধরগণের জীবন গঠনে বিশেষ প্রয়োজন বলিয়া মনে হয়। আমার সামান্য জীবনের সঙ্গে মহৎ জীবনের কোন সম্পর্ক নাই। শুধু আমার পুত্র, পৌত্র, কন্যা দৌহিত্র দৌহিত্রী ও প্রিয় পরিজনদের জন্য সামান্য কিছু লিখিলাম। আমার মনে হয় তাহারা ইহা পড়িয়া আনন্দ লাভ করিবে।

স্মৃতির বড় আনন্দ। বাল্যসুলভ চপলতা ও উদারতা, আত্মভোলা ভেদবুদ্ধিজ্ঞানরহিত, বাল্যজীবনের অনাবিল আনন্দের স্মৃতি মনে উদয় হইলেই রবীন্দ্রনাথের বাণীটি মনে পড়ে:

'যত ভালোমন্দ, গীত গন্ধ লয়ে,
বিশ্ব পশিছিল তোর অবাধ আলয়ে।
দ্বার রুধি জপিতিস্ যদি মোর নাম
কোন্ পথ দিয়ে তোর চিত্তে পশিতাম॥

আমার ছেলেবেলার কথা বেশ মনে পড়ে—সকলেই আমাকে ভালবাসিতেন, আমিও সকলকে ভালবাসিতাম। আমার শৈশবের সেই ভালবাসার মধ্যে ছোট, বড়, উচ্চ, নীচ ভেদ ছিল না। প্রবাস হইতে যখন জ্যেঠা খুড়ো মহাশয়েরা বাড়ী আসিতেন, কত না আনন্দের সঙ্গে তাঁহাদের কাছে ছুটিয়া যাইতাম। তাঁহাদের মার্জিত সুন্দর কথাবার্ত্তা, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বেশভূষা চালচলন খুবই

ভাল লাগিত, আমার শৈশব-মনে এমন একটা প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল যে আমি বেশীর ভাগ সময় তাঁহাদের নিকটে থাকিতে ভালবাসিতাম। তাঁহারা বিদেশ হইতে যে সকল ভাল ভাল জিনিষপত্র আনিতেন, তাহা বাড়ীর সকলের মধ্যে বিতরণ করিতেন। আমার মনে হয়, আমি বাড়ীর সকল ছেলেমেয়েদের চেয়ে বড় ছিলাম বলিয়াই বোধ হয় সব চেয়ে ভাল জিনিষটা আমার ভাগেই সচরাচর বেশী পড়িত। লেখাপড়ার দিক্ দিয়াও আমি সকলের চেয়ে একটু ভিন্ন প্রকৃতির ছিলাম। ইহা আমার জ্যেঠামহাশয় ও কাকাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। সেকালে মেয়েদের লেখাপড়ার বিশেষ চর্চ্চা ছিল না। আমাদের বাড়ীর পাশে দুর্গাকান্ত দাশ মহাশয়ের বাড়ী ছিল। সে বাড়ীর নাম ছিল বড়বাড়ী। দুর্গাকান্ত কাকা স্ত্রী-শিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁহার চেষ্টা, যত্ন ও উদ্যোগে গ্রামে একটি পাঠশালা স্থাপিত হইয়াছিল।

গিরিবালা দেবী বলেন: স্ত্রী-শিক্ষার প্রতি তখন লোকেরত কোন আগ্রহ ছিলই না, বরং নিন্দা ও সমালোচনা হইত, তবু আমরা স্কুলে পড়িতে যাইতাম। সকাল বেলা মেয়েদের স্কুল হইত, কিন্তু আমার দু'বেলাই স্কুলে যাওয়ার নিয়ম ছিল। সকলেই আমার শিক্ষার জন্য যত্ন নিতেন। তাহার ফলে আমার শিক্ষার প্রতি অনুরাগ বৃদ্ধি পাইয়াছিল এবং গুরুজনের স্নেহভাজন হইয়াছিলাম।

সেকালের স্ত্রী-শিক্ষা
গিরিবালাদেবীর
স্মৃতি-কথা

আমি ছিলাম বাড়ীর বড় মেয়ে। আমার এক জ্যেষ্ঠতাত ভাই ময়না দাদা আমার আট মাসের বড় ছিলেন। কিন্তু আমার জ্যেঠা-মহাশয় ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন এবং আসামে সরকারী উচ্চপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি আসামের একটী জেলায় একষ্ট্রা এসিষ্টাণ্ট কমিশনারের পদে কাজ করিতেন। তিনি চরিত্র-বলে, বিদ্যা বুদ্ধি ও সম্মানে এবং

পদমর্য্যাদায় সেকালের একজন জননায়ক রূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। ছুটিতে প্রায়ই বাড়ী আসিতেন, কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া আপনার আত্মীয়-স্বজন কেহই তাঁহার সহিত একসঙ্গে বসিয়া খাওয়া দাওয়া করিতেন না। এজন্য বাড়ীর সকলেই দুঃখিত ছিলেন, কিন্তু আমার ঠাকুরদাদা মহাশয়ের প্রাণেই বেদনাটা বড় বেশী লাগিয়াছিল। সে-সময়ে সমাজে ব্রাহ্মগণ অপাংক্তেয় বলিয়া বিবেচিত হইতেন। ঠাকুরদাদার কাছে আমি যে স্নেহ ভালবাসা ও আদর যত্ন লাভ করিয়াছি জীবনে কোন দিন তাহা বিস্মৃত হইব না। আমার বয়স যখন ছয়বৎসর তখন তাঁহার মৃত্যু হয়। অতি শৈশবের সেই মধুর স্মৃতি এখনও আমার হৃদয় হইতে মুছিয়া যায় নাই।

বারো বৎসর বয়সে আমার বিবাহ হয়। শ্বশুর বাড়ী আসিয়া দেখিলাম উহা একটী শ্মশানপুরী। শোক ও বিষাদের দারুণ আঘাতে যেন সে বাড়ী হইতে প্রফুল্ল-স্ত্রী একেবারে অন্তর্হিত হইয়াছে। আমি আসিবার পর সে মরুপুরীতে যেন আনন্দের হিল্লোল বহিল। যেখানে ভাইবোনেরা স্নেহের সরস পরশ হইতে বঞ্চিত ছিল, সেখানে আমাকে পাইয়া তাহারা 'মরুভূমিতে' মরু-নির্ঝর প্রাপ্তির মত আমার স্নেহ-কোমল-স্পর্শে শান্তি লাভ করিয়াছিল। আমি শ্বশুরালয়ে আসিয়া তিনটি রত্ন লাভ করিয়াছিলাম, স্বামী ও দুইজন দেবর। লক্ষ্মণের ন্যায় স্নেহপরায়ণ দেবরদের যে অপরিসীম আদর যত্ন, ভালবাসা এবং আনুগত্য লাভ করিয়াছিলাম, তাহা চির দিনের মত আমার অন্তরে গাঁথা হইয়া রহিয়াছে। আমার একটি ননদ ছিলেন। তাঁহার ভালবাসা কখনো ভুলিতে পারিব না। আমি চুণ্টা আসিবার পর হইতে আমার সর্ব্ববিধ সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের জন্য তাঁহার চেষ্টা ছিল অপরিসীম।

আমার সেই নব বিবাহিত বালিকা জীবনের স্বামী ছিলেন গুরু, শিক্ষক, এবং জীবনের পথ-প্রদর্শক। তাঁহার কাছে যে শিক্ষা সেই

বালিকা বয়সে লাভ করিয়াছিলাম, তাহার ফলেই আমার দ্বারা আমার ভাগ্যবিধাতা এত বড় পরিবারের মধ্যে ঐক্য সাধন রূপ মধুচক্র গড়িয়া তুলিবার ক্ষমতা দিয়াছিলেন।

আমার মনে হয় পারিবারিক জীবনে সুগৃহিণী না হইলে সংসার গড়িয়া উঠিতে পারে না। এ প্রেরণা আমি আমার ঠাকুরদাদার নিকট হইতে লাভ করিয়াছিলাম। এই প্রসঙ্গে আমার ঠাকুরদাদা মহাশয়ের চরিত্রের দৃঢ়তার বিষয় একটি গল্প বলিতেছি। আমার জ্যোঠা, বাবা, কাকারা ছিলেন পাঁচ ভাই। আমার কাকা ঈশ্বর-চন্দ্র দাসের পুত্র সুরেনের জন্ম হইলে তাহাকে দেখিবার জন্য মধ্যপাড়া গ্রাম হইতে ঠাকুরদাদা ঢাকা গিয়াছিলেন। সঙ্গী ছিলাম আমি, ছোট পিসীমাতা কৃষ্ণসুন্দরী ও ভৃত্য দীননাথ। কাকার বাসায় তখন পাচক ব্রাহ্মণ ছিল না, তাঁহার ভৃত্য কামিনী রান্না-বান্না করিত। কামিনীর বাড়ী ছিল চুণ্টা গ্রামে। ঠাকুরদাদা শূদ্রান্ন গ্রহণ করিতেন না, চাকরের হাতের রান্না খাইতেন না, সেজন্য সঙ্গে লইয়াছিলেন তাঁহার অবিবাহিতা ভ্রাতুষ্পুত্রীকে। ঠাকুরদাদার জন্য ছোট পিসীই রান্না করিতেন। খুড়ীমা একদিনও শ্বশুরের জন্য রাঁধিতে যান নাই, ইহাতে ঠাকুরদাদার প্রাণে অত্যন্ত ব্যথা লাগিয়াছিল। তিনি একদিন নিজেই কাকাকে বলিলেন: ঈশ্বর, আমার বৌমার হাতের রান্না খেতে ইচ্ছা হয়েছে, তুমি বৌমাকে একদিন আমার জন্য রান্না করতে বলো।'

কাকা বলিলেন—তার শরীর ভাল না। সে রান্না করতে পারবেনা।

একথা শুনিয়া ঠাকুরদাদা এতদূর মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন যে তিনি বাড়ী ফিরিবার পথে কালীগঞ্জ নৌকা লাগাইয়া তাঁহার জামাতার সঙ্গে দেখা করিতে তাঁহাকে সংবাদ দিলেন। পিসামহাশয় ঠাকুর-দাদাকে প্রণাম করিয়া এবং আমাকে টাকা দিয়া আদর করিয়া দাদামহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন: ঈশ্বর বাবু কেমন আছেন?

দাদামহাশয় অকম্পিত কণ্ঠে উত্তর দিলেন—ঈশ্বর! ঈশ্বর কি আছে? ঈশ্বর ত নাই।

পিসামহাশয় এই কথা শুনিয়া প্রথমে হতভম্ব হইয়া পড়িয়াছিলেন, পরে কথায় কথায় বুঝিলেন, পিতা, পুত্রের ও পুত্রবধূর ব্যবহারে কতদূর মর্ম্মপীড়িত ও ক্রুদ্ধ হইয়া তবে এমন কথা বলিতে পারিয়াছিলেন।

আমাদের সমাজ হইতে দিন দিন যেরূপ ভাবে পিতা-মাতার প্রতি ভক্তি, শ্রদ্ধা এবং পারিবারিক জীবনে কর্ত্তব্য হারাইয়া সুগৃহিণীর অভাব হইতেছে, তাহাতে মনে হয় বিলাতী সভ্যতার আবির্ভাবে আমরা দিন দিন জাতীয়তা, সামাজিকতা ও শিষ্টাচার এবং গুরুজনের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতে কর্ত্তব্য হারাইতেছি। অবিনাশচন্দ্রের যোগ্যা সহধর্ম্মিণী গিরিবালা দেবীর স্মৃতি-কথা হইতে—সেকালের সমাজ-চিত্র ও তাঁহার প্রথম বিবাহিত জীবনের অভিজ্ঞতার কথা বলা হইল।

অবিনাশচন্দ্রের কর্ম্মজীবন

আমাদের দেশের মহর্ষিরা বলিয়াছেন 'গৃহিণী গৃহমুচ্যতে।' অর্থাৎ নারীই হইতেছে গৃহের প্রাণ। সমাজে ও জাতীয় জীবনে রমণী আদ্যাশক্তির ন্যায়। জাতীয় জীবনের পক্ষে একথা যেমন প্রযোজ্য, তেমনি সাংসারিক ব্যক্তিগত জীবনেও একথা অতি বড় সত্য। নারী গৃহের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, সংসারে রাজ্ঞীর পদে সে প্রতিষ্ঠিতা রহিয়াছে। তাহার মহতী শক্তি সর্ব্বত্র অব্যাহত থাকিয়া সংসারকে পবিত্র ও পুণ্যময় করিয়া তুলিতেছে। মানব-জাতির জননী নারী। যে গৃহে নারী নাই, যে গৃহে করুণারূপিণী জননী নাই, স্নেহময়ী ভগিনী নাই, নয়নানন্দদায়িনী কন্যা নাই স্নেহশান্তিপ্রদায়িনী পত্নী নাই, সে গৃহে ঐশ্বর্য্য থাকুক, মান-

সম্ভ্রম থাকুক, কিন্তু সে গৃহ অরণ্যতুল্য। এ জন্যই ঋষি কবি বলিয়াছেন :

"মাতা যস্য গৃহে নাস্তি, ভার্য্যাচ প্রিয়বাদিনী।
অরণ্যং তেন গন্তব্যং, যথারণ্যং তথা গৃহম্॥"

অর্থাৎ যে গৃহে মাতা নাই, প্রিয়বাদিনী ভার্য্যা নাই, তাহার অরণ্যে গমন করাই শ্রেয়ঃ।

একথা যে কতদূর সত্য, তাহা অবিনাশচন্দ্রের জীবনী হইতে বুঝিতে পারি। যেদিন গিরিবালা দেবী সেনপরিবারে আসিলেন, সেদিন হইতে সংসারের ভবিষ্যত গৌরবের সূচনা হইল। পরিবারবর্গের সকলের প্রাণে নব উৎসাহের সঞ্চার হইল—শান্তির আবির্ভাব হইল। নববিবাহিত অবিনাশচন্দ্র নবোদ্যমে কর্ম্মজীবন-প্রবেশে উৎসাহী হইলেন।

এখানে আমরা একটু পূর্ব্বের কথা বলিতেছি। অবিনাশচন্দ্রের পিতৃবিয়োগের অব্যবহিত পরে—নোয়াখালির ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব তাঁহাকে কুঠিতে আহ্বান করিয়া সস্নেহে বলিলেন :—

সংকল্পে দৃঢ়তা

'অবিনাশ, আমি তোমাকে একটা চাকরী দিতে ইচ্ছা করি।—তুমি বিপন্ন হয়ে পড়েছ, নইলে তোমার সংসার চলবে কেমন করে?' অবিনাশচন্দ্র বিনীত ভাবে বলিলেন—'আপনার এই স্নেহের ও দয়ার জন্য আপনাকে অসীম ধন্যবাদ জানাচ্ছি। কিন্তু আমি এত অল্প বয়সে চাকরী নিলে, জীবনে উচ্চশিক্ষা লাভ করতেও পারবো না এবং উন্নতিও করতে পারবো না। আপনি আমার প্রতি যে সহানুভূতি দেখালেন, এবং আমার পারিবারিক বিপন্ন অবস্থার জন্য সাহায্য করতে ইচ্ছা করেছেন, আপনার সেই

স্নেহ ও সহানুভূতি আমার জীবনের আশা ও আকাঙ্ক্ষাকে একদিন সফল করে তুলবে।"

সাহেব হাসিয়া সস্নেহে তাঁহার করমর্দ্দন করিয়া বলিলেন:—'তোমার কথাতে আমি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়েছি। ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন। জীবনে তুমি কৃতকার্য্য হও, আমি এ শুভ কামনা করি।"

বিপন্ন পরিবার। কিভাবে পরিজনের জীবিকা-নির্ব্বাহ হইবে, সেদিকে বিন্দুমাত্রও লক্ষ্য না করিয়া ষোল বৎসরের একটি বালক যেভাবে একজন হিতাকাঙ্ক্ষী ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট প্রস্তাবিত চাকুরী গ্রহণে অস্বীকার করিলেন, তাহা ভাবিবার বিষয় বটে।

এই সামান্য ঘটনা হইতে বুঝিতে পারা যায়, তিনি কত বড় মনের বল ও উচ্চাকাঙ্ক্ষা লইয়া জীবন-পথে অগ্রসর হইতে পারিয়া সফলতা লাভ করিয়াছিলেন।

চতুর্থ অধ্যায়

এফ্ এ পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ হইয়া অবিনাশচন্দ্র নিরাশ হইয়া পড়িলেন, আবার পড়িবেন, সে সুযোগও তাঁহার ছিল না। পিতার জ্যেষ্ঠতাত ভ্রাতুষ্পুত্র আনন্দশঙ্করের মৃত্যুতে তাঁহার পুনরায় অধ্যয়ন করিবার সুযোগ হইল না। এ সময়ে জগচ্চন্দ্র দাশ

সংসারে প্রবেশ
কর্ম্মজীবন

জ্যেঠা শ্বশুর মহাশয় শিলচর সহরে থাকিতেন, তিনি তাঁহাকে সেটেলমেণ্টবিভাগে কুড়িটাকা বেতনেএকটি কার্য্যের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। অবিনাশচন্দ্র অনেক সময় গম্ভীর ভাবে বলিতেন—'যুবকেরা সংসার—ক্ষেত্রে প্রথম প্রবেশ করিতে গেলে—উচ্চ বেতনের আশা করে, কিন্তু একথাটা তাহারা মনেও ভাবে না যে বেতন যত অল্প হউক না কেন, যাহার প্রতিভা ও শ্রমশীলতা আছে, কার্য্যের প্রতি অনুরাগ আছে, কাহারও সাধ্য নাই যে তাহার উন্নতির পথ রোধ করিতে পারে। আমি কি একদিনে কৃতকার্য্য হইতে পারিয়াছি? সামান্য ২০৲ টাকা বেতনে, আমি আমার কর্ম্মজীবন আরম্ভ করিয়াছিলাম, কিন্তু সেজন্য নিরাশ বা দুঃখিত হই নাই। আমি মনে-প্রাণে অনলস ভাবে কর্ত্তব্য করিয়াছি, শ্রম করিতে কুণ্ঠা বোধ করি নাই, বোধ হয় সেজন্যই আমি বিধাতার প্রসন্ন-দৃষ্টি লাভ করিয়াছিলাম। আমি প্রত্যেক যুবককে এই কথাই বলি, কাজ যত সামান্যই হউক না কেন, কখন নিরাশ হইবেন না, কাজ করিয়া যান, কর্ম্মের ফল বিধাতা অবশ্যই দিবেন।"

অবিনাশচন্দ্রের প্রথম কর্ম্মজীবনের আরম্ভ হয় শ্রীহট্ট সহরে। শ্রীহট্ট জেলা পূর্ব্বে ঢাকা বিভাগের কমিশনারের শাসনাধীন ছিল। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে আসাম প্রদেশের জন্য স্বতন্ত্র একজন চীফ কমিশনার নিয়োগ করার বিষয় স্থির হইলে দেখা গেল, আসামের যে আয় তাহাতে চীফ কমিশনারির ব্যয় নির্ব্বাহ হইবে না, এইজন্য আয়বহুল শ্রীহট্ট জিলাকে তৎকালে আসাম প্রদেশভুক্ত করা হয়। লর্ড নর্থব্রুক তখন ভারতের গভর্ণার জেনারেল, তিনি ঐ সময়ে শ্রীহট্ট আসিয়াছিলেন। শ্রীহট্টবাসী তৎকালে আইনবর্জ্জিত আসামের অধীনে যাইতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। লর্ড নর্থব্রুক শ্রীহট্টবাসীর সঙ্গত প্রার্থনায় সম্মত হইলেন না, কিন্তু প্রতিশ্রুতি দিলেন যে, শ্রীহট্টের আইন কানুন সম্বন্ধে কোনরূপ পরিবর্ত্তন হইবে না। শ্রীহট্টে আসামের বিধি-ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইবে না। শ্রীহট্ট আসামভুক্ত হওয়ার ফলে কালেক্টার ও ম্যাজিষ্ট্রেট পদের স্থলে ডেপুটি কমিশনারের পদ সৃষ্ট হয়। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের ১৬ই অক্টোবর তারিখ হইতে বঙ্গদেশের ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগ দার্জ্জিলিং ব্যতীত সমগ্র রাজসাহী বিভাগ এবং ভাগলপুর বিভাগের মালদহ জিলা, আসামের সহিত সংযুক্ত হইয়া সাতাইশটি জিলাতে পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম নামে এক নব প্রদেশ গঠিত হওয়ায় শ্রীহট্ট আবার পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল।

শ্রীহট্টে প্রথম

অবিনাশচন্দ্র যখন শ্রীহট্টে সেটেলমেণ্ট বিভাগে কাজ করিতে আসেন তখন তাঁহার বয়স মাত্র ২৩ বৎসর ছিল। সে সময়ে শ্রীহট্টের ডিপুটি কমিশনার ছিলেন, এফ্ এল্ হেরাল্ড্

প্রথম যৌবনে সরকারী কর্ম্মক্ষেত্রে অবিনাশচন্দ্র

(F. L. Herald, officiating), ডবলিউ এইচ্ লী (W. H. Lee,) পি. এইচ ওব্রায়েন (P. H, O Brien) এবং পুনরায় লী সাহেব ডেপুটি কমিশনার হইয়াছিলেন। শ্রীহট্ট সহরে থাকিয়া প্রথম দুই বৎসর তাঁহার কাজ করিতে হয়।

সেটেলমেণ্টের কাজ
১৮৯১—১৮৯৮

সেই সত্তর বৎসর আগের শ্রীহট্ট সহরের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য, তাঁহাকে মুগ্ধ করিয়াছিল। পাহাড়ের ধূসর ও শ্যামল শোভা, বিস্তৃত বনসুষমা, সরল সতেজ বৃক্ষের সারি, বাঁশবন, তরুণ প্রাণে আনন্দ ও উৎসাহের সৃষ্টি করিত। শাহজালালের দরগা, বিবিধ শৈব ও বৈষ্ণব দেবমন্দির, প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান—এবং চাবাগান, কুকি, খাসিয়া, সিণ্টেং, নালুং, তিপ্‌রা, মণিপুরী প্রভৃতি নানা জাতির সহিত পরিচিত হইবার সৌভাগ্য তাঁহার হইয়াছিল। অবিনাশচন্দ্র যখন শ্রীহট্ট ছিলেন, শ্রীহট্টের মুরারিচাঁদ কলেজ ও তৎসংসৃষ্ট স্কুল রায়নগরের উন্নতমনা রাজা গিরিশচন্দ্র কর্ত্তৃক পরিচালিত হইতেছিল। কলেজটি তদীয় মাতামহের নামে (১৮৯২ খৃষ্টাব্দে) প্রতিষ্ঠিত হয়। শ্রীহট্টের সুসন্তান বিপিনচন্দ্র পাল, সুন্দরীমোহন দাস প্রভৃতির চেষ্টায় কলিকাতায় স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের জন্য প্রতিষ্ঠিত "শ্রীহট্টসম্মিলনী" সভা প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় শ্রীহট্ট সহর ও পল্লীবালিকা ও কিশোরীদের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার হইতে আরম্ভ হয়।

সত্তর বৎসর
পূর্ব্বের শ্রীহট্ট

শ্রীহট্ট সহরে তখন কতিপয় ইংরাজী শিক্ষিত ব্যক্তি ব্রাহ্ম-ধর্ম্মানুরাগী ছিলেন। ইঁহারা কলিকাতা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের আদর্শানুসরণ করিয়া প্রতি রবিবার উপাসনা করিতেন।

শ্রীহট্টে ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে সর্ব্বপ্রথম ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হইয়াছিল। অবিনাশচন্দ্র অবসর সময়ে মাঝে মাঝে ব্রাহ্মসমাজে যেমন যোগদান করিতেন, তেমনি সময় সময় হিন্দুর দেবমন্দির, পূজা-পার্ব্বণ, বিশেষতঃ দুর্গোৎসব প্রভৃতিতে যোগদান করিতে ভালবাসিতেন। শ্রীহট্ট বিখ্যাত হিন্দুতীর্থ-মহাপীঠ নামে আখ্যাত। তন্ত্রে আছে :

গ্রীবা পপাত শ্রীহট্টে সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদায়িনী।
দেবী তত্র মহালক্ষ্মী সর্ব্বানন্দশ্চ ভৈরব ॥

'অন্নদামঙ্গলে' ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরের অনুবাদে আছে :

শ্রীহট্টে পড়িল গ্রীবা মহালক্ষ্মী দেবী।
সর্ব্বানন্দ ভৈরব বৈভব যাহা সেবি ॥

শ্রীহট্ট অঞ্চলে প্রচলিত পীঠমালা পুঁথিতে আছে :—

শ্রীহট্ট মে হস্ততলং দেবতারণ্যংবাসিনী।

অনেকে মনে করেন শ্রীহস্ত হইতে শ্রীহট্ট নামের উৎপত্তি হইয়াছে। শ্রীহট্টের নামোৎপত্তি সম্বন্ধে আরও অনেক কিংবদন্তী প্রচলিত রহিয়াছে। আমাদের সে আলোচনা করিবার প্রয়োজন নাই।

যৌবনে মানুষের মনে ভ্রমণের, দেখিবার ও জানিবার জন্য একটা ইচ্ছা স্বাভাবিক ভাবেই থাকে। অবিনাশচন্দ্র ও এখানে আসিয়া—এখানকার সুন্দর সুন্দর টিলা, হাওর, পীঠস্থান, প্রভৃতি যেমন দেখিতেন, তেমনি সেটেলমেণ্টে কাজ করিতেন বলিয়া শ্রীহট্টের স্থানীয় উকীল, জমিদার, তালুকদার, শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের সহিত তিনি ঘনিষ্ঠ ভাবে পরিচিত হইবার সুযোগ লাভ করিয়াছিলেন, তেমনি তাঁহাদের শ্রদ্ধা ও লাভ

করেন। সময় সময় নিকটবর্ত্তী চা বাগানগুলি দেখিয়া আসিতে ভালবাসিতেন সঙ্গে সঙ্গে চা ব্যবসায়ের বিষয় জানিয়া লইতেন। এদিকে তরুণ যুবক অবিনাশচন্দ্রের কর্ম্মনৈপুণ্য উর্দ্ধতন রাজপুরুষদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। যত বড় কঠিন ও দুরূহ কাজই হউক না কেন, তাহা তিনি নিরলসভাবে সুসম্পন্ন করিতেন। অথচ প্রত্যেকটি কার্য্যে শৃঙ্খলা, এবং নির্দ্দিষ্ট সময়ে নির্ভুল ভাবে কাজ করার ফলে তৎকালে সর্ব্বসাধারণের প্রিয় হইয়াছিলেন।

অবিনাশচন্দ্র শ্রীহট্ট সহর হইতে কানাইরঘাট বদলি হইয়া আসেন। কানাইরঘাট জয়ন্তীয়া অঞ্চলের একটি থানা।

কানাইরঘাট

এই থানার অধীনে কতকগুলি প্রসিদ্ধ বাজার ছিল। যেমন আগবাটিয়া বাজার, চাতলবাজার, বীরদল, মুখীগঞ্জ, সরকারের হাট, চান্দের হাট, ভবানীগঞ্জ, মুলাগালবাজার, গাছবাড়ীবাজার, মাণিকগঞ্জ, রাজগঞ্জ ও কানাইর ঘাট বাজার প্রভৃতি বিখ্যাত হাট ও বাজার ছিল।

কানাইরঘাট বাজার স্থানটির চারিদিকে গভীর বন-জঙ্গল ও টিলা থাকায়, সেইস্থানে নানা আরণ্য হিংস্র-জন্তুর বাস ছিল। বন্যহস্তী, ব্যাঘ্র (Royal Tiger), চিতাবাঘ, (Leopard) খুপি বাঘ (Wolf), গণ্ডার,—শ্রীহট্ট জিলার দক্ষিণাংশে গণ্ডারের পাল বিচরণ করিত। মহিষ, মেটনা (বন গোরু), হরিণের মধ্যে "শিঙ্গাল", খাটলী বা আমড়াখাউরী নামক দুই জাতি হরিণ, বন্যশূকর, লজ্জাবতী বিড়াল, বনবিড়াল, কাষ্ঠ বিড়াল, উদবিড়াল, বাড়ল নামক বিড়াল জাতীয় জন্তু, শজারু, শশক, শৃগাল, বন্যরোহিত, নকুল, (নেউল) প্রভৃতি বিবিধ

জন্তু কানাইরঘাট অঞ্চলে দেখা যাইত। কানাইরঘাট শিকারী-দের একটি ক্রীড়াস্থল ছিল। বহু দেশী ও ইংরাজ শিকারী এ-অঞ্চলে শিকার করিতে আসিতেন।

কানাইরঘাট হইতে জয়ন্তীয়ার ধূসর গিরিশ্রেণী দেখা যায়। এক সময়ে জয়ন্তীয়া রাজ্য শ্রীহট্টের উত্তর ও পূর্ব্বাংশ পরিব্যাপ্ত ছিল। দক্ষিণে সুরমানদী এই রাজ্যের সীমান্ত রক্ষা করিত। কানাইরঘাট জয়ন্তীয়া অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

ব্যাঘ্রশিকারে অবিনাশচন্দ্র

কানাইরঘাট পল্লীতে অবিনাশচন্দ্র কয়েকজন সহযোগী কর্ম্মচারীসহ একটি বাসা ভাড়া করিয়া মেসের মত করিয়াছিলেন এবং সেখানে এক সঙ্গে বাস করিতেন। এস্থানে সমুদয় জিনিষপত্র যেমন সুলভ ছিল তেমনি স্থানীয় লোকের সরল অনাড়ম্বর ব্যবহার ও তাঁহার বড় ভাল লাগিত। এস্থানটির নিকটবর্ত্তী পল্লীবাসীরা প্রায়ই বাঘের আক্রমণ-ভয়ে ভীত থাকিত। একবার নিকটবর্ত্তী গ্রাম্য লোকেরা আসিয়া সংবাদ দিল—বাঘের উৎপাতে তাহারা নিরাপদে বাস করিতে পারিতেছে না। আজ গোরুটা, কাল ছাগল, ভেড়া এমনকি দুই একজন মানুষকেও বাঘে মারিয়া ফেলিয়াছ। সে সময়ে কানাইরঘাটে গিরিশচন্দ্র দাস নামে একজন সরকারি কর্ম্মচারী থাকিতেন। গিরিশবাবুও একষ্ট্রা এসিষ্টাণ্ট কমিশনার ছিলেন। তাঁহার বাড়ী ত্রিপুরা জেলার অন্তর্গত বিনোদপুর গ্রামে ছিল। বিনোদপুর নবীনগর থানার অন্তর্ভুক্ত ছিল। গিরিশবাবু তখন কানাইরঘাট থাকিয়া সরকারি কার্য্য পরিচালনা করিতেন। তিনি সে সময়ে তখনকার সেটেলমেণ্ট অফিসার ছিলেন। গিরিশবাবু নিজে ভাল শিকারী ছিলেন,

কোথাও কোন শিকারের সন্ধান পাইলেই দল বাঁধিয়া শিকার করিতে যাইতেন। নিকটবর্ত্তী গ্রামের লোকেরা একদিন আসিয়া তাঁহাকে বলিল :—"হুজুর, আমাদের অঞ্চলে বাঘের উৎপাতে বাস করা অসম্ভব হয়ে পড়েছে, আপনি—যদি বাঘ শিকার করতে আসেন তবে আমাদের গ্রামের লোকের প্রাণ বাঁচবে।"

গিরিশবাবু গ্রামবাসীদের অনুরোধে শিকারে যাইতে প্রস্তুত হইলেন। দক্ষ শিকারীদলসহ গিরিশবাবু বন্ধুজনের সহিত শিকারে চলিলেন। তিনি অবিনাশচন্দ্রকে বলিলেন : "অবিনাশ শিকারে যাবে ?"

অবিনাশচন্দ্র পরম উৎসাহসহকারে শিকারে চলিলেন।

এক হাতীর উপর গিরিশবাবু ও তাঁহার দুইজন বিশিষ্ট শিকারী বন্ধু চড়িলেন, অপর হাতীর পৃষ্ঠে অবিনাশচন্দ্র ও দুইজন স্থানীয় শিকারী সঙ্গী হইলেন। গ্রামের লোকদের মধ্যে দুই তিন জন পথ-প্রদর্শক হিসাবে এবং বাঘের বাসস্থান দেখাইবার জন্য সর্ব্বাগ্রে একজন শিকারীসহ একটা হাতীর পিঠে চড়িয়া চলিতে লাগিল।

অবিনাশচন্দ্র বলিয়াছেন : আমরা ক্রমশঃ একটা গ্রামের কাছে আসিলাম। একটা ছোট নদী পার হইতে হইল। পাহাড়িয়া নদী, তাহাতে জল অতি অল্পই ছিল। নদীর পর পারে একটি গ্রাম আরম্ভ হইয়াছে। সেই গ্রামের পাশে গভীর জঙ্গল। সে জঙ্গলের পেছনে ছোট ছোট কয়েকটি টিলা। তাহার উপরও ঘন জঙ্গল। আমাদের পথপ্রদর্শক আমাদিগকে একটা নিবিড় বনপ্রান্তে পৌছাইয়া বলিল—হুজুর! এ বনের মধ্যেই বাঘ

থাকে। আমাদের সঙ্গীয় লোকেরা একটা ছোট হাওরের (বিলের) পাশে তাঁবু খাটাইতে লাগিল, ঘণ্টা দুইয়ের মধ্যেই আমাদের থাকার, খাওয়ার এবং বিশ্রাম করিবার ব্যবস্থা হইল। গিরিশবাবু বলিলেন: "আমরা চা ও সামান্য জলযোগ করেই শিকারের জন্য জঙ্গলে ঢুকবো। ফিরে এসে খাওয়া দাওয়া করবো।" তাহাই হইল। আমাকে বলিলেন, "প্রস্তুত হও।" তাড়াতাড়ি সব কাজ শেষ করিয়া শিকারের জন্য আবার হাতীর পিঠে চড়িলাম। আমার হাতেও তিনি একটা রাইফেল ও কিভাবে প্রয়োজন হইলে উহা ছুড়িতে হইবে তাহা শিখাইয়া দিয়াছিলেন। জীবনে এমন সুযোগ আবার কবে মিলিবে? সোৎসাহে আবার শিকার-সন্ধানে চলিলাম। মাহুতেরা হাতী গুলিকে খাওয়াইয়া লইয়াছিল।

আমাদের এই অভিযান নিবিড় বনের মধ্য দিয়া চলিল। গিরিশবাবুর নির্দ্দেশমত পূর্ব্বদিন গ্রামবাসীরা বনের একটা নিভৃত স্থানে জলার ধারে দুইটা মহিষ বাঁধিয়া রাখিয়াছিল।

আমরা যে জঙ্গলপথে চলিলাম, সে বনের মধ্যে পথ নাই বলিলেই চলে। কতকগুলি লোক পূর্ব্বেই জঙ্গল ভাঙ্গিতে গিয়াছিল। সেই বনে বৃক্ষের চূড়ায় ডালে-ডালে বানরেরা দলে-দলে কিচির-মিচির শব্দ করিতে করিতে, এডালে ওডালে লাফালাফি ও ছুটাছুটি করিতেছিল। পাখীরা নানা সুরে গান করিতেছিল। আমরা সন্ত্রস্তভাবে চারিদিকে লক্ষ্য রাখিয়া অগ্রসর হইতেছিলাম। নির্দ্দিষ্ট স্থানে আসিয়া দেখিলাম বাঘ একটা মোষকে আধখানা খাইয়া একটা টিলার ধারে টানিয়া নিয়া রাখিয়াছে। অন্য একটি মহিষ করুণ-সুরে চীৎকার

করিতেছিল। সেদিন আমরা ব্যর্থ মনোরথ হইয়া সন্ধ্যার একটু আগে ক্লান্ত দেহে তাঁবুতে ফিরিয়া আসিলাম। আমাদের খাওয়া দাওয়া সারিতেই রাত্রি হইল। গিরিশবাবু বলিলেন: "বাঘ যে কাছে আছে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই, তবে তাকে দেখতে যে কখন পাওয়া যাবে তারও কোন ঠিকানা নেই।"

গ্রামের একজন সর্দ্দার গোছের লোক যোড়হাত করিয়া কহিল: "হুজুর মানুষ-খেকো বাঘটাকে যদি শিকার না করেন, তবে বর্ষা পড়লে শিকার চলবে না। আমাদেরও গাঁ ছেড়ে পালাতে হবে।"

কথাটা যে সত্য তাহাতে সন্দেহ নাই। পাহাড়িয়া অঞ্চলের বর্ষার সঙ্গে যাদের পরিচয় আছে তারা একথাটা বিশেষভাবেই জানেন। আমরা যে সময়ে শিকার-সন্ধানে বাহির হইয়াছিলাম, তাহার কিছুকাল পরেই বর্ষা আরম্ভ হইবার সম্ভাবনা ছিল। সেই সর্দ্দার আরও বলিল: "হুজুর, বাঘ একটা নয় দু'টো। একটা বাঘ ও আর একটা বাঘিনী।"

গিরিশবাবু তাহার কথা শুনিয়া কহিলেন: "কথা সত্য। তবে বাঘকে দেখ্‌তে না পেলে ত আর শিকার করা চলেনা। আমরা যেখানে মোষটাকে আধ খেকো অবস্থায় দেখেছিলাম, তার আর একটু দূরে একটা বড় গোছের মোষ বেঁধে রাখো, তবে ভাল হবে।"

লোকটা বলিল, "কোন দরকার নেই হুজুর! ঐ একটা মোষ ত আছেই, আজ রাত্তিরটা যেতে দিন, কাল খুব সকালে, আপনারা দু' দিক দিয়ে ও যায়গায় চলুন; নিশ্চয়ই বাঘটাকে দেখতে পাবেন।"

যাঁরা দক্ষ শিকারী তাদের মনে একটু গর্ব্ব থাকে, তাঁরা পরের পরামর্শ বড় একটা নিতে চাননা। গিরিশবাবু গম্ভীর ভাবে বলিলেন:—"সর্দ্দার, আমি কাল কিভাবে শিকারে বের হবো, তা রাত্রিতে ভেবে দেখি! তোমরা সব সজাগ থেকো।" তারপর সর্দ্দার ও দু'জন স্থানীয় শিকারীকে ডাকিয়া বলিলেন—"তোমরা রাত্রিতে ভাল করে পাহারা দিও।"

আমরা রাত্রিতে ঘন ঘন বাঘের ডাকে চমকিয়া উঠিতেছিলাম। গভীর নিদ্রার মধ্যেও বাঘের ভয়ে মাঝে মাঝে সন্ত্রস্ত হইতেছিলাম। আজ আমরা দুইদলে বিভক্ত হইয়া খুব ভোরে শিকারে বাহির হইলাম। বেশ সুন্দর সকালটি ছিল। আমরা আজ টিলার আড়ালে লুকাইয়া রহিলাম। গিরিশবাবু হাতীটাকে পাহাড়ের একপাশে এমনভাবে রাখিলেন যে হাতীর উপর হইতে ফাঁকা যায়গাটি গাছের ভিতর দিয়া বেশ ভালভাবে দেখা যায়। আমরাও অপর দিকে হাতীর পিঠে রহিলাম। আর একজন শিকারীও জঙ্গলের অপর প্রান্তে রাইফেল হাতে করিয়া প্রস্তুত রহিল।

আজ আমাদের শুভদিন বলিতে হইবে। একটু পরেই সকলে বিস্মিতভাবে দেখিলাম, একটা বাঘ ঝোপের ভিতর হইতে উঁকি মারিতে লাগিল। তার সঙ্গে সঙ্গে পাশের আর একটা ঝোপও অল্প অল্প নড়িতে লাগিল। তারপর দু'টি প্রাণীই বিড়ালের মত গুঁড়ি মারিতে মারিতে খোলা যায়গায় যেখানে মোষ একটা বাঁধা ছিল, সেখানে আসিয়া মহিষটার দিকে এগুতে আরম্ভ করিল। কিছুদূর অগ্রসর হইয়া দু'টি বাঘই খানিকক্ষণ বনের এদিকে ওদিকে তাকাইয়া নিশ্চল অবস্থায়

মোষের কাছে আসিল। শিকারী কি এমন সুযোগ ছাড়িতে পারে? ঠিক্ এ-সময় গুড়ুম্ করিয়া বন্দুকের শব্দ হইল। আমিও সঙ্গে সঙ্গে তাক্ করিয়া বন্দুক ছুড়িলাম। একটা বাঘ তখন ভীষণ চীৎকার করিয়া লাফাইয়া উঠিয়াছে। আবার দু'দিক্ হইতেই গুড়ুম্ গুড়ুম্ গুড়ুম্ শব্দ হইতে লাগিল। বাঘটা মাটিতে পড়িয়া ছট্‌ফট্ করিতেছিল। আর একটা গুলিতে বাঘটা একেবারে মারা পড়িল। বাঘিনী যে কিভাবে কোন্ সুযোগে পলাইয়া গিয়াছিল, তাহার কোন সন্ধান মিলিল না! দেখিতে দেখিতে বনের মধ্যে একটা হৈ-চৈ পড়িয়া গেল। বহুলোক আসিয়া জড় হইল। আমরা বহুকষ্টে বাঘটাকে লোক-জন সহকারে তাঁবুতে নিয়া আসিলাম। এই শিকারের গৌরব গিরিশ বাবুই লাভ করিলেন। অন্য শিকারীদের মধ্যে যাঁহারা বাঘিনীকে লক্ষ্য করিয়া গুলি করেন তাঁহাদের গুলি ব্যর্থ হইয়া একটা মহিষের গায়ে লাগিয়া মহিষটা বাঘের হাত হইতে রক্ষা পাইয়া থাকিলেও, আমাদের হাতে মারা পড়িল।

সে রাত্রিতে গ্রামের বহু লোক আসিয়া বাঘটাকে দেখিয়া গেল। পর দিন সেই গ্রাম্য সর্দ্দার আসিয়া বলিল—"হুজুর, বাঘটা মরলো বটে, বাঘিনীটা কিন্তু মারা পড়ে নাই, খুব সতর্ক মত থাকবেন। বাঘিনী বাঘের চেয়ে ও হিংস্র-প্রকৃতির।"

গিরিশবাবু আলবোলার নল টানিতে টানিতে প্রসন্ন-মুখে বলিলেন—"আমি বাঘিনীটাকে না মেরে কানাইরঘাটে ফিরে যাব না।"

সে রাত্রিতে আমরা দলের সকলে নিশ্চিত মনে নিদ্রা গেলাম।

পরের দিন মহোৎসাহের সহিত গিরিশবাবু আমাদের দল-বল সহ শিকারে রওয়ানা হইলেন। আমরা খানিক দূর অগ্রসর হইতেই দেখিতে পাইলাম, সেই বাঘিনীটা ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি ধরিয়া সেই মৃত মহিষের পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়া আছে। গিরিশবাবু নির্ভীক ভাবে হাতীর উপর হইতে তাহাকে লক্ষ্য করিয়া গুলি করিলেন। বাঘিনীটা গুলির আঘাতে বিচলিত না হইয়া হাতীর উপর লাফাইয়া পড়িল। সে এক ভীষণ ভয়াবহ দৃশ্য! আমাদের হাতের বন্দুক হাতেই রহিল! সেই ভয়ঙ্কর দৃশ্য ভীত চিত্তে লক্ষ্য করিতে লাগিলাম। গিরিশবাবু আবার বাঘিনীকে গুলি করিলেন—তাঁহার বন্দুকের গুলি বাঘিনীর শির দাঁড়া লক্ষ্য করিয়া এমন ভাবে ছুড়িয়াছিলেন, যে বাঘিনীটা গুলির আঘাতে মাটিতে পড়িয়া ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল, আর এক গুলিতেই তার সব যন্ত্রণার অবসান হইল। আমিও অবশ্য গুলি ছু'ড়িয়াছিলাম, যখন বাঘিনীর জীবন-লীলা প্রায় শেষ হইয়াছে!

অবিনাশবাবু কোন দিন কথা-প্রসঙ্গে শিকারের কথা উঠিলেই তাঁহার এই শিকারের অভিজ্ঞতার গল্প করিতেন পরম উৎসাহের সহিত হাত পা নাড়িয়া নানা ভাবে, তাহা পরম উপভোগ্য হইত।

কানাইরঘাটে কর্ম্মদক্ষতাগুণে তিনি উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীগণের অত্যন্ত প্রশংসাভাজন হইয়াছিলেন। একবার সেটেলমেণ্ট বিভাগের কোনও উর্দ্ধতন কর্ম্মচারী গিরিশবাবুর বিশেষ বন্ধু কানাইরঘাটের সেটেলমেণ্ট কার্য্য পরিদর্শন করিতে আসিয়া অবিনাশচন্দ্রের কার্য্য-নৈপুণ্যে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে

তাঁহার অফিসে শিলচরে লইয়া যান, গিরিশবাবু আপত্তি করিয়া বলিয়াছিলেন—"অবিনাশকে না নিলেই কি হয় না?" অবিনাশ বেশ কাজের লোক।'

উর্দ্ধতন অফিসার হাসিয়া বলিলেন—সেজন্যইত তাকে নিতে চাইছি। ঐ কথার পর গিরিশবাবু আর কোনও আপত্তি করিলেন না।" অবিনাশচন্দ্র প্রথমে বদরপুরে আসিলেন। বদরপুর বর্ত্তমানে একটি বিখ্যাত স্থানে পরিণত হইয়াছে। এখন সেখানে মস্তবড় রেলওয়ে জংশন হইয়াছে। তখনকার দিনে বদরপুর সেইরূপ প্রসিদ্ধি লাভ করে নাই। একটি বড় রকমের বন্দর ছিল। অবিনাশবাবু এখানকার কাজ করিয়া শিলচরে আসেন।

শিলচর একটি প্রসিদ্ধ স্থান। এখানকার চারিদিকে বহু চা বাগান আছে। অনেক প্রসিদ্ধ ব্যক্তি এস্থানে জন্মগ্রহণ করিয়া দেশের নাম উজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন। স্বর্গত দেশ-প্রেমিক কামিনীকুমার চন্দ মহাশয় শিলচরে থাকিতেন। তখন তাঁহার ছাত্র জীবন শেষ হইয়াছে মাত্র। অবিনাশবাবু শিলচরে সেটেলমেণ্টের কাজে আসিয়া এখানকার নানা ব্যক্তির সহিত পরিচিত হইয়াছিলেন। নিকটবর্ত্তী চা বাগানে তখন বাঙ্গলার নানা জেলার লোকেরা কাজ করিতেন। তাঁহারা প্রায়ই সহরে আসিতেন, এবং সেটেলমেণ্ট সম্পর্কিত কার্য্যেও তাহাদের প্রয়োজন থাকিত। অবিনাশবাবু তাহাদের আহ্বানে মাঝে মাঝে চা-বাগানে বেড়াইতে যাইতেন এবং সেখানকার ভদ্রলোকদের সৌজন্যে ও আপ্যায়নে প্রীতিলাভ করিতেন। চা-বাগানের প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে এবং কি ভাবে চা উৎপন্ন হয়,

বদরপুর ও শিলচর

কি ভাবে তাহা রপ্তানী করা হয়, কলকারখানা, কুলি ইত্যাদি সর্ব্ববিষয়েই অভিজ্ঞতা লাভ করিবার জন্য তাঁহার মনোযোগ ছিল।

তৎকালে আসামের কুলিদের প্রতি অত্যাচার কাহিনী ধারাবাহিক ভাবে নানা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইত। 'সঞ্জীবনী' পত্রিকায় লিখিত সে সকল লোমহর্ষণ কাহিনী পড়িয়া বাঙ্গলা দেশের লোকেরা চা-কর সাহেবদের অত্যাচার কাহিনী শুনিয়া উত্তেজিত হইতেন। চা-কর সাহেবদের অত্যাচারে কত হতভাগ্য কুলি যে অকালে প্রাণ হারাইত তাহার অবধি ছিল না। চা-কর সাহেবরা চা বাগানের একচ্ছত্র সম্রাট ছিলেন বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তাঁহারা যাহা করিতেন, তাহাই হইত। এমনকি জেলার ডেপুটি কমিশনার প্রভৃতি উচ্চপদস্থ রাজ-কর্ম্মচারীদেরও

চা-কর সাহেবদের কুলীদের প্রতি অত্যাচার

তাহাদের অত্যাচারের প্রতিকারে সাহসী হইতেন না। সে সময়ে বাঙ্গলা দেশে কুলিদের অত্যাচার কাহিনী লইয়া গভীর আন্দোলন চলিয়াছিল। আমরা এখানে সে বিষয়ে প্রয়োজন বোধে একটু আলোচনা করিতেছি।

অবিনাশচন্দ্র শিলচরের নিকটবর্ত্তী ভারনারপুর নামক একটি চা-বাগান দেখিতে গিয়াছিলেন। সেখানে তিনি নিজ চক্ষে কুলীদের দুর্দ্দশা দেখিয়া তাঁহার ভ্রাতা দুর্গামোহনকে সে সকলের উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছিলেন, ঃ "মানুষ মানুষের উপর যে কিরূপ নৃশংস অত্যাচার করিতে পারে তাহা চোখে না দেখিলে বুঝিতে পারিবে না। প্রতিদিন কুলীদের উপর শ্বেতাঙ্গ ম্যানেজারের অত্যাচার দেখিলে মনে হয়, ভারতবাসী আমরা কি বর্ব্বরতা সহ্য

অবিনাশচন্দ্র সেন ও শ্রীযুক্তা গিরিবালা দেবী----পুত্র শ্রীমান্ অনিল সহ

করিয়াই না নিজ দেশে জীবন কাটাই। ভাই, সে সব কথা যখন ভাবি, তখন মনে হয়, বিধাতা কবে আমাদের দেশের প্রতি প্রসন্ন হইবেন।"

আমরা এখানে প্রসঙ্গ-ক্রমে সেকালের 'কুলীআইন' সম্বন্ধে আলোচনা করিলাম। ভবিষ্যৎ কালে অবিনাশচন্দ্র ও কয়েকটি চা-বাগানের মালিক হইয়াছিলেন, সেই কর্ম্মজীবন হইতেই তাঁহার চা-বাগানের ও চা-উৎপাদনের প্রতি লক্ষ্য ছিল এবং চায়ের ব্যবসায় যে বিশেষ লাভজনক তাহাও তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার তরুণ মনে ইহাও বোধগম্য হইয়াছিল যে, চায়ের ব্যবসায়ের মত একটি লাভজনক ব্যবসায় কেবল ইংরাজ চা-করদের হাতে ছাড়িয়া দিলে, বাঙ্গলাদেশের ও ভারতের অর্থাগমের পক্ষে ক্ষতিজনক, এজন্যই চা-বাগানের প্রতি তাঁহার একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ ছিল।

কুলী আইন ও চা বাগানে দ্বারকানাথ

আসামের কুলীদের প্রতি যে অত্যাচার হইত, সে বিষয়ে বাঙ্গলার সাধারণ লোকেরা বড় একটা জানিতেন না বা লক্ষ্যই করিতেন না। এ বিষয়ে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কর্ত্তৃপক্ষ এদিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ১৮৮১ সালে ব্যবস্থাপক সভায় Assam Immigration Bill বা কুলীআইন উপস্থিত করা হয়। সে সময়ে সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজের দৃষ্টি কুলীদিগের প্রতি আকর্ষিত হয়। তাহার কারণ ব্রাহ্ম-সমাজের প্রচারকগণ ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের জন্য বাঙ্গালাদেশের নানা অঞ্চলে ঘুরিয়া বেড়াইতেন। তাঁহাদের মধ্যে পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্ন প্রায়ই আসাম

১৮৮২ সালের কুলীআইন

অঞ্চলে যাইতেন এবং চা-বাগানে গিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিতেন। তাঁহার এইরূপ বিভিন্ন চা-বাগানে ধর্ম্ম প্রচার করিবার ফলে, তিনি কুলীদের প্রকৃত অবস্থা জ্ঞাত হইয়া কলিকাতার নেতৃবৃন্দের নিকট সে সমুদয় কথা বিবৃত করেন।

"১৮৮২ সালের ৫ই জানুয়ারী যখন আসাম কুলীআইন তার শেষ নিষ্পত্তির জন্য 'সিলেক্ট কমিটি' কর্তৃক ব্যবস্থাপক সভায় উপস্থাপিত হয়, তখন ঐ বিষয়ে বক্তৃতা-প্রসঙ্গে সভা-গৃহে লর্ড রিপণ বলেন :

"They" [The British Indian Association] "prees upon us in their memorial, this point of the ignorance of the Cooly, and give a curious extract from a book published by a missionary of the Brahmo Samaj, to show how very ignorant a great number of the Coolies who engage to go to Assam are."

রামকুমার বিদ্যারত্ন মহাশয় কুলীদের অবস্থা যাহা প্রত্যক্ষ করিয়া আসিয়াছিলেন সে সমুদয় কাহিনী লইয়া একখানি পুস্তক ছাপানো হয়। প্রস্তাবিত কুলীআইন বিষয়ে ভারতবর্ষীয় সভা (ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান্ এসোসিয়েসান্) যে 'মেমোরিয়াল' পাঠান, তাহাতে উক্ত পুস্তক হইতে বর্ণনা উদ্ধৃত করা হয় এবং ঐ বই তদানীন্তন বড়লাট লর্ড লিটনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

এই সময়ে ওয়েব মোকদ্দমা (Webb Case) নামে এক বিখ্যাত মোকদ্দমায় দেশময় আন্দোলন উপস্থিত হয়। ওয়েব নামে চা-বাগানের একজন "অর্দ্ধশ্বেত" (Anglo Indian) ম্যানেজারের অকথ্য অত্যাচারের ফলে এক কুলীরমণীর মৃত্যু হয়।

শ্বেতাঙ্গ বিচারকের বিচারে—Mr Webb ওয়েব সাহেব সামান্য কিছু জরিমানা দিয়াই রেহাই পাইল। এই ঘোর অবিচারে সর্ব্বত্র প্রতিবাদ উঠে। Justice Murdered—Brahmo Public Opinion এবং Bengal Public Opinion পত্রিকায়—ঐ বিষয়ে বিশেষ ভাবে আলোচনা হইয়াছিল। সেকালের বর্ত্তমান Indian Messesnger পত্রিকায় "Justice Murdered" ব'লে, সমস্ত মামলার সংবাদ দিয়ে দু'অঙ্কে মোট চারিটি দৃশ্যে ঐ বিচার-প্রহসনের একটি বিবরণ বার হয়।

শুধু তা'তেই সে সময়ে ভুবনমোহন,দুর্গামোহন, আনন্দমোহন, দ্বারকানাথ, বিপিনচন্দ্র প্রভৃতির দল সন্তুষ্ট থাকতে পারলেন না। দেখা যায়, বিলাতী পার্লামেণ্টের ভোট-দাতা ইংরেজ জন-সাধারণের কাছে আপীল ক'রে ৪ পেজী ফুলস্ক্যাপ আকারের ১৬ পৃষ্ঠা ব্যাপী একখানি পত্রী (pamphlet) সরাসরি ব্রাহ্ম-সমাজ থেকে প্রকাশ না ক'রে 'সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ প্রেস' থেকে প্রকাশ করা হয়, বিলেতে প্রচারের উদ্দেশ্য। নীচে তার আখ্যাপত্র দেওয়া হল। এই পত্রী প্রকাশে দ্বারকানাথের যে বিশেষ হাত ছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নাই।

"Presented to the Electors of Great Britain and Ireland. "*Justice Murdered in India.*" The papers, of the Webb Case, Recording the Sacrifice of a Daughter of India to the lust of an Anglo Indian." Calcutta, Printed and Published by the Sadharan Brahmo Samaj Press, 45 Beniatola Lane."

দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় সে সময়ে ব্রাহ্ম-সমাজের মধ্যে একজন দুঃসাহসিক সমাজসংস্কারক এবং দেশপ্রাণ ব্যক্তি ছিলেন। উনবিংশ শতাব্দী বাঙ্গলাদেশের সুবর্ণ যুগ।

এসময়ে বাঙ্গালা দেশে যে সকল মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তাঁহাদের নাম ইতিহাসের পৃষ্ঠায় চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। বিক্রমশালী সন্তানের জন্মভূমি বিক্রমপুরের অন্তর্গত মাগুরাখণ্ড গ্রামে

দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়

সুবিখ্যাত 'বেঘের কুলীন' বংশে দ্বারকানাথ ১২৫১ অব্দের ৯ই বৈশাখ (ইং ১৮৪৪) জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা কৃষ্ণ-প্রাণ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় কুলীন সমাজের শিরোমণি ছিলেন। ধনীর কন্যা হইয়াও দ্বারকানাথের জননী যখন ঢাকা থেকে পুরী পর্য্যন্ত হেঁটে গিয়ে জগন্নাথ দর্শনের সঙ্কল্প করিলেন, তখন অনেকেই আপত্তি করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি কাহারও কথা না শুনিয়া নিজের সঙ্কল্প পূর্ণ করিয়াছিলেন। "মায়ের এই দৃঢ় প্রতিজ্ঞ স্বভাব, অটল জেদ ও অদম্য সাহস, চরিত্রগুণ হিসেবে পুত্র দ্বারকানাথের পূর্ণমাত্রায় বর্ত্তে ছিল; এবং তা সর্ব্বপ্রথম প্রকাশ পেয়েছিল বেগের কুলীনের এই দুর্জয় ছেলের মধ্যে, কৌলিন্য-প্রথার বিরুদ্ধে উদ্দীপনায়, উদ্যমে ও ব্রত-উদ্‌যাপনায়।"

নারীজাতির কল্যাণকল্পে, সমাজের হিত-সাধনে, দেশের সেবার জন্য তিনি বহু অসাধ্য সাধন করিয়া গিয়াছেন। "অবলা-বান্ধব" সম্পাদক কর্ম্মবীর দ্বারকানাথ শুধু স্মারকলিপি প্রেরণ, পত্রিকায় কুলীদের প্রতি অত্যাচার কাহিনী প্রকাশেই তৃপ্তিলাভ করিতে পারিলেন না।" তিনি নিজে প্রত্যক্ষ ভাবে চা-বাগানে কুলীদের অবস্থা দেখবার জন্য রওনা হলেন আসামে, ভারতসভার তরফ থেকে। চা-কর সাহেব অঞ্চলে রীতিমত আতঙ্ক উপস্থিত হ'ল,

চা-বাগানে দ্বারকানাথ

আসামের চা-বাগানে অকস্মাৎ এই ভয়শূন্য দুর্দ্দান্ত বঙ্গ-শার্দ্দুলের

অবিনাশচন্দ্র সেন ও পত্নী গিরিবালা দেবী, পুত্র শ্রীমান্ অনুপম, শ্রীমতী রেণুকা, খোকন ও মণি

আবির্ভাবে! তাঁর গতিবিধির উপর কড়া নজর রাখা হ'ল, এমন কি সঙ্গে যাঁরা ছিলেন তাঁদের উপরও। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁর 'আত্মচরিতে'—"আসামে প্রচার-যাত্রা' সম্বন্ধে লিখিয়াছেন :—

"খার্সিয়াং হইতে ফিরিবার কয়েকদিন পরে অর্থাৎ ১৮৮৬ সালের জুলাই মাসে আমি ধর্ম্মপ্রচারার্থ আসাম প্রদেশে গিয়া ধুব্ড়ী, গোয়ালপাড়া, গৌহাটি, তেজপুর, নওগাঁ, শিবসাগর, ডিব্রুগড় ও শিলং এই সমুদয় স্থানে গমন করি। যে কারণে এই প্রকার যাত্রার বিবরণ মনে আছে তাহা এই। আমি ধুব্ড়ী হইতে ডিব্রুগড় অভিমুখে যাত্রা করিলে পথিমধ্যে একস্থানে আমার স্বর্গীয় বন্ধু দ্বারকানাথ গাঙ্গুলি আসিয়া আমার সঙ্গে জুটিলেন। তিনি সঞ্জীবনীর এজেণ্টরূপে আসিয়াছিলেন, এবং ভারতসভার সহকারী সম্পাদকরূপে আসামের কুলীআইনের কার্য্য বিষয়ে ও অপরাপর কোনও কোনও বিষয়ে অনুসন্ধান করিবার জন্য আসিয়া ছিলেন। কিন্তু তিনি আমার সঙ্গে জোটাতে এক নূতন ব্যাপার ঘটিল। যেখানে যাই এবং বক্তৃতার নোটিশ বাহির করি, সেখানেই ইংরাজ কর্ম্মচারিগণ সেখানকার উকীল ও অপরাপর ভদ্রলোকদিগকে জিজ্ঞাসা করেন, "এ শিবনাথ শাস্ত্রী কে? এ কি কুলিআইন প্রভৃতি রাজনীতি-মূলক বিষয়ে অনুসন্ধানার্থ আসিয়াছে?" "তাঁহারা বলেন না," ইনি ব্রাহ্মধর্ম্ম-প্রচারক। প্রশ্ন, "তবে দ্বারকানাথ গাঙ্গুলি সঙ্গে কেন?" উত্তর, "দু'জনে বন্ধুতা আছে, সেজন্য একসঙ্গে বেড়াইতেছেন, এই মাত্র।" কর্ম্মচারিগণের সতর্কতার প্রমাণ

শিবনাথ শাস্ত্রী ও দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়

কোনও কোনও নগরে পাইলাম। সেই সেই স্থানের ডেপুটি কমিশনার প্রভৃতি ইংরাজ কর্ম্মচারীরা কেহ কেহ আমার বক্তৃতা-দিতে উপস্থিত হইতে লাগিলেন।

এমন কি, ডিব্রুগড়ে যেদিন আমার বক্তৃতা হয় সেদিন ভয়ানক দুর্য্যোগ, বক্তৃতাস্থলে গিয়া দেখি স্থানীয় ভদ্রলোকেরা অনেকে আসিতে পারেন নাই, কিন্তু ডেপুটি কমিশনার উপস্থিত।"

"অনেক সময় প্রকৃত অবস্থা জানবার জন্য দ্বারকানাথকে গোপনে চা-বাগানে কুলিদের সঙ্গে কুলি হয়ে বাস ক'রে তথ্য সংগ্রহ করতে হয়েছে। তাঁকে বিপদে ফেলবার জন্য প্রচুর বিত্ত ও প্রতাপশালী চা-কর শ্বেতাঙ্গ সাহেবরা অনেক চেষ্টা করেন কিন্তু পারেন নি। কথিত আছে, ফিরবার পথে কোনো কোনো জায়গায় খড়-বোঝাই গাড়ীতে, খড়ের গাদার তলায় লুকিয়ে আসতে হয়েছিল অপরাজেয় দ্বারকানাথকে, দেশের কাছে স্বার্থলোলুপ শ্বেতাঙ্গ বণিক্‌দের সেই অসহ্য অত্যাচার কাহিনী শোনাবার জন্য।

কল্‌কাতায় ফিরে এসে সব্যসাচী দ্বারকানাথ যুগপৎ জ্বালাময় অগ্নিবাণ বর্ষণ সুরু করলেন, বাংলা ভাষায় "সঞ্জীবনীতে' ও ইংরেজী ভাষায় Bengaleeতে (সে সময়ে তাঁদের সুবিখ্যাত সাপ্তাহিক পত্রিকা Bengal Publio Opinion দৈনিক Bengaleeর সঙ্গে মিশে গিয়েছে। এর কিছু আগেই, ১৮৮৪ সালে ইলবার্ট বিল আন্দোলনের বৎসরে, দ্বারকানাথ গঙ্গো-পাধ্যায় তাঁর কয়েকটি বন্ধুর সহযোগে 'সঞ্জীবনী' পত্রিকা স্থাপন করেন ও তার প্রথম সম্পাদক হন। ১৮৮৪ সাল থেকে ঐ পত্রিকার শিরোভূষণ বীজ ও মন্ত্র ছাপান হয়, 'সাম্য, 'মৈত্রী,

স্বাধীনতা"। এইবার, অগ্নিময় ভাষায়, ধারাবাহিক ভাবে অত্যাচার কাহিনী ছাপা হতে থাক্‌ল, "ভারতে লেগ্রীর সন্তান' ('লেগ্রী' হ'ল Uncle Tom's Cabin এর মার্কিনী নিগ্রো ক্রীতদাস) 'Bengalee'তে একই সময়ে ধারাবাহিক প্রবন্ধ চল্‌ল "Slave Trade in British Dominion."

কংগ্রেস-ইতিহাসে শ্রমিক-আন্দোলন

দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় ছিলেন অসমসাহসিক কর্ম্মী যাহা ধরিতেন, তাহা সর্ব্বতোভাবে সুসম্পন্ন করিতে যত্নপরায়ণ হইতেন। তিনি ও তাঁহার সহ-কর্ম্মীগণ প্রকাশ্যভাবে আড়কাঠিদের হাত থেকে কুলি-উদ্ধারে, ব্রতী হ'লেন। * * তারপর ১৮৮৮ সালের ২৫শে, ২৬শে ও ২৭শে অক্টোবর ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকারের সভাপতিত্বে কলিকাতায় যখন বঙ্গীয় প্রাদেশিক-সম্মেলনীর সর্ব্বপ্রথম অধিবেশন হয়, সেই সময়ে আসামের হতভাগ্য কুলিদের অবস্থাই দেশের সর্ব্বপ্রধান সমস্যা ও ঐ অধিবেশনের প্রধানতম আলোচ্য ব'লে স্থির হয়। তদানীন্তন ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রচারক বাগ্মী বিপিনচন্দ্র পাল কুলীআইন রদের প্রস্তাব উত্থাপন করেন এবং "দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় এক সুদীর্ঘ বক্তৃতায় বিপিনবাবুর প্রস্তাব সমর্থন করেন এবং কি করিয়া আড়কাঠিদের হাত হইতে বহু কুলিকে রক্ষা করা হইতেছে তাহার বর্ণনা প্রদান করেন।"

"এই সব বঙ্গীয় নেতারা চেষ্টা করেন, যাতে ক'রে এই কুলীদের স্বার্থরক্ষার ভার নিখিল ভারতীয় কংগ্রেস স্বয়ং গ্রহণ করেন। ভারতীয় কংগ্রেস বিষয়টি প্রাদেশিক ব'লে, গ্রহণ করতে গোড়ায় নারাজ ছিলেন। দ্বারকানাথ প্রমুখ বাংলার

নেতৃবৃন্দ দেখান যে, আসামের কুলীরা ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে সংগৃহীত, সুতরাং ব্যাপারটি মোটেই প্রাদেশিক নয়, ও-টী একটী নিখিল-ভারতীয় সমস্যা। দীর্ঘকাল ধ'রে ভারতীয় কংগ্রেসকে দিয়ে আসামের চা-বাগানের শ্রমিক-প্রশ্নকে ভারতের জাতীয় প্রশ্ন ব'লে গ্রহণ করাতে পারা যায় নি। ইতিমধ্যে, প্রধানত বাংলাদেশের আন্দোলনের ফলে ১৮৯৩ সালে কুলী আইন সম্পূর্ণ রদ না হ'লেও, তা'কে সংস্কার করতে গবর্ণমেণ্ট বাধ্য হন। তখনও ভারতীয় কংগ্রেস এ বিষয়ে নিজেদের কর্ত্তব্য বোঝেন নি।

১৮৯৬ সালের কলিকাতা কংগ্রেস

অবশেষে, ১৮৯৬ সালে, কলকাতার সহরে অনারেবল এস, আর, সয়ানি (M. R. Sayani)র সভাপতিত্বে কংগ্রেসের যে অধিবেশন হয় সেই অধিবেশনেই সর্ব্বশ্রেণীর প্রতিনিধিস্বরূপ ভারতীয় জাতীয় মহাসভা 'ইণ্ডিয়ান্ ন্যাশন্যাল কংগ্রেস্' জমিদার মধ্যবিত্ত প্রভৃতি উচ্চতর শ্রেণীর স্বার্থ—মাত্রকে অতিক্রম ক'রে সর্ব্বপ্রথম আসামের কুলি ও মজুর স্বার্থকে, তাদের দাবীকে, বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থের ও দাবীর অঙ্গ হিসেবে অন্ততঃ কথার দ্বারাও, স্বীকার করিতে বাধ্য হ'ন। এ'বছর নিম্নলিখিত পঞ্চদশ সংখ্যক প্রস্তাবটি কংগ্রেস কর্ত্তৃক গৃহীত হয়:

Repeal of Emigration Act.

15. That having regard to the facility of intercourse between all parts of India and Assam, this congress is of opinion that the time has now arrived when the Inland Emigration

Act. I of 1882 as amended by Act VII of 1893 should be repealed."

অবিনাশচন্দ্র যখন স্কুলে পড়িতেন সে সময় হইতেই সংবাদ-পত্র এবং জাতীয় আন্দোলন সম্পর্কিত সমুদয় বিষয়ের প্রতি অনুরাগী ছিলেন। সাময়িক পত্রিকাদি পড়িয়া এবং কুলী আইন বিষয়ক আন্দোলন, প্রাদেশিক সম্মিলনীর সর্ব্বপ্রথম অধিবেশনে যে আলোচনা ও প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল, তাহা তিনি জানিতেন তারপর কংগ্রেসের প্রস্তাবটিও তাঁহার অজ্ঞাত ছিল না। এই সব কারণেই তিনি কুলীদের অবস্থা প্রত্যক্ষভাবে অনুভব করিবার জন্য চা-বাগানে গিয়াছিলেন এবং চাবাগানের কুলীদের হইতে সর্ব্ববিষয়ে অনুসন্ধান দ্বারা অভিজ্ঞতা লাভ করেন। একারণেই আমরা প্রয়োজনীয় মনে করিয়া তৎকালীন চাবাগান ও কুলী-আইন সম্বন্ধে আলোচনা করিলাম।

অবিনাশচন্দ্র একে একে বদরপুর ও শিলচরে কার্য্য করেন। রায়বাহাদুর শরচ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তখন কাছাড়ের সেটেলমেণ্ট অফিসার ছিলেন, তিনি অবিনাশ-চন্দ্রের কার্য্যে বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়া বদরপুর হইতে তাঁহাকে শিলচরে লইয়া আসেন। শিলচরে অবিনাশচন্দ্র প্রায় চারি বৎসরকাল ছিলেন। তাঁহার পত্নী গিরিবালা দেবীও সে সময় শিলচর গিয়াছিলেন। এ সময়ে স্থানীয় লোকেরা তাঁহার মধুর স্বভাবের গুণে ছোটবড় সকলেই অত্যন্ত আকৃষ্ট হইয়া পড়েন। গরীব-দুঃখীরা তাহাদের অভাব অভিযোগ অকপটে আসিয়া অবিনাশচন্দ্রের নিকট বলিত তিনিও দয়ার্দ্র স্বভাব-বশতঃ বিনা দ্বিধায় প্রতিকার করিতে উদ্যোগী হইতেন।

কলিকাতা আগমন

এ সময়ে নিজ নিজ স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য বহু ধনী ব্যক্তি তাঁহাকে অর্থের প্রলোভন দেখাইতেও কুণ্ঠিত হন নাই, এমন কি অনেকে এইরূপ বলিতেন :—'আপনি আমাদের স্বার্থ যাহাতে বজায় থাকে তাহা করুন, আপনাকে আমরা এমন অর্থ দিব তাহার দ্বারা বাকী জীবন সুখে ও স্বাচ্ছন্দ্যে অতিবাহিত করিতে পারিবেন।' অবিনাশচন্দ্র এইরূপ অসাধু প্রস্তাব ঘৃণার সহিত প্রত্যাখ্যান করিতেন, এবং ঐ শ্রেণীর লোকদের সঙ্গে ভবিষ্যতে দেখা সাক্ষাৎ পর্য্যন্ত করিতেন না। তাঁহার নৈতিক চরিত্রবল, কর্ত্তব্যনিষ্ঠা এবং মানসিক শক্তির জন্য অনেকেই তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিতেন।

এখানে একটি পূর্ব্বকথার উল্লেখ করিয়া অবিনাশচন্দ্রের সহৃদয়তার পরিচয় দিতেছি। এণ্ট্রান্স পরীক্ষার অব্যবহিত পরে তাঁহার বিমাতার মৃত্যু হইল। বৈমাত্রেয়া ভগিনী সৌদামিনীর তখন বিবাহযোগ্যা বয়স হইয়াছে। বিবাহ দিতে হইবে, কিন্তু অর্থ কোথায়? এদিকে ব্রাহ্মণবাড়িয়া মহকুমার অন্তর্গত কালীকচ্ছ গ্রাম নিবাসী কুঞ্জবিহারী দত্তগুপ্ত পোষ্টমাষ্টারের সহিত সম্বন্ধ স্থির হইয়াছিল। কুঞ্জবাবু তখন মণিপুরে পোষ্টমাষ্টার ছিলেন। অবিনাশচন্দ্র বাড়ীতে আসিলেন এবং নিজের গলার 'কেচ্‌লি' (সোনার হার) আংটি এবং নিজের জলখাবার পয়সা হইতে যে সামান্য অর্থ সঞ্চয় করিয়াছিলেন, সেই অর্থ দিয়াএবং নানারূপে অর্থ সংগ্রহ করিয়া ভগিনীর বিবাহ দিয়াছিলেন। বাল্যে, কৈশোরে ও যৌবনে তাঁহার মধ্যে যে সদাশয়তা, দানশীলতা এবং মহানুভবতা ছিল তাহা কর্ম্মজীবনে প্রথম বয়সে কিরূপভাবে উদ্ভূত হইয়াছিল এ ঘটনাটি তাহার অন্যতম পরিচায়ক।

স্বর্গত জগচ্চন্দ্র দাশ

১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে আসামের সেটেলমেণ্টের কার্য্য শেষ হইল। এখন কোন্ দিক্ দিয়া কোন্ পথে অগ্রসর হইবেন, তাহাই হইল চিন্তার বিষয়। যে কয় বৎসর সেটেলমেণ্টে কাজ করিয়াছেন, তাহাতে যে অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছেন, তাহার দ্বারা সাংসারিক ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়া তেমন কিছুই সঞ্চয় করিতে পারেন নাই। সুনিপুণা গৃহিণী—গিরিবালা দেবী তাঁহার গৃহস্থালী গুণে বেশ দক্ষতার সহিত সংসার পরিচালনা করিয়াছেন।

কলিকাতার কর্ম্মজীবনের প্রারম্ভকাল

জ্যেষ্ঠতাত শ্বশুর জগচ্চন্দ্র দাস মহাশয় এসময়ে অবিনাশ চন্দ্রের সাহায্যে অগ্রসর হইলেন। সুবিখ্যাত মার্টিন কোম্পানীর অন্যতম কর্ণধার স্যার রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, জগৎ বাবুর ছাত্র ছিলেন। জগৎবাবু ছাত্র রাজেন্দ্রনাথকে ভ্রাতুষ্পুত্রী জামাতাকে তাঁহার অধীনে কোন একটি উপযুক্ত কার্য্য দিবার জন্য অনুরোধ করিয়া পত্র দিলেন। ছাত্র রাজেন্দ্রনাথ শিক্ষকের অনুরোধ রক্ষা করিতে বিলম্ব করিলেন না। তিনি জগৎ বাবুকে লিখিলেন—আপনি অগৌণে আপনার জামাতা শ্রীমান্ অবিনাশচন্দ্রকে আমার নিকট কলিকাতা পাঠাইয়া দিবেন। কলিকাতা আসিয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করিলেই আমি তাহার উপযুক্ত কার্য্যে নিয়োগ করিব।"

মার্টিন কোম্পানীর কার্য্য

পরিবার পরিজনকে বাসপল্লী চুণ্টা গ্রামে রাখিয়া——অবিনাশচন্দ্র কলিকাতা আসিলেন। কলিকাতা আসিয়া রাজেন্দ্রনাথের সহিত সাক্ষাৎ করিলে পর—তিনি তাঁহাকে

৪০৲ চল্লিশ টাকা মাসিক বেতনের একটি কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন।

মার্টিন কোম্পানীতে অবিনাশচন্দ্র এক বৎসর কাল কার্য্য করিয়াছিলেন। কিন্তু এখানে কর্ত্তৃপক্ষের পুনঃ পুনঃ প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও এক বৎসর কর্ত্তৃপক্ষের সন্তোষজনক কার্য্য করিয়াও যখন বেতন বৃদ্ধি হইল না এবং ভবিষ্যতের কোন আশা ও উন্নতির সম্ভাবনা দেখিলেন না, তখন তিনি মার্টিন্ কোম্পানীর কার্য্য পরিত্যাগ করিলেন এবং কোন্ পথে কি ভাবে কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইবেন, তাহাই ভাবিতে লাগিলেন এবং এজন্য কলিকাতার সর্ব্বত্র সন্ধান লইতে লাগিলেন—তাঁহার ভবিষ্যত কর্ম্মপন্থা স্থির করিবার জন্য—এমন সময়ে তাঁহার এক অপূর্ব্ব সুযোগ আসিয়া উপস্থিত হইল। যে সুযোগের বলে তিনি ভবিষ্যত জীবনে কলিকাতার একজন শ্রেষ্ঠ নাগরিক, প্রধানতম ব্যবসায়ী এবং সর্ব্বজনপ্রিয় উদ্যমশীল ব্যক্তিরূপে সমাজের সর্ব্বত্র সম্মানিত হইয়া গিয়াছেন। পরবর্ত্তী অধ্যায়ে সেবিষয়েই আলোচনা করিলাম।

পঞ্চম অধ্যায়

ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালাদেশের সাহিত্য, রাষ্ট্রনীতি, সমাজনীতি, ধর্ম্ম এবং স্ত্রীশিক্ষা প্রভৃতি বিষয়ে যাঁহারা অগ্রণী ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, স্যুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, আনন্দমোহন বসু, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, রামগতি ন্যায়রত্ন, প্রসন্নকুমার রায়, রাজা দিগম্বর মিত্র, বিপিনচন্দ্র পাল, শিবনাথ দুর্গামোহন দাশ, ভুবনমোহন দাশ, দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতি ব্যক্তিগণ সমাজের নেতৃস্থানীয় ছিলেন।

দুর্গামোহন দাশ

দুর্গামোহন দাশ মহাশয় সেকালে সমাজের একজন শ্রেষ্ঠ ও সম্মানিত ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার ন্যায় উদার ও মহৎব্যক্তি বড় কম ছিল। বিক্রমপুরস্থ তেলিরবাগ একটি প্রসিদ্ধ গ্রাম। এই গ্রামের বিশেষ প্রসিদ্ধি কালীমোহন দাশ, দুর্গামোহন দাশ, ভুবনমোহন দাশ, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, সতীশরঞ্জন ও প্রফুল্লরঞ্জন দাশের জন্মভূমি বলিয়া। কালীমোহন দাশ, দুর্গামোহন দাশ ও ভুবনমোহন দাশের পিতা ৺কাশীশ্বর দাশ মহোদয় বরিশালের প্রসিদ্ধ উকীল ছিলেন। তিনি বিবিধ সাধুকার্য্যের অনুষ্ঠান দ্বারা বরিশালে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া গিয়াছেন।

জ্যেষ্ঠ কালীমোহন দাশ মহাশয় প্রথম জীবনে আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া প্রথমে বরিশালে ওকালতি করেন, পরে হাইকোর্টে ওকালতি করিতে আরম্ভ করিয়া বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেন। কালীমোহনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা দুর্গামোহন দাশ ১৭৬৩

শকে (১২৪৮ সালে) ইংরাজী ১৮৪১ খৃঃ অঃ ৩রা অগ্রহায়ণ তেলিরবাগ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবে মাতৃহীন হইয়া প্রথমে তিনি তাঁহার খুড়ার নিকট কালীঘাটের বাসায় থাকিয়া লেখাপড়া করিতেন, পরে বরিশালে ইংরেজী স্কুল খুলিলে তথায় গিয়া লেখাপড়া করিতে থাকেন। জেলা স্কুল হইতে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়েন। পরে ওকালতি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বরিশালের আদালতে ওকালতি ব্যবসায় করিতে আরম্ভ করেন। এই ব্যবসায়ে তিনি প্রচুর ধন উপার্জ্জন করেন। ধর্ম্মমতে তিনি ব্রাহ্ম ছিলেন। ১৩০৪ সালের ৪ঠা পৌষ ইনি পরলোকগমন করেন।

দুর্গামোহন দাশের তিন পুত্র,—সত্যরঞ্জন, সতীশরঞ্জন, ও যতীশরঞ্জন, ইঁহারা তিনজনেই ব্যারিষ্টার ছিলেন।

দুর্গামোহনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা সুপ্রসিদ্ধ এটর্ণি, ভূতপূর্ব্ব ব্রাহ্ম পাবলিক্ ওপিনিয়নের সুযোগ্য সম্পাদক, ব্রাহ্মসমাজের প্রথিত-নামা কর্ম্মীগণের মধ্যে ভুবনমোহন দাশের নাম স্মরণীয়। ভুবনবাবু, কালীমোহন ও দুর্গামোহন বাবুর কনিষ্ঠ সহোদর। পিতা কাশীশ্বর বাবুর খুড়তুত ভাই স্বর্গীয় জগদ্বন্ধু দাশ মহাশয় ইঁহাকে পোষ্যপুত্ররূপে গ্রহণ করেন।

ভুবনবাবু ঢাকা কলেজে শিক্ষা-লাভ করিয়া প্রথমে এটর্ণি ও পরে হাইকোর্টের উকীল হন। আইন-ব্যবসায় ইঁহাদেরপুরুষানুক্রমিক। ভুবনবাবুর জ্যেষ্ঠপুত্র চিত্তরঞ্জন,—দেশপ্রেমিক চিত্তরঞ্জন দাশের ব্যারিষ্টারিতে প্রচুর অর্থাগম হইত কিন্তু তিনি দেশের সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়া ব্যারিষ্টারি ব্যবসায় পরিত্যাগ করেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের নাম ভারতবাসীর হৃদয়ে চিরস্মরণীয় হইয়া

রহিয়াছে। ইঁহার তৃতীয় ভ্রাতা বসন্তরঞ্জন তরুণ বয়সে প্রাণত্যাগ করেন। দ্বিতীয় পুত্র প্রফুল্লরঞ্জন পাটনা হাইকোর্টের জজ ও ব্যারিষ্টাররূপে সর্ব্বত্র খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন।

এই দাশ-পরিবার কলিকাতায় এক সময়ে ধনেমানে ও গৌরবে সবিশেষ প্রসিদ্ধি ও সম্মানলাভ করিয়াছিলেন এখনও সেই বংশের গৌরব ও যশঃ অন্তর্হিত হয় নাই। এখনও হাইকোর্টের জজ শ্রীযুত সুধীররঞ্জন দাশ প্রভৃতি জীবিত থাকিয়া এই বংশের নামোজ্জ্বল করিয়াছেন ও করিতেছেন।

এই দাশ পরিবারের সহিত অবিনাশচন্দ্রের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল, তাহা যেমন ব্যবসায়-ক্ষেত্রে তেমনি বন্ধুত্ব এবং আত্মীয়তা-সূত্রেও উল্লেখযোগ্য।

দুর্গামোহন দাশ মহাশয়ের জ্যেষ্ঠপুত্র সত্যরঞ্জন দাশ মহাশয়, অবিনাশচন্দ্রের জ্যেষ্ঠতাত শ্বশুর জগচ্চন্দ্র দাশ মহাশয়ের ভায়রাভাই ছিলেন। জগচ্চন্দ্র ও সত্যরঞ্জন উভয়েই স্যার কে, জি গুপ্তের দুই ভগিনীকে বিবাহ করিয়াছিলেন।

সত্যরঞ্জন ব্যারিষ্টারি হিসাবেও যেমন প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া-ছিলেন, তেমনি ব্যবসায়-বাণিজ্যের দিক্ দিয়াও তাঁহার বিশেষ আগ্রহ ছিল এবং দেশের ও জাতির উন্নতির জন্য অত্যন্ত উৎসাহী ছিলেন এবং তদনুরূপ নিজেও সেদিকে অগ্রসর হইয়াছিলেন এবং উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করিতে পারিয়াছিলেন। এখানে সে বিষয়ের আলোচনা করিতেছি।

স্বর্গত জগচ্চন্দ্র দাশ মহাশয় বরাবরই অবিনাশচন্দ্রের প্রতি স্নেহশীল ছিলেন। উক্ত দাশ মহাশয় প্রথমে

৺কালীনারায়ণ গুপ্ত মহাশয়ের দ্বিতীয়া কন্যা সৌদামিনী-দেবীকে বিবাহ করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর দাশ মহাশয় উক্ত গুপ্ত মহাশয়ের চতুর্থা কন্যা সরলাদেবীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। সত্যরঞ্জন দাশ মহাশয় ও কালীনারায়ণ গুপ্তের পঞ্চমা কন্যা বিমলাদেবীকে বিবাহ করেন। স্যার কে, জি গুপ্ত (কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্ত আই, সি, এস্) ছিলেন কালীনারায়ণের পুত্র। এই আত্মীয়তাসূত্রে জগচ্চন্দ্রের পরিবারের সহিত দুর্গা-

জীবনবীমার কথা

মোহন দাশের পরিবার ও পরিজনদের মধ্যে বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে,—দুর্গামোহন দাশ দেশের কল্যাণকামী একজন মহানুভব ব্যক্তি ছিলেন। তিনি দেশের স্ত্রী-পুরুষের সকলের যাহাতে উন্নতি হয়, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি পায় সে বিষয়ে সর্ব্বদা লক্ষ্য রাখিতেন। আমাদের বাঙ্গলাদেশের জীবনবীমার প্রধান ও প্রথম প্রবর্ত্তক হিসাবে সত্যরঞ্জন দাশ একজন। বাঙ্গলাদেশের সকলেই Messrs. Durga Mohan Das and sons, Chief agent of the Empire of India Life Assurance Company, Limited for Bengal, Bihar and Orissa Assam.

Empire of India

এই নামের সহিত পরিচিত। সে প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে বোম্বাই সহরে Empire of India, জীবনবীমা কোম্পানীর প্রতিষ্ঠা হয়। বোম্বাই সহরের ২৯ নং এস্প্লেনেড্ রোডের একটি ক্ষুদ্র কক্ষে এই বিখ্যাত কোম্পানীর জন্ম হয়। ১৮৯৬-৯৭ খ্রীষ্টাব্দে বোম্বাই সহরে সংক্রামকরূপে প্লেগ দেখা দিয়াছিল, তাহারই ফলে সহরের ব্যবসায়-বাণিজ্য প্রভৃতি বিনষ্টপ্রায় হয়, এবং সহস্র সহস্র লোকের

স্বর্গত সত্যরঞ্জন দাশ—বার-এট্-ল.
এম্পায়ার অব ইণ্ডিয়া জীবনবীমা কোম্পানীর বাঙ্গালায়
সর্ব্বপ্রথম চীফ এজেন্সী গ্রহণ করেন

মৃত্যু ঘটে। এই মহামড়কের জন্য যদিও কোম্পানী ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে রেজেষ্টরী করা হইয়াছিল কিন্তু উহার প্রকৃত কার্য্য আরম্ভ হইল ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দ হইতে, নানা-প্রকার অসুবিধার মধ্য দিয়া ক্ষুদ্রভাবে যে 'Empire of India' জীবন-বীমা কোম্পানীর প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল, তাহাই বর্ত্তমানে জগদ্বিখ্যাত "Empire of Indian Life Assurance Company" নামে পরিচিত। সেই অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে আমাদের দেশে ভারতীয় জীবনবীমা কোম্পানী (Indian Life Insurance Company) স্থাপন করা যে কত বড় দুঃসাহসিকতার পরিচয় তাহা সহজেই অনুমেয়। এই কোম্পানীর পরিচালক ও প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে দুইজন পার্শী ব্যবসায়ী ও দেশহিতৈষী ব্যক্তি মিঃ ই, এফ্ এলাম (Mr. E. F. Allum) এবং মিঃ আর, ই, ভারুচার (Mr. R. E. Bharuha) নাম কোম্পানীর ইতিহাসের সহিত চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। বর্ত্তমান সময়ে 'Empire of India' জীবনবীমা প্রতিষ্ঠানটির নাম যেমন জনসাধারণের পরিচিত, তেমনি এই কোম্পানীর দ্বারা যে কতলোকের অন্নসংস্থান, কত বিধবার এবং অসহায় পরিবারের বাঁচিয়া থাকিবার পথ হইয়াছে, তাহাও সর্ব্বজনবিদিত।

বোম্বাইয়ে প্লেগ

১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাস হইতে এই জীবনবীমা কোম্পানীর পরিচালকগণ বোম্বাই প্রদেশে শুধু ইহার কার্য্য পরিচালনা সীমাবদ্ধ না রাখিয়া বাঙ্গালা, বিহার, উড়িষ্যা, আসাম এবং অন্যান্য প্রদেশে ও ইহার প্রসারের জন্য উদ্যোগী হইলেন। সে সময়ে "National Agency Company" নামে Empire

কলিকাতার এজেন্সী প্রতিষ্ঠা

of India জীবনবীমা কোম্পানীর Chief Agency ৬ নং ওল্ড পোষ্ট অফিস ষ্ট্রিটে প্রতিষ্ঠিত হয়। স্বর্গীয় দুর্গামোহন দাশের জ্যেষ্ঠপুত্র সত্যরঞ্জন দাশ ব্যারিষ্টার মহোদয় এই কোম্পানীর চীফ্ এজেন্সী গ্রহণ করেন ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে। ইহার পরের বৎসর ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে আসামের এজেন্সীও তিনি গ্রহণ করিলেন। দুর্গামোহন দাশ মহাশয়ের জ্যেষ্ঠপুত্র মিঃ এস্ আর দাশ (Mr. S. R. Das), এই ন্যাশনাল এজেন্সীর পরিচালনভার গ্রহণ করেন। ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বরে মাসে মিঃ এস্ আর্ দাসের মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তিনি উক্ত কোম্পানীর কর্ণধার ছিলেন।

মিঃ এস্, আর দাশ খ্যাতনামা ব্যারিষ্টার ছিলেন, কিন্তু ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রতি তাঁহার একটা স্বাভাবিক অনুরাগ ছিল, তিনি যে সময়ে এম্পায়ার অব্ ইণ্ডিয়া জীবনবীমা কোম্পানীর চীফ এজেন্সী গ্রহণ করেন, সে সময়ে তিনি কয়েকটি চা বাগানেরও পরিচালন ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। কাজেই তাঁহার পক্ষে ন্যাশন্যাল এজেন্সীর কার্য্য ভার আশানুরূপ ভাবে একা পরিচালনা করা সম্ভবপর ছিল না। এই সময়ে অবিনাশচন্দ্র মার্টিন কোম্পানীর কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া কি করিবেন, তাহাই ভাবিতেছিলেন। সত্যরঞ্জন দাশ মহাশয় যখন তাঁহার সহকারীরূপে একজন যোগ্য ব্যক্তির সহযোগিতা চাহিতেছিলেন, সেই সময়ে জগচ্চন্দ্রদাশ মহাশয় জামাতা অবিনাশচন্দ্রের কোন-রূপ সুবিধা তিনি করিতে পারেন কিনা, সে বিষয়ে অনুরোধ করিয়া মিঃ দাশকে একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন। তাঁহার এইপত্র পাইয়া তৎক্ষণাৎ মিঃ দাশ অবিনাশচন্দ্রকে তাঁহার সহযোগীরূপে

ন্যাশন্যাল এজেন্সীতে যোগদান করিতে অনুরোধ করেন। ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দের কথা। সে সময়ে এম্পায়ার অব ইণ্ডিয়ার আফিস ৩ নং হেয়ার ষ্ট্রীটে অবস্থিত ছিল, ১৯১৭ সাল পর্য্যন্ত এম্পায়ার অব্ ইণ্ডিয়া জীবন বীমা কোম্পানীর কার্য্যালয় উক্ত হেয়ার ষ্ট্রীটের বাড়ীতেই ছিল, পরে ওখান হইতে ৭নং হেয়ার ষ্ট্রীটে স্থানান্তরিত হইল। ন্যাশান্যাল এজেন্সী কোম্পানী (National Agency Company) যেমন এম্পায়ার অব্ ইণ্ডিয়ার চীফ এজেন্সী লইয়াছিলেন, তেমনি কয়েকটী চা-বাগানের ও পরিচালনভার তাঁহাদের ছিল। এজন্য ১৯০১ সালে কোম্পানীর ন্যাশন্যাল এজেন্সীর কর্ম্ম পরিচালনার সুবিধার জন্য দুইভাগে বিভক্ত হইল। চা কোম্পানীর পরিচালনার ভার ন্যস্ত হইল ন্যাশন্যাল এজেন্সীর উপর, আর জীবন বীমা কোম্পানীর কার্য্য পরিচালনার ভার গ্রহণ করিলেন, মেসার্স দুর্গামোহন দাশ এণ্ড সন্স (Messrs Durga Mohan Das & Sons)।

অবিনাশচন্দ্রের ন্যাশন্যাল এজেন্সীতে যোগদান ১৮৯৯

১৯২২ সালে অফিস ৭।১ ওয়েলেস্‌লি প্লেসে স্থানান্তরিত হয়, এবং তাহার অল্পদিন পরে ১৯২৩ খৃষ্টাব্দের মে মাসে ২৮নং ড্যালহৌসি স্কোয়ারের বৃহৎ বাটীতে স্থানান্তরিত হয়, বর্ত্তমানেও সেইখানেই অফিস অবস্থিত।

অবিনাশচন্দ্র জীবনবীমা কোম্পানীতে এবং ন্যাশানাল এজেন্সীতে যোগদান করিবার কিছু পূর্ব্বে, ঢাকা সহরস্থিত ৺কালীনারায়ণ গুপ্ত মহাশয়ের ১৪ নং লক্ষ্মীবাজার ষ্ট্রীটের বাড়ী

১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের জ্যৈষ্ঠ মাসে ভূমিকম্পের অব্যবহিত পরে ৺গগনচন্দ্র দাশ মহাশয় ভাড়া লইয়াছিলেন। গগনবাবু তখন ঢাকা সহরে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। গিরিবালাদেবীর খুল্লতাত এই ৺গগনচন্দ্র দাশ মহাশয়ের বাসভবনে ১৩০৪ বাংলা সনের ২০শে কার্ত্তিক ইংরাজী ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের ৫ই নভেম্বর অবিনাশচন্দ্রের জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীমান্ অমিয়ের জন্ম হইয়াছিল।

জ্যেষ্ঠ পুত্র অমিয়ের জন্ম

যেদিন শুভলগ্নে অবিনাশচন্দ্র ন্যাশানাল এজেন্সী ও ডি, এম্ দাস এণ্ড সন্সের কার্য্য ভার গ্রহণ করিলেন, সেদিন হইতে এই কোম্পানীর দিন দিন উন্নতি হইতে আরম্ভ হইল। "Empire of India" জীবনবীমা কোম্পানীর Golden jubilee ১৮৯৭—১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে হইয়াছিল। সে সময়ে কোম্পানী হইতে যে পুস্তিকা প্রচারিত হইয়াছিল, তাহাতে লিখিত হইয়াছে :—"From 1st March 1923, the firm was a private limited company with the late Mr. A. C. Sen as its Managing Director. That the agency is so large and the company has bocome so well known in Bengal is mainly due to Mr. A. C Sen's organising ability." তারপর অবিনাশচন্দ্রের মৃত্যুর কথা উল্লেখ করিয়া লিখিত হইয়াছে :—"The Company now records with deep regret the sad news of his death a little before the publication of this brochure. A towering figure in the field of Life Insurance in Bengal, his

death will be a loss not only to the Company but to the Insurance world at large."

১৯২৩ খৃষ্টাব্দের ১লা মার্চ্চ হইতে মিঃ এ, সি, সেন ম্যানেজিং ডিরেক্টাররূপে এবং তাঁহার তত্ত্বাবধানে এই এজেন্সী Private limited Company ভাবে পরিচালিত হইতে থাকে।

এম্পায়ার অব্ ইণ্ডিয়া জীবন বীমা কোম্পানীতে যোগদান করিবার পর—মিঃ এস, আর, দাশের জীবিতকালে ও তাঁহার মৃত্যুর পর হইতে উক্ত জীবনবীমা কোম্পানীর উন্নতির জন্য ও ন্যাশানাল এজেন্সীর পরিচালিত চা কোম্পানীগুলির শ্রীবৃদ্ধির নিমিত্ত অবিনাশচন্দ্র দিবারাত্রি যেরূপভাবে পরিশ্রম করিয়া স্বীয় সংগঠনশক্তির পরিচয় দিয়া গিয়াছেন, তাহা ব্যবসায়িক জগতে এবং জনসাধারণের মনেও স্মরণীয় হইয়া থাকিবে।

আশ্চর্য্যের বিষয় এই, ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে Empire of India Life Assurance Company, Ltd—In Commemoration of the Companys Golden Jubilee উপলক্ষে December 1947 খৃষ্টাব্দে যে সচিত্র সুন্দর পুস্তিকাখানি প্রকাশ করিয়াছেন—তাহাতে অবিনাশচন্দ্রের ন্যায় উক্ত কোম্পানীর বাঙ্গালা, বিহার উড়িষ্যা ও আসামের সর্ব্বত্র সংগঠন কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়া যিনি কোম্পানীকে এতদূর প্রতিপত্তিশালী করিয়াছিলেন তাঁহার একখানি চিত্র পর্য্যন্ত প্রকাশ করেন নাই! যদিও উক্ত কোম্পানীর পরিচালকমণ্ডলী ও অন্যান্য অনেকের প্রতিকৃতিই ঐ পুস্তিকাতে প্রকাশিত হইয়াছে।

এখানে পুনরাবৃত্তি করিতে হইলেও বলিতে হয় যে স্বর্গত দুর্গামোহন দাশ মহাশয় যেমন নানা দিক্ দিয়া দেশ কল্যাণব্রেত

ব্রতী ছিলেন, তেমনি দাশ মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র ব্যারিষ্টার মিঃ সত্যরঞ্জন দাশ মহাশয়ও বাঙ্গালীর ব্যবসায়-বাণিজ্যক্ষেত্রের অন্যতম পথ—প্রদর্শকরূপে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া গিয়াছেন।

বাঙ্গালী ব্যবসায়ের পথ প্রদর্শক সত্যরঞ্জন দাশ

তিনি সে যুগে বাঙ্গালীর ব্যবসায়ক্ষেত্রের প্রথম উন্মেষের দিনে বোম্বে নগরীতে প্রতিষ্ঠিত "এম্পায়ার অব্ ইণ্ডিয়া, বীমা কোম্পানীর বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা ও আসাম প্রদেশের চীফ এজেন্সী গ্রহণ করিয়াছিলেন। একথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। বাঙ্গালী তখন জীবন-বীমার উপকারিতা ভাল করিয়া জানিত না ও বুঝিত না, সেই সময়ে একটি নবগঠিত প্রতিষ্ঠানের উন্নতি ও প্রচার-কল্পে তাঁহার এজেন্সী গ্রহণ দুঃসাহসিকতার পরিচায়ক বলিতেই হইবে। মিঃ দাশ মনে করিতেন, "ব্যবসায়-বাণিজ্য ব্যতীত কখনই দেশের দুঃখ-দারিদ্র্য দূর হইতে পারে না। অর্থনৈতিক উন্নতি ব্যতীত দেশের কল্যাণ অসম্ভব। এই সাধু উদ্দেশ্য বুকে লইয়া অদম্য উৎসাহসহকারে তিনি কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়াছিলেন। কিন্তু দেশের দুর্ভাগ্য বলিতে হইবে, মিঃ সত্যরঞ্জন দাশ অল্প বয়সে ভগ্ন স্বাস্থ্য হইয়া পড়িলেন। নিজের কাজকর্ম্ম বড় একটা দেখিতে পারিতেন না। সে এক অতি দুঃসময়, কোম্পানী দিনের পর দিন ঋণজালে জড়িত হইয়া পড়িতেছিল। এ সময়েই জগচ্চন্দ্র দাশ মহাশয়ের, অবিনাশচন্দ্রকে কোনওরূপ সুবিধা করিয়া দিবার জন্য সত্যরঞ্জন দাশের নিকট অনুরোধ পত্রখানি আসিয়া পৌঁছিয়াছিল।

মিঃ সত্যরঞ্জন দাশ মহাশয় অতি উচ্চমনা ব্যক্তি ছিলেন, দূর সম্পর্কিত আত্মীয় যুবক অবিনাশচন্দ্রকে সাগ্রহে আহ্বান করিয়া লইলেন এবং অবিনাশচন্দ্রের সহিত আলাপ ও পরিচয়ে,

যুবকের অমায়িক ব্যবহারে তিনি তাঁহাকে সাদরে তাঁহার সহযোগীরূপে গ্রহণ করিলেন। মিঃ সত্যরঞ্জন দাশ গুণগ্রাহী ব্যক্তি ছিলেন, যুবক অবিনাশচন্দ্রও নিজের অমায়িক ব্যবহার দ্বারা এবং চরিত্র-মাধুর্য্য-গুণে অল্প দিনের মধ্যেই দাশ-পরিবারের সকলের প্রীতি ও স্নেহ লাভ করিয়াছিলেন। অল্প দিনের মধ্যেই সত্যরঞ্জন দেখিলেন অবিনাশচন্দ্র যুবক হইলেও ধীর বুদ্ধি ও কর্ম্ম-নিপুণ কৌশলী ও তাঁহার সংগঠন-শক্তি অসাধারণ, এসব কারণে মিঃ দাশ অবিনাশচন্দ্রের একান্ত অনুরাগী হইয়া পড়িলেন এবং তিনি তাঁহার পরিচিত "ন্যাসান্যাল এজেন্সী" কোম্পানীর প্রতিষ্ঠা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য অবিনাশ-চন্দ্রকে ন্যাসান্যাল এজেন্সীর অংশীদাররূপে গ্রহণ করিলেন। অবিনাশচন্দ্রও স্বীয় সংগঠনশক্তি দ্বারা উক্ত কোম্পানীতে অংশীদাররূপে গৃহীত হইবার পর অসাধারণ নির্ভীকতা ও অপরাজেয় অধ্যবসায়ের সহিত ব্যবসায়ের উন্নতির জন্য আত্মনিয়োগ করিলেন। তিনি এসময়ে দিবা-রাত্রি কোম্পানীর প্রচার ও উন্নতির জন্য কলিকাতার সর্ব্বশ্রেণীর লোকের সহিত পরিচিত হইয়াছিলেন এবং বাঙ্গালা, উড়িষ্যা, বিহার ও আসামের সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিয়া কোম্পানীর প্রতিষ্ঠার জন্য দিবা-রাত্রি কার্য্য করিতেন। আরাম ও বিশ্রাম বলিয়া কিছুই জানিতেন না।

অবিনাশচন্দ্র এই সম্পর্কে কথা-প্রসঙ্গে বলিতেন; "আমি যখন Empire of India বীমা কোম্পানীর কার্য্যে সত্য-রঞ্জনের অংশীদার রূপে যোগদান করি, তখন আমার নিজের বীমা কার্য্যে অভিজ্ঞতা ছিল না, তবুও এক নূতন উৎসাহ ও

উদ্দীপনা লইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইলাম, ভাবিলাম এত দিন পরে বিধাতা-পুরুষ আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া আমাকে উপযুক্ত কর্ম্মক্ষেত্রে উপস্থিত করিয়াছেন। কি অদম্য উৎসাহ লইয়াই না অগ্রসর হইলাম! তখন আমাদের দেশের জনসাধারণ দেশীয় বীমা কোম্পানীগুলির প্রতি আস্থা স্থাপন করিতেন না। সেজন্য বিদেশী প্রতিষ্ঠানগুলির সহিত প্রতিযোগিতায় দেশীয় কোম্পানীগুলি আশানুরূপ উন্নতি করিতে পারিত না। কিন্তু ঈশ্বরের অযাচিত করুণাবলে একদিনের জন্যও বিফল মনোরথ হই নাই, সৎ ও সাধুসঙ্কল্প লইয়া কর্ত্তব্য কার্য্যে প্রাণ ঢালিয়া দিয়াছিলাম।"

"আমরা বীমা ও চা উভয় ব্যবসায়ই তখন ন্যাশান্যাল এজেন্সি নাম দিয়া পরিচালনা করিতেছিলাম। কিন্তু আমি যখন বীমা ও চায়ের ব্যবসায়ের ভার প্রাপ্ত হইয়া ন্যাশানেল এজেন্সিতে যোগদান করি, তখন চায়ের ব্যবসায়ের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়া মিঃ সত্যরঞ্জন দাশ উহা বন্ধ করিয়া দিতে সংকল্প করিয়াছিলেন; কিন্তু আমি তাহাতে সম্মত হই নাই। সেই সময়ে চায়ের ব্যবসায়ের মধ্যে প্রাণ-সঞ্চার করিবার জন্য আমাকে কি পরিমাণ পরিশ্রম করিতে হইয়াছে তাহা বন্ধু-বান্ধবদের অনেকেরই অজ্ঞাত। আমার জীবনে সর্ব্বাপেক্ষা গৌরবের বিষয় এই যে বিগত অর্দ্ধ শতাব্দীকাল আমি যে পরিশ্রম ও যত্ন করিয়াছি, তাহারই ফলে আজ "Empire of India life Assurance Company" পূর্ব্ব ভারতে শ্রেষ্ঠ স্থান লাভ করিয়াছে। আমার অফিসে বর্ত্তমানে সেই প্রথম অবস্থায় সেই তিনলক্ষ টাকা হইতে ৬০।৭০ লক্ষ টাকার কাজ সংগ্রহ হইতেছে

এবং আমার নিজস্ব কয়েকটি চা-কোম্পানী ও প্রতিষ্ঠা করিতে সক্ষম হইয়াছি।”

অবিনাশচন্দ্র সর্ব্বদাই বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন ও অন্যান্য প্রিয়জনকে বলিতেন—“আমার এই সার্থকতার মূলে দুইটি জিনিষ ছিল আমার নিত্য সঙ্গী। এক মঙ্গলময় জগদীশ্বরের উপর সম্পূর্ণ ভাবে নির্ভর করিয়া আমি আত্মশক্তিতে বিশ্বাস করিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়াছি এবং মঙ্গলময় জগদীশ্বরও প্রতিপদে আমার উপর করুণা বর্ষণ করিয়াছেন। দ্বিতীয়তঃ কোনরূপ কঠোর পরিশ্রম করিতে আমি পশ্চাৎপদ হই নাই। নিজের কর্ম্মক্ষমতাকে বৃদ্ধি করিবার জন্য আমি পরনির্ভরশীল না হইয়া প্রত্যেকটি বিষয় নিজে সম্পন্ন করিতে যত্নবান্ হইয়াছি। আমার জীবনে কর্ম্মকেই একমাত্র ধর্ম্ম স্বরূপ বলিয়া বরণ করিয়া লইয়াছি। আমার বিশ্বাস জীবনের উন্নতির মূলে একান্ত আবশ্যক—ঈশ্বরে বিশ্বাস, সাধুতা, কঠোর পরিশ্রম এবং সূক্ষ্ম পর্য্যবেক্ষণ শক্তি।”

অবিনাশচন্দ্র প্রতিটী কার্য্যে মূলমন্ত্র রূপে যে দুইটি জিনিষ লইয়া কৃতকার্য্য হইয়া গিয়াছেন, আমাদের মনে হয় প্রত্যেক মানুষেরই ঐরূপ কর্ত্তব্যনিষ্ঠা এবং সাধুতা থাকিলে জীবনে উন্নতি লাভ সম্ভবপর।

ষষ্ঠ অধ্যায়

অবিনাশচন্দ্রের কলিকাতার কর্ম্মজীবন এইবার প্রকৃতভাবে আরম্ভ হইল। এ সময়ে তিনি সর্ব্বপ্রথম বাঞ্ছারাম অক্রূর লেনে বাস করিতে থাকেন, ক্রমশঃ পটলডাঙ্গা, লোয়ার সার্কুলার রোড প্রভৃতি নানাস্থানে বাসা পরিবর্ত্তন করিয়াছিলেন। তৎকালে কার্য্যক্ষেত্রে কিরূপে প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারিবেন তাহাই ছিল তাঁহার প্রধান চিন্তা ও বীমা কার্য্যই ছিল প্রধানতম আকর্ষণ।

মানুষ একথা বিশেষভাবেই জানে মৃত্যুর ন্যায় স্থির পরিণতি, জীবনে আর কিছুই নাই। তারপর মানুষ হইতেছে সামাজিক জীব, দশজনকে লইয়া তাহার বাস করিতে হয়। পিতা, মাতা, ভ্রাতা, স্ত্রী, পুত্র ও কন্যা লইয়া তাহার সংসার। মানুষ যে জীবিকার জন্যে অর্থ উপার্জ্জন করে, তাহার মূল কারণ হইতেছে, নিজের জীবিকা ও তাহার প্রিয় পরিজনদের অন্ন-সংস্থান। এজন্য তাহাকে প্রতিনিয়ত যুদ্ধ করিতে হয়। ভবিষ্যতের কথা তাহার মনে আসে। জীবন সঙ্কট-পূর্ণ, ব্যাধি-পীড়া, বার্দ্ধক্য, মৃত্যু এ সমুদয় মানুষের নিত্য সঙ্গী। তারপর অকাল মৃত্যু ত আছেই। এক পরিবারের কোনও উপার্জ্জনক্ষম ব্যক্তির অকাল মৃত্যু হইলে তাহার মুখাপেক্ষী সকলকে বিপন্ন হইতে হয়। এইরূপ বিপদে-আপদে ও মৃত্যুতে যাহাতে কোন পরিবারের লোকজনের বিপদ না ঘটে সেজন্যই বীমা বা ইন্সিওরেন্সের প্রয়োজন।

জীবন বীমার সম্বন্ধে ধারণা

জাতীয় জীবনে বীমার প্রয়োজনীয়তা অত্যন্ত অধিক। এখন প্রত্যেক সুসভ্য দেশে গরীব-দুঃখী, শ্রমজীবী পুরুষ ও স্ত্রীলোক, মধ্যবিত্ত গৃহস্থ, ব্যবসায়ী, বণিক্‌সম্প্রদায়, রাজকর্ম্মচারী প্রভৃতি সকলকেই বীমা করাইবার জন্য বাধ্য করা হইতেছে। ইন্‌সিউরেন্স কথাটার সাধারণ অর্থ হইতেছে, "A contract under which one party undertakes for a consideration to indemnity another against certain-forms of loss." সহজ কথায় উহা এমন একটা চুক্তি যে চুক্তির দ্বারা এক পক্ষ অপর পক্ষকে চুক্তি অনুসারে অর্থ দিতে বাধ্য থাকেন। মানুষ বীমার সাহায্যে অকাল মৃত্যু প্রভৃতিতে নিজ পরিবারের অন্ন-সংস্থান করিয়া যাইতে পারেন। বীমা কোম্পানী মাসিক, ষান্মাষিক এবং বার্ষিক অর্থ লইয়া তাহার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। বীমা—মেয়াদি বীমা, (Endowment Assurance), আজীবন বীমা, এবং অন্য নানা শ্রেণীর বীমা, যেমন ধরুন, অগ্নিবীমা, দুর্ঘটনার বীমা প্রভৃতি এখন জীবনবীমা কোম্পানী ব্যবস্থা করিয়াছেন। জীবন-বীমা দ্বারা যে সঞ্চয়ের ব্যবস্থা হয়, তাহা দ্বারা ভবিষ্যতে ও জীবিতকালে বীমাকারীর নিজের এবং পরিবারের সকলেরই একটা সংস্থান থাকে। দশ, পনেরো, কুড়ি বা ত্রিশবৎসর পরে যে টাকাটা পাওয়া যায়, তাহার দ্বারা পুত্রের পড়া, মেয়ের বিবাহ, ও অন্যান্য পারিবারিক অভাব-অভিযোগ দূর হইতে পারে। অনেক সময় দেখা যায়, বাড়ীর কর্ত্তা সঞ্চয় করিতে আগ্রহান্বিত নন, কোনরূপে সংসারের ব্যয় করিয়া গেলেই হইল, ভবিষ্যতের কথা একেবারেই ভাবেন না, সেইরূপ ক্ষেত্রে গৃহিণী যদি বিচক্ষণা হন,

বীমার প্রকার ভেদ

তাহা হইলে স্বামীকে জীবন বীমা করিতে উৎসাহিত করেন, এবং বীমা করাইয়া লন। কাজেই পরিবারের কর্ত্তার আকস্মিক মৃত্যু হইলে জীবনবীমার টাকায় পরিবারের কষ্ট যথেষ্ট পরিমাণে লাঘব হইয়া থাকে। বীমা জগতে এখন নানারূপ উন্নতি হইয়াছে। জীবনবীমা ছাড়া, অগ্নিবীমা (Fire Assurance) শিক্ষা বীমা, চুরি-বীমা, দুর্ঘটনার বীমা, প্রভৃতি নানাশ্রেণীর বীমার ব্যবস্থা হইয়াছে। এখন অধিকাংশ লোকই বীমার উপকারিতা ও প্রয়োজনীয়তা বুঝিতে পারিতেছেন।

অবিনাশচন্দ্র যখন বীমাক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেন, তখন কি বাঙ্গলাদেশ, কি ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ, কোথাও বীমার প্রতি জন-সাধারণের তেমন আস্থা ছিল না, এমন কি শিক্ষিতপরিবারের লোকেরা ও বীমার বিরোধী ছিলেন। গৃহিণী মনে করিতেন— বীমা করিলে স্বামীর অকাল মৃত্যু হইবে, ব্যবসায়ীরা—বণিক্-সম্প্রদায়েরা মনে করিতেন, বীমার প্রিমিয়ামরূপে টাকা আটকাইয়া রাখিলে, ক্ষতি ব্যতীত লাভ কোথায়! এমন কি মধ্যযুগে পাশ্চাত্যদেশের ধর্ম্মযাজকেরা বলিতেন জীবনবীমা করা বিধাতার বিধানে বিরুদ্ধ কাজ।

বাঙ্গলাদেশের শিক্ষিতসম্প্রদায়ের মধ্যেও সকলে জীবনবীমা করিতে উৎসাহশীল ছিলেন না, বিশেষতঃ দেশী কোম্পানীতে, দেশী কোম্পানীর স্থায়ীত্ব সম্বন্ধে ও সন্দেহ করিতেন। এরূপ ক্ষেত্রে অবিনাশচন্দ্র দিনের পর দিন অসাধারণ পরিশ্রম করিয়া এম্পায়ার অব ইণ্ডিয়া (Empire of India) জীবনবীমা কোম্পানীকে পূর্ব্ব ভারতে এক অতি উচ্চ স্থানে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন। জীবনবীমার কাজে এবং বীমার প্রয়োজনীয়তা

সম্বন্ধে সাধারণ মানুষ ও মধ্যবিত্ত পরিবারের লোকদের শিক্ষা ও অনুরাগ জন্মাইবার জন্য তিনি বাঙ্গলা, আসাম, বিহার ও উড়িষ্যার প্রধান প্রধান জেলা ও সহরে ভ্রমণ করিয়াছেন। কোথাও উৎসাহ ও সহানুভূতি পাইয়াছেন, কোথাও নিরাশ হইয়াছেন,—তবু কিছুতেই কর্ত্তব্যভ্রষ্ট হন নাই। যত বাধা বিঘ্ন সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছে, সে সমুদয় দূর করিয়া চলিয়াছেন কর্ত্তব্য-পথে। বীমাজগতে কার্য্য করিবার সময় তাঁহার সহিত বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার বহু মনীষী ও দেশবরেণ্য ব্যক্তির সহিত পরিচয় ও সৌহার্দ্দ হইয়াছিল। হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, মাড়োয়ারী, সর্ব্ববিধ সম্প্রদায়ের লোকের সহিত তাঁহার বন্ধুত্ব ও সৌহার্দ্দ জন্মিয়াছিল। সকলেই তাঁহাকে শ্রদ্ধার সহিত দেখিতেন।

বিখ্যাত ব্যক্তিগণের সহিত বন্ধুত্ব লাভ

সেই সময় হইতে তিনি সমাজে বিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার স্বদেশ-প্রীতি, ব্যবসায়ে অনুরাগ, ধর্ম্মপরায়ণতা, সর্ব্বশ্রেণীর লোকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। বিজ্ঞানাচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কৃষ্ণকুমার মিত্র, দুর্গামোহন দাশ, ভুবনমোহন দাশ, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, সতীশরঞ্জন, আনন্দমোহন বসু, ভূপেন্দ্রনাথ বসু, বিপিনচন্দ্র পাল, মনোরঞ্জন গুহ, অশ্বিনীকুমার দত্ত, আনন্দচন্দ্র রায়, অখিলচন্দ্র দত্ত, অম্বিকাচরণ মজুমদার, স্যার রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, রাজা শ্রীনাথ রায়, রায় যদুনাথ রায় বাহাদুর, প্রিয়নাথ রায়, প্রভৃতির সঙ্গে বন্ধুত্ব ছিল এবং সে সময়ে কি সাহিত্যিক, কি রাষ্ট্রনৈতিক, কি জীবনবীমা কোম্পানীর পরিচালকগণ, সকলেই ছিলেন অবিনাশচন্দ্রের বন্ধু ও আত্মীয়

স্থানীয়। ব্যবসায়ের দিক্ দিয়া এবং সর্ব্বপ্রকার সামাজিক ও স্বদেশহিতকর কার্য্যে অবিনাশচন্দ্রের ছিল পরম উৎসাহ। ক্রমশঃ তিনি কলিকাতার সামাজিকক্ষেত্রে এবং অভিজাত-সম্প্রদায়ের মধ্যে একজন গণ্যমান্য এবং সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরূপে পরিচিত হইলেন।

ভাগ্যলক্ষ্মী তাঁহার কাছে যেন আপনা হইতেই ধরা দিলেন।

ন্যাশন্যাল এজেন্সীর পরিচালনাধীনে জীবনবীমার দিন দিন উন্নতিলাভ হইতে লাগিল। অবিনাশচন্দ্র যখন 'Empire of India'তে যোগদান করেন, সেই সময়ে প্রথম অবস্থায় তিন লক্ষ টাকা হইতে ক্রমশঃ ৬০।৭০ লক্ষ এবং কোটি টাকার বাৎসরিক কাজ করিতে পারিয়াছিলেন। তারপর তাঁহার চাবাগানগুলিও বৈজ্ঞানিক-প্রণালী অনুযায়ী সুপরিচালিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত হইল। এই ন্যাশনাল এজেন্সীর প্রতিষ্ঠার দ্বারা তিনি বহু বিপন্ন পরিবারের শিক্ষিত যুবকগণের অন্নসংস্থান করিতে পারিয়াছেন। এ-সম্বন্ধে তিনি সর্ব্বদা বলিতেন—

আমাদের দেশের যুবকদের কথাই আমার সর্ব্বদা মনে পড়ে, তাহাদের জন্য দুঃখ হয়, এজন্য যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধি লাভ করিয়াও তাহারা যখন সংসারে প্রবেশ করে, তখন চারিদিক অন্ধকার দেখে, কোন্‌খানে তাহারা যাইবে, কে তাহাদের পথ নির্দ্দেশ করিবে তাহাই হইতেছে প্রধান সমস্যা, আমার জীবনেও তাহা ঘটিয়াছিল বলিয়া আমি বলিতে পারি যে, এ পৃথিবীতে উন্নতি লাভ করিতে হইলে, নিজের পায়ের উপর দাঁড়াইবার চেষ্টা করা উচিত, ইহা করিব না, উহা করিব

না বলিয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না। আমি কোনদিন বসিয়া থাকি নাই।

জীবনবীমা অফিসেরও চাবাগানের পরিচালনার ভার যখন তিনি গ্রহণ করিলেন, তখন তাঁহার সে বিষয়ে কোনরূপ অভিজ্ঞতাই ছিল না, কিন্তু কোনরূপ গুরুতর কার্য্য করিতে পরাঙ্মুখ হইতেন না, সে জন্যই অজানা কার্য্যের ভার লইয়াও তিনি উহার দায়িত্ব গ্রহণ করিতে পশ্চাৎপদ হন নাই, এবং কিরূপ ধৈর্য্যও সহিষ্ণুতাসহকারে কার্য্য করিতে করিতে তিনি ভারতীয় বীমাক্ষেত্রে এবং ব্যবসায়-ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন, তাহা সকলেরই সুবিদিত।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি অবিনাশচন্দ্র সেন ছিলেন নীরব কর্ম্মী। আপনার নাম ও যশঃ বিস্তারের জন্য উন্মুখ ছিলেন না। বাঙ্গলাদেশ, বিহার, উড়িষ্যা ও আসামে এম্পায়ার অব ইণ্ডিয়া জীবনবীমা কোম্পানীর প্রচার, সুনাম ও কৃতিত্ব প্রচারের জন্য অবিনাশচন্দ্র যেরূপ অমানুষিক কার্য্য করিয়া গিয়াছেন তাহা অতুলনীয় বলা যাইতে পারে। ১৮৯৯ সালে, বাঙ্গলা ১৩০৩ সালে অবিনাশচন্দ্র এম্পায়ায়ার অব্ ইণ্ডিয়ার কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়া জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত ঐ কোম্পানীরই চীফ এজেন্সী লইয়া কার্য্য করিয়া গিয়াছেন, এইরূপ নিষ্ঠা, ব্যবসায়-ক্ষেত্রে অতি অল্প লোকের মধ্যেই দেখিতে পাওয়া যায়।

বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশী আন্দোলন ১৯০৫

লর্ড কার্জ্জন যখন ভারতবর্ষের গভর্ণর জেনারেল ও রাজপ্রতিনিধি হইয়া আসেন, তখন তিনি শাসনকার্য্যের সৌকর্য্যার্থে বঙ্গ বিভাগের নির্দ্দেশ করেন। তৎকালে বাঙ্গলা,

বিহার, আসাম ও উড়িষ্যা একজন লেফ্‌টেনাণ্ট গভর্ণারের শাসনাধীন ছিল। এত বড় প্রদেশ সুশাসিত হইতেছে না বলিয়া লর্ড কার্জ্জন বাঙ্গলাকে দুই ভাগে বিভক্ত করিতে উদ্যোগী হন। তিনি পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামকে একটি নূতন প্রদেশ করিয়া, বিহার ও উড়িষ্যা মাত্র ছোটলাটের হস্তে রাখিবার ব্যবস্থা করেন। বাঙ্গালীজাতি এইরূপ বিভাগের বিরুদ্ধে দাঁড়াইলেন, তাঁহারা চাহিলেন না যে বাঙ্গালীজাতি দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া যায়, সে সময়ে রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিপিনচন্দ্র পাল, আনন্দমোহন বসু, অশ্বিনীকুমার দত্ত, অখিলচন্দ্র দত্ত, যাত্রামোহন সেন, আনন্দচন্দ্র রায়, অনাথবন্ধু গুহ, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, অম্বিকাচরণ মজুমদার, অরবিন্দ ঘোষ, চিত্তরঞ্জন দাশ, কৃষ্ণকুমার মিত্র, প্রভৃতি রাষ্ট্রনায়কেরা বঙ্গবিভাগ রহিত করিবার জন্য দেশব্যাপী আন্দোলন উপস্থিত করেন, দেশের সর্ব্বত্র গভর্মেণ্ট কঠোর নীতি অবলম্বন করেন এবং আন্দোলনকারীগণকে দমন করিবার জন্য নূতন নূতন আইন প্রবর্ত্তন করিয়া ঐ সময়ের স্বদেশী আন্দোলন দমন করিবার জন্য প্রবৃত্ত হন। দেশনেতারা বিলাতী বস্ত্র ও বিলাতী জিনিষ ব্যবহার বর্জ্জনের সঙ্কল্প করেন। সে সময়কার সরকারি কার্য্যবিবরণীতে এ-বিষয়ে লিখিত আছে

বয়কট ও স্বদেশী

যে—"The first effort of the agitators was to inaugurate a boycott movement, i.e. a movement to boycott European goods, and in particular Manchester piecegoods, sugar and salt." বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকারীরা প্রথমে বিলাতী

কাপড়, ম্যানচেষ্টারজাত দ্রব্যাদি এবং বিদেশী দ্রব্য ও বিলাতী লবণ, চিনি প্রভৃতি বয়কট করিতে উদ্যোগী হইলেন। গ্রামে-গ্রামে সহরে সহরে এই আন্দোলন ব্যাপ্তিলাভ করিল। ছাত্র-সম্প্রদায়, শিক্ষকগণ, রাজনৈতিক নেতাগণ সকলে স্বদেশী আন্দোলন ও বয়কট আন্দোলনে যোগদান করিলেন। গ্রামের ও সহরের যুবকেরা শুধু আন্দোলন, সভা, সমিতি ও বক্তৃতাতেই সন্তুষ্ট রহিলেন না, তাঁহারা গুপ্তসমিতির প্রতিষ্ঠা করিলেন, বিপ্লবী দলেরও সৃষ্টি হইল। সমিতি, আখড়া প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত হইল। লাঠিখেলা, তরোয়ালখেলা ও অস্ত্র পরিচালনা শিখিতে দলে দলে যুবকগণ অগ্রসর হইলেন। গভর্মেণ্টের কঠোর নীতি ও দিনের পর দিন বাড়িতে থাকে। এদিকে গুপ্তসমিতি স্থাপন করিয়া ইংরাজকর্ম্মচারীদের প্রাণনাশেরও চেষ্টা আরম্ভ হয়। বিলাতী বর্জ্জনের ফলে দেশীয় বস্ত্র-শিল্পের উন্নতি হইতে থাকে। গ্রামে-গ্রামে চরখার প্রচলন ও কার্পাসগাছ রোপণের ধুম পড়িয়া যায়।

বরিশাল প্রাদেশিক সমিতি

১৩১৩ সালের ১লা বৈশাখ

১৩১৩ সালের ১লা বৈশাখ জাতীয় ইতিহাসের একটি স্মরণীয় দিন। বরিশালে প্রাদেশিক সমিতির অধিবেশন হয়। প্রাদেশিক সমিতির প্রতিনিধিগণ উপস্থিত, রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, বিপিনচন্দ্র পাল, কৃষ্ণকুমার মিত্র, শচীন্দ্রপ্রসাদ বসু, মনোরঞ্জন গুহ, চিত্তরঞ্জন গুহ, অশ্বিনীকুমার দত্ত, পৃথ্বীশচন্দ্র রায়, কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ, যোগেশচন্দ্র চৌধুরী, বিজয়চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, প্রভৃতি বরিশালে উপস্থিত হইয়াছেন। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব আদেশ করিলেন—কেহ 'বন্দেমাতরম্' উচ্চারণ করিতে

পারিবেন না। দেশের রাষ্ট্রনায়কগণ ও প্রতিনিধিবৃন্দ এ আদেশ অমান্য করিয়া রাজার হাবেলী হইতে 'বন্দেমাতরম্' উচ্চারণ করিতে করিতে প্রাদেশিক সমিতির মণ্ডপে যাত্রা করিয়াছেন—অমনি পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেন্টের আদেশে পুলিশ রেগুলেশন লাঠি চালাইতে লাগিল। স্বর্গত মনোরঞ্জন গুহের পুত্র চিত্তরঞ্জন গুহ পুলিশের লাঠির আঘাতে পথের পার্শ্ববর্ত্তী একটি পুকুরে পড়িয়া গেলেন, লাঠির পর লাঠি চলিতে লাগিল, তবু কিশোর চিত্তরঞ্জন 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি করিতে নিরস্ত হইলেন না। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে ডিষ্ট্রিক্ট পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেন্ট অপরাধীর ন্যায় ধৃত করিয়াছিলেন। বরিশালে তখন এমার্সন সাহেব ছিলেন ম্যাজিষ্ট্রেট। আমি নিজে সেই দৃশ্য প্রত্যক্ষ করিয়াছি।

সে একদিন গিয়াছে, যেদিন বাঙ্গালী মতিবিভ্রান্ত পুলিশের সাহেব ও ম্যাজিষ্ট্রেটের ধৃষ্টতা, পুলিশের উৎপীড়ন নীরবে সহ্য করিয়াছে। সেদিন বাঙ্গালী দেশপ্রেমের যে মহৎ দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছে তাহা অতুলনীয়, ইংরাজের অত্যাচার, অবিচার সহ্য করিতে বাঙ্গালীযুবক পরাঙ্মুখ হয় নাই, সেই সময়ে সুরেন্দ্রনাথ, মতিলাল, ভূপেন্দ্রনাথ, যোগেশচন্দ্র, বিপিনচন্দ্র প্রভৃতি বঙ্গের কৃতি সন্তানগণের ন্যায়, দেশের জন্য—দশের জন্য, সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা বঙ্গজননীর জন্য যুবকেরা দলে দলে কারাগারে যাইতে প্রস্তুত হইয়াছিল। ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের "বন্দেমাতরম্" মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া, দেশবাসী যে জাতীয়তা ও স্বদেশপ্রীতির মহিমা দেখাইয়াছেন তাহা জগতের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়া আছে।

সেই স্বদেশী আন্দোলনের সময় এবং বঙ্গভঙ্গের সময় অবিনাশচন্দ্রের জীবনে এক নূতন অভিজ্ঞতা লাভ হইয়াছিল। যখন শুনিতেন তাঁহার বাড়ীর পার্শ্ববর্ত্তী পথ দিয়া ছাত্রছাত্রীরা গান গাহিয়া চলিয়াছে :—

অবিনাশচন্দ্রের স্বদেশপ্রীতি

"মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়,
মাথায় তুলে নেরে ভাই,
দীন দুখিনী মা যে তোদের,
তার বেশী আর সাধ্য নাই।

সেই মোটা সূতার সঙ্গে,
মায়ের অপার স্নেহ দেখতে পাই,
আমরা এম্‌নি পাষাণ, তাই ফেলে ওই
পরের দোরে ভিক্ষে চাই।

ওই দুঃখী মায়ের ঘরে,
তোদের সবার প্রচুর অন্ন নাই,
তবু, তাই বেচে, কাচ, সাবান, মোজা,
কিনে করলি ঘর বোঝাই।

আয়রে আবার মায়ের নামে,
এই প্রতিজ্ঞা করবো ভাই;
পরের জিনিষ কিন্‌বো না,
যদি মায়ের ঘরের জিনিষ পাই।"

যখন শুনিতেন শত সহস্রকণ্ঠে গীত হইতেছে—

"আমার সোনার বাংলা,
আমি তোমায় ভালবাসি।
চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস
আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি!"

তখন তাঁহার মনে বাঙ্গলাদেশের শস্যশ্যামলা সুন্দর মূর্ত্তি মনে পড়িত, মনে পড়িত,—

"ওমা, তোর চরণেতে,
দিলেম এই মাথা পেতে,
দেগো তোর পায়ের ধূলো, সেযে আমার
মাথার মাণিক হবে।

ওমা, গরীবের ধন যা আছে তাই
দিব চরণতলে,
(মরি হায় হায় রে)—
আমি পরের ঘরে কিনব না তোর
ভূষণ বলে গলার ফাঁসি।"

সে সময়কার প্রত্যেক জাতীয়তা ও স্বদেশ-প্রীতির উদ্বোধক সঙ্গীতেও গানে তাঁহার প্রাণে এক অভূতপূর্ব্ব আনন্দ ও কর্ম্ম-প্রেরণা জাগাইয়া দিয়াছিল। অবিনাশচন্দ্র কোন দিন উচ্ছ্বাস-প্রিয় লোক ছিলেন না, প্রত্যেকটি বিষয় ও প্রত্যেকটি কার্য্য তিনি ধীর ভাবে চিন্তা করিয়া তবে তাহা সম্পন্ন করিতেন। সেই স্বদেশীযুগে তিনি নিজ পরিবারের মধ্যে যেমন স্বদেশী বস্ত্র, স্বদেশী দ্রব্যাদির প্রচলন করিয়াছিলেন, তেমনি এমন কোন স্বদেশী প্রতিষ্ঠান ছিল না, যাহার সহিত তাঁহার যোগ না ছিল।

যৌবনে—অবিনাশচন্দ্র সেন

বিপ্লবীই হউক, গুপ্তসমিতির প্রবর্ত্তকই হউক এবং কোনও শ্রম-শিল্পের বা কুটির-শিল্পের প্রতিষ্ঠাতাই হউন না কেন, তিনি সাধ্যানুযায়ী তাঁহাদিগকে সাহায্য করিতেন। এই সব কার্য্যে তিনি যে দান করিতেন বা সাহায্য করিতেন, তাহা কেহই জানিতে পারিত না এবং কখনও আত্মগৌরব প্রতিষ্ঠা বা নাম যশের জন্য কোন দিন তাহা প্রকাশ করিতেন না, অতি বড় নিকটবর্ত্তী আত্মীয়-স্বজনেরা পর্য্যন্ত তাহা জানিতে পারিত না, এমনি ছিল তাঁহার মন্ত্রগুপ্তি। আমি সেই স্বদেশীযুগে তাঁহাকে দেখিয়াছি হয় তিনি অনেক সময় কি যেন চিন্তা করিতেন এবং অনেক সময় বলিতেন:—"আচ্ছা এসব উৎসাহ ও কর্ম্ম-প্রেরণা স্থায়ী হবে কি ?—দৃঢ়তার সহিত কাজ করাই কি ভাল নয়।" তাঁহার দুঃখ হইত, পাছে দেশবাসীর এই স্বদেশ-প্রীতির উন্মাদনা বেশী দিন স্থায়ী না হয়। ঐ সময়ে যদিও তিনি সেইরূপ ধনশালী হন নাই, তথাপি প্রতিনিয়তই স্বদেশ-সেবকবাহিনী, স্বদেশী-নেতৃবৃন্দ অনেকেই তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছেন এবং কর্ত্তব্য-প্রণালী স্থির করিয়াছেন। অবিনাশচন্দ্রে বরাবরই সাহেবী পোষাক-পরিচ্ছদ পরিতে ভালবাসিতেন এবং প্রত্যেকটি কার্য্য ও ইউরোপীয়দের মত নির্দ্দিষ্টভাবে নির্দ্দিষ্ট পন্থায় নির্দ্দিষ্ট সময়ে সম্পন্ন করিতেন। তাঁহার ঐ ইংরাজী পোষাকের অন্তরালে যে একটি দেশ-প্রীতির করুণ-নির্ঝর ধারা প্রবাহিত ছিল, তাহা কেহ বড় একটা জানিতে পারে নাই। সে সময়ে স্বদেশী যে সকল কলকারখানা, কাপড়ের কল ইত্যাদি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহাদের প্রত্যেক-টির সহিতই ছিল তাঁহার সহযোগিতা। অবসর পাইলেই

দেশসেবা

স্বদেশীসভায় বক্তৃতা শুনিতে যাইতেন। দেশের শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতির প্রতি একটা স্বাভাবিক অনুরাগে সে সময়েই তাঁহার মনে ও প্রাণে নূতন উৎসাহ ও উদ্যম বৃদ্ধি করিয়াছিল। সৌভাগ্যক্রমে ঐ সময়ে 'Empire of India"রও চা-বাগানের কার্য্যেরও প্রসার এবং প্রভূত উন্নতি হইতেছিল। স্বদেশীযুগের প্রকৃত সাধনা পল্লী-সংগঠন কার্য্যে তাঁহার মন ধাবিত হইয়াছিল—বিশেষ তাঁহার স্বগ্রাম চুণ্টা এবং ত্রিপুরা জেলার সর্ব্বত্র যাহাতে জ্ঞান ও শিক্ষা বিস্তার হয় তৎপ্রতি তাঁহার মন নিয়োজিত হইয়াছিল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে অবিনাশচন্দ্র ছিলেন কর্ম্মপন্থী, কল্পনা-বিলাসী তিনি ছিলেন না, তাঁহার যেমন ক্ষমতা ছিল, তেমনি সেই ক্ষমতাকে কর্ম্মক্ষেত্রে প্রয়োগ করিবার দক্ষতাও ছিল অসাধারণ। তাঁহার জীবনের একটা মহান্ আদর্শ ছিল পল্লী-সংগঠনও কৃষি-শিল্প প্রভৃতির উন্নতি প্রচেষ্টা, আর অপর লক্ষ্য ছিল "ত্রিপুরাহিতসাধিনী" সভার সর্ব্বপ্রকার উন্নতি। এ তিনটি বিষয়ে তাঁহার অখণ্ড অনুরাগ ছিল। স্বদেশীযুগের সেই প্রেরণা :

"আমি পরের ঘরে কিনব না তোর
ভূষণ বলে গলার ফাঁসি।"

তাঁহার মনের মধ্যে যে অনুরাগ ও প্রেরণা জাগাইয়া দিয়াছিল, তাহা তিনি নিজ বাসপল্লী চুণ্টার বিবিধ উন্নতি-কল্পে এবং 'ত্রিপুরা হিতসাধিনী সভার' সর্ব্ববিধ উন্নতির জন্য নিয়োগ করিয়াছিলেন। আমরা এখানে ১৯৩৬ সালের ২০শে ডিসেম্বর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া কৃষি-শিল্প প্রদর্শনীর উদ্বোধন উপলক্ষ্যে যে বক্তৃতা

ব্রাহ্মণবাড়িয়া কৃষি-শিল্প প্রদর্শনী ২০শে ডিসেম্বর ১৯৩৬

দিয়াছিলেন তাহা হইতে তাঁহার ঐ বিষয়ে কিরূপ দূরদৃষ্টি ও লক্ষ্য ছিল তাহা পরিষ্কার ভাবে বুঝিতে পারা যায়।— বুঝিতে পারা যায় কিরূপ ছিল তাঁহার দেশপ্রীতি ও জন্মভূমি চুণ্টা গ্রামের প্রতি অকৃত্রিম অনুরাগ ও ভালবাসা।

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় কৃষিশিল্প-প্রদর্শনীর উদ্বোধন বক্তৃতার মধ্য দিয়া স্বদেশী যুগে তাঁহার প্রাণের মধ্যে যে স্বদেশীপ্রীতি উদ্বুদ্ধ হইয়াছিল, তাহাই পরবর্ত্তী জীবনে কিরূপে স্বতঃস্ফূর্ত্ত হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ পাইতেছি। তাঁহার সেই সুচিন্তিত বক্তৃতা যে শুধু ব্রাহ্মণবাড়িয়া মহকুমাবাসীদেরই অনুধাবনযোগ্য হইয়াছিল, তাহা নহে, সমগ্র বাঙ্গালাদেশবাসীর পক্ষেও তাহা অনুসরণ করা কর্ত্তব্য। তাঁহার জীবনের পূর্ণতর অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধি হইতে অবিনাশচন্দ্র বলিয়াছিলেন: ব্রাহ্মণবাড়িয়া কৃষি-শিল্প প্রদর্শনী উদ্বোধনের জন্য আমাকে আহ্বান করিয়া আপনারা আমার প্রতি যে প্রীতি ও সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন তজ্জন্য আমি আপনাদিগের নিকট আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। এই মহকুমার অন্তর্গত চুণ্টা গ্রাম আমার জন্মভূমি। আমার কর্ম্মজীবনের অবসর সময়ে আমি সর্ব্বদাই আমার জন্মভূমির কথা স্মরণ করি। জন্মভূমির সর্ব্বপ্রকার সদনুষ্ঠানে প্রত্যক্ষভাবে যোগদান করিতে অসমর্থ বলিয়া আমি আন্তরিক দুঃখিত। কিন্তু দূরবর্ত্তী স্থানে থাকিয়াও এই অঞ্চলের সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মপ্রচেষ্টার গতি আমি বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়া থাকি। আপনারা ব্রাহ্মণবাড়িয়া সমবায় পল্লী উন্নয়ন সমিতি নামক যে সমিতি গঠন করিয়াছেন তাহার কার্য্যপ্রণালীর বিষয় আমি অবগত আছি। এই সমিতি যে সব মহদনুষ্ঠানে আত্মনিয়োগ

করিয়াছেন তাহার একাংশও যদি সফল হয় তাহা হইলে দেশের মহদুপকার হইবে বলিয়া আমি মনে করি। তাই আপনারা যখন আমাকে এই প্রদর্শনী উদ্বোধনের জন্য আহ্বান করিলেন, তখন আমি সানন্দে উহা গ্রহণ করিলাম।

উপস্থিত ভদ্রমহোদয়গণ, আপনারা আজ যে ধরণের অনুষ্ঠানে ব্রতী হইয়াছেন, তাহার প্রয়োজনীয়তার কথা বলিয়া শেষ করা যায় না। এই সংসারে সর্ব্বনিয়ন্তা ভগবান মানুষের জীবনধারণ ও ভোগবিলাসের উপযোগী করিয়া প্রায় কিছুই দেন নাই। তিনি দিয়াছেন—জমি, খনি, বনজঙ্গল, জল ও বাতাস। আর দিয়াছেন মানুষের মনে অদম্য কর্ম্মপ্রবৃত্তি। এই কর্ম্ম-প্রবৃত্তির ফলেই মানুষ ধরিত্রীগর্ভ হইতে ও জলাশয় হইতে তাহার খাদ্যসামগ্রী উৎপাদন ও আহরণ করিতেছে, খনিগর্ভ হইতে ধাতু-দ্রব্য উত্তোলন করিয়া ও বনজঙ্গল হইতে কাঠ কাটিয়া তাহা মানুষের ব্যবহার্য্য সামগ্রীতে পরিণত করিতেছে এবং কাঁচা মালকে শিল্পদ্রব্যে পরিণত করিয়া মানুষের পরিচ্ছদ, বাসস্থান ও বিলাসসামগ্রীর অভাব মিটাইতেছে। কিন্তু সকল মানুষের কর্ম্মপ্রবৃত্তি সমান নহে। কেহ অলস, কেহ কর্ম্মপ্রবণ। এই শেষোক্ত শ্রেণীর লোকই কৃষিকার্য্য দ্বারা ধরিত্রীগর্ভ হইতে মানুষের জন্য এমন সুন্দর ভোগ্যবস্তু আদায় করে এবং কাঁচা মাল হইতে মানুষের পক্ষে এমন প্রয়োজনীয়, এমন আরামপ্রদ ও এমন চিত্তাকর্ষক জিনিষ প্রস্তুত করে যাহা স্বচক্ষে না দেখিলে কেহ বিশ্বাস করিতে পারে না। প্রদর্শনী যে সকল শেষোক্ত শ্রেণীর অল্পসংখ্যক লোকের সাধনার ফলকে বহুলোকের নিকট পরিচিত করিয়া দেয় এমন নহে—প্রদর্শনী বহুসংখ্যক লোককে

অনুরূপ কাজে প্রেরণা দেয় এবং লোকের জীবনযাত্রার আদর্শকে উন্নত করিয়া তোলে। প্রত্যেক দেশে জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধির পক্ষে প্রদর্শনী যে প্রকার সাহায্য করিয়া থাকে তাহা আমরা হয়ত অনেকেই অনুধাবন করিয়া উঠিতে পারি না। পাশ্চাত্য দেশসমূহ প্রদর্শনীর মূল্য বোঝে এবং এক একটা জাতীয় ও আন্তর্জ্জাতিক প্রদর্শনীর জন্য কোটী কোটী টাকা ব্যয় করিয়া থাকে। ইংলণ্ডের বার্ম্মিংহাম ও লণ্ডন সহরে অনুষ্ঠিত সুপ্রসিদ্ধ শিল্প-প্রদর্শনী, প্রাগ, লিপজিগ্, প্যারী প্রভৃতি সহরের বিশ্ববিখ্যাত প্রদর্শনী, শিকাগো আন্তর্জ্জাতিক শিল্পপ্রদর্শনী প্রভৃতির নাম এ দেশের অনেকেই অবগত আছেন। এই সব প্রদর্শনীতে যে বিপুল অর্থব্যয় হয় এবং দেশের রাজশক্তি, রেলবিভাগ, জাহাজ কোম্পানী ডাক বিভাগ, মিউনিসিপ্যালিটী, যানবাহন কোম্পানী প্রভৃতি এই ব্যাপারে যে ভাবে জনসাধারণের সহযোগিতা করিয়া থাকেন তাহা আমাদের দেশের লোকের চিন্তার অগম্য।

আপনারা যে এখানে একটী কৃষি-প্রদর্শনীর আয়োজন করিয়াছেন তজ্জন্য এতদঞ্চলের অধিবাসিগণ আপনাদের নিকট কৃতজ্ঞ। এই মহকুমা বাঙ্গালাদেশের সর্ব্বাপেক্ষা উর্ব্বর অংশের মধ্যে পড়িয়াছে। এই অঞ্চলে উন্নত শ্রেণীর কৃষিজাত দ্রব্য উৎপাদনের পক্ষে কি প্রকার সম্ভাবনা রহিয়াছে তদ্বিষয়ে এই প্রদর্শনী দেখিয়া অনেকের চক্ষু ফুটিবে—উহাই আমি আশা করি। শিল্পের ব্যাপারেও এই মহকুমা পশ্চাৎপদ নহে। এতদঞ্চলের তাঁতিপাড়া, মাইজপাড়া ও বুরদৈর অঞ্চল তাঁত শিল্পের জন্য প্রসিদ্ধ। এই সব স্থানের সঞ্জাব,

পাগড়ী, ধুতি, চাদর, সাড়ী, লুঙ্গি ও গামছা এই জেলার বাহিরেও বিশেষ সমাদৃত হইয়া থাকে। এক সময়ে এই ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বহু স্থানে পাট হইতে বহু প্রকার শিল্পজাত দ্রব্য প্রস্তুত হইত। জনসাধারণের অজ্ঞতার দরুন এই শিল্প এখন জীবন্মৃত অবস্থায় রহিয়াছে। এই অঞ্চলের অনেক অধিবাসী এখনও সুন্দর হুঁকা ও নৈচা তৈয়ার করিয়া থাকে। ব্রাহ্মণবাড়িয়ার কারিগরদের প্রস্তুত নৌকা এখনও বিশেষ সমাদৃত।

ত্রিপুরার শিল্পজাত দ্রব্যাদি

বাঁশ, বেত ও সোলা হইতে এখানকার অধিবাসিগণ যে সব চিত্তাকর্ষক শিল্পদ্রব্য প্রস্তুত করে তাহা বিদেশীগণ পর্য্যন্ত বিশেষ আদরের সহিত ক্রয় করিয়া থাকে। ছাতার বাট এবং পাটী নির্ম্মাণেও এই মহকুমার বিশেষ সুনাম আছে। এতদঞ্চলের শীতলপাটী ভারতের সর্ব্বত্র সুপরিচিত। তালপাতা হইতে যে পাখা নির্ম্মিত হয় তাহাও বিশেষ রমণীয়। ব্রাহ্মণবাড়িয়ার প্রস্তুত পিতল কাঁসার জিনিষেরও খুব সুনাম রহিয়াছে। রামচন্দ্রপুর ও রাণীদিয়া অঞ্চলে ঝিনুক হইতে যে বোতাম নির্ম্মিত হইত তাহা কিছুদিন পূর্ব্বেও অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল। এই মহকুমার অনেক স্থানে মুচিগণ চামড়া হইতে যে জুতা তৈয়ার করে এবং স্থানে স্থানে টালী, ফিল্টার প্রভৃতি যে সব মৃৎনির্ম্মিত জিনিষ প্রস্তুত হয় তাহা উপেক্ষার বিষয় নহে। এতদঞ্চলের, বিশেষতঃ মেড্ডা ও রামচন্দ্রপুরের কর্ম্মকারগণের প্রস্তুত দা, বটি, যাঁতি, প্রুণিং নাইফ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ। এক সময়ে এই মহকুমাতে দেশলাই প্রস্তুতের জন্যও কিছু কিছু চেষ্টা হইয়াছিল। আমি আশা করি যে, এই মহকুমায় শিল্প সাধনার উপরি উক্ত

সমস্ত নিদর্শন আপনাদের অনুষ্ঠিত প্রদর্শনীতে দেখিতে পাইব। আমার আরও আশা যে, এই প্রদর্শনীতে দেশবাসীর কৃষি ও শিল্পপ্রচেষ্টার পরিচয় পাইয়া দেশের লোক এই সব ব্যাপারে সকলকে উৎসাহদানে উদ্বুদ্ধ করিবে। এই প্রসঙ্গে কালীগচ্ছ নিবাসী ঋষিকল্প স্বর্গীয় মহেন্দ্রনাথ নন্দীর কথা আমার মনে হইতেছে। দেশের শিল্পোন্নতির ব্যাপারে স্বর্গীয় নন্দী মহাশয়ের অনুরাগ কেহ বিস্মৃত হইবে না। তাঁহার আবিষ্কৃত দেশলাইয়ের কল ও অন্যান্য কুটীর শিল্পোপযোগী কল এই অঞ্চলে শিল্পের সম্বন্ধে বিশেষ আগ্রহের সৃষ্টি করিয়াছিল। এই বিষয়ে কুণ্ডা গ্রাম নিবাসী স্বর্গীয় শশিভূষণ দত্ত, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার ভূতপূর্ব্ব মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত নবগৌরাঙ্গ বসাকের নামও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। স্বর্গীয় দত্ত মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত শিল্পবিদ্যালয় আজও বর্ত্তমান রহিয়াছে। আমি অদ্যকার এই অনুষ্ঠানে উঁহাদের নাম শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করিতেছি।

মহেন্দ্রনাথ নন্দী

বর্ত্তমানে কৃষি ও শিল্প সম্বন্ধে সমষ্টিগতভাবে দেশের সমক্ষে যে সব সমস্যা উপস্থিত হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে আমি কিছু বলিতে চাই। কেননা, যে সব সমস্যার ঘাত-প্রতিঘাতে এতদঞ্চলের কৃষি ও শিল্পপ্রচেষ্টা প্রভাবিত হইতেছে তাহার সমাধান না হইলে, মাত্র স্থানীয় চেষ্টার দ্বারা এই অঞ্চলের কৃষি ও শিল্প টিকিয়া থাকিতে সমর্থ হইবে না। এজন্য সমস্যার ব্যাপকতা ও উহার প্রতিকারের উপায় সম্বন্ধে সকলের সুস্পষ্ট ধারণা থাকা আবশ্যক। প্রথমতঃ আমি কৃষির কথাই বলিতেছি। দেশের সর্ব্বস্তরের লোক যে রকমে কৃষির উপর নির্ভরশীল তাহা বোধ

হয় বিস্তৃতভাবে বলিবার আবশ্যকতা নাই। কিন্তু কৃষির সুযোগ এ দেশে অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ, ভারতবর্ষের মধ্যে যে স্থলে মধ্যপ্রদেশে প্রতি একশত একর আবাদী জমির মধ্যে গড়পরতা জনসংখ্যা ৬১, বোম্বাইয়ে ৬৭, ব্রহ্মদেশে ৮১, পাঞ্জাবে ৮৮, সংযুক্তপ্রদেশে ১৩৬, মাদ্রাজে ১৩৭, আসামে ১৪৪ এবং বিহার ও উড়িষ্যায় ১৫৪ জন সেই স্থলে বাঙ্গালায় প্রতি একশত একর আবাদী জমিতে গড়পরতা জনসংখ্যা ২১৪ জন। ব্রাহ্মণবাড়িয়া বাঙ্গালাদেশের সর্ব্বাপেক্ষা ঘনবসতিপূর্ণ অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং এই অঞ্চলের প্রতি একশত একর আবাদী জমিতে জনসংখ্যা ২১৪ জনের অনেক বেশীই হইবে। বাঙ্গালাদেশে বর্ত্তমানে জমির উৎপাদিকা শক্তি যে প্রকার, তাহাতে এদেশের জনসাধারণের অনুসৃত অতি হীন জীবনযাত্রার আদর্শ বজায় রাখিতেও মাথা পিছু গড়ে অন্ততঃ এক একর জমি আবশ্যক। কিন্তু বাঙ্গালায় তাহাও নাই। সুতরাং বর্ত্তমানে জমির উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি করিতে না পারিলে জনসাধারণের পক্ষে কোনরূপে গ্রাসাচ্ছাদন সংগ্রহ করাও অসম্ভব হইবে। পৃথিবীর অন্যান্য দেশে সেচ-কার্য্যের ব্যবস্থা, উন্নত প্রণালীতে জমি চাষ, পুষ্ট ও উৎকৃষ্ট শ্রেণীর বীজ ব্যবহার, জমিতে অর্থকরী ফসলের চাষ, বৈজ্ঞানিক-প্রণালীতে সার প্রয়োগ, ফসলের রোগ ও পোকার উপদ্রব নিবারণ প্রভৃতি কার্য্যের ফলে জমির উৎপাদিকা শক্তি অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। অনেকে শুনিয়া বিস্মিত হইবেন যে, বাঙ্গালায় প্রতি একর জমিতে যে পরিমাণ ধান জন্মে জাপানে তাহা অপেক্ষা আড়াই গুণ, ইটালীতে দ্বিগুণ এবং স্পেনে সাড়ে

কৃষির কথা

তিনগুণ অধিক ধান জন্মিয়া থাকে। কেবল তাহাই নহে, পৃথিবীর উন্নত দেশসমূহের কৃষকগণ একদিকে যেমন জমিতে অধিক ফসল পায় সেইরূপ অন্যদিকে উন্নত প্রণালীতে পশুপক্ষী পালন, মৌমাছির চাষ, মাছের চাষ, ছোটখাট শিল্পকার্য্য ইত্যাদির মারফতেও তাহাদের প্রচুর অর্থাগম হইয়া থাকে। আমাদের দেশে এই সব ব্যাপারে কোন চেষ্টা উদ্যম নাই। এই সব ব্যাপারে গভর্মেণ্টের বিপুল কর্ত্তব্য রহিয়াছে। বড়ই সুখের বিষয় যে, বর্ত্তমানে আমরা কৃষকদের দুঃখ-দুর্দ্দশার প্রতি সহানুভূতিশীল হইয়াছি। ভারতীয় কৃষির উন্নতির জন্য গো-প্রজননের উদ্দেশ্যে দেশের স্থানে স্থানে উন্নত ধরণের বৃষ আনিবার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে এখনও হয়ত অনেকে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেছেন না। কিন্তু একথা অনেকেই ভাবিয়া দেখেন না যে, বাঙ্গালাদেশে অন্ততঃ ৭৫ লক্ষ দুগ্ধবতী গাভী রহিয়াছে। উৎকৃষ্টতর প্রজননের ফলে এই সব গাভীর প্রদত্ত দুগ্ধের পরিমাণ দৈনিক যদি অর্দ্ধ সেরও বৃদ্ধি করা যায় তাহা হইলে প্রতি মণ দুধের মূল্য গড়ে তিন টাকা এবং প্রত্যেক গাভী বৎসরে ৩০০ দিন দুধ দেয়, উহা ধরিয়া একমাত্র এই বাবদে বাঙ্গালাদেশের আয় বৎসরে প্রায় ৯ কোটী টাকা বাড়িয়া যাইতে পারে। যাহা হউক কেবল গভর্মেণ্টের মুখ চাহিয়া থাকিলে কোন জাতি নিজ অবস্থার উন্নতি সাধনে সমর্থ হয় না।

দেশের লোকের স্বাবলম্বী হওয়ার প্রয়োজন

দেশের লোক যদি স্বাবলম্বী হয় এবং শ্রমের মর্য্যাদা উপলব্ধি করিতে পারে তাহা হইলে কোন অর্থব্যয় না করিয়া মাত্র শ্রমবিনিয়োগ দ্বারাই সেচকার্য্য, পশু-পক্ষীপালন প্রভৃতি অনেক হিতকর কাজ

সমাধা হইতে পারে। কুরুলিয়া খাল তাহার একটি প্রকৃত নিদর্শন। আমি আজিকার দিনে এই কৃষি-শিল্প-প্রদর্শনীর উদ্বোধনের সুযোগে আমার মহকুমার অধিবাসিগণকে এই সব বিষয় ভালরূপে চিন্তা করিয়া দেখিতে অনুরোধ করিতেছি।

শিল্প সম্বন্ধেও অনেক কথা বলিবার আছে। কিন্তু বর্ত্তমান স্থান ইহার বিস্তৃত আলোচনার ক্ষেত্র নহে। কাজেই আমি সংক্ষেপে দুই একটি কথা বলিতেছি। আমাদের দেশে কুটীর-শিল্পগুলি বিনষ্ট ও জীবন্মৃত হইবার প্রধান কারণ, বিদেশী কলজাত সস্তা জিনিষের প্রতিযোগিতা। কিন্তু শিল্পীদের মধ্যে মানুষের পরিবর্ত্তনশীল রুচি ও প্রয়োজনমত জিনিষ সরবরাহের জ্ঞানের অভাবও এজন্য কম দায়ী নহে। এমন এক সময় ছিল যখন আমাদের দেশের নিরক্ষর শিল্পীগণও বিদেশে প্রস্তুত শিল্পজাত দ্রব্যের সঙ্গে অনায়াসে প্রতিযোগিতা করিতে পারিত। ঐ সময়ে শিল্পীদের আর্থিক অবস্থাও স্বচ্ছল ছিল। কিন্তু পরিবর্ত্তনের যুগে পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে নিজেকে খাপ খাওয়াইতে অসমর্থ হওয়ার দরুন আজ বহু শিল্পী পিতৃপুরুষের আশ্রিত পেষা ছাড়িয়া কৃষিজীবী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যাহারা এখনও শিল্পের আশ্রয়ে দণ্ডায়মান রহিয়াছে তাহারা মহাজনের নিকট দেনার দায়ে আবদ্ধ। বহু পরিশ্রমে সে যে সব শিল্পজাত দ্রব্য প্রস্তুত করে তাহা তাহাকে জলের দরে মহাজনের নিকট বিক্রয় করিতে হয়। এই অবস্থার দরুন শিল্পীগণ নিজ নিজ কাজে সর্ব্বপ্রকার উৎসাহ উদ্যম হারাইয়াছে। আধুনিক কলকব্জা

শিল্প-প্রচেষ্টা;
কুটির-শিল্প

বসাইয়া শিল্পজাত দ্রব্যের উৎকর্ষতা সাধনও তাহার শক্তির অতীত। এই সমস্যার সমাধান করিতে হইলে শিল্পীগণকে মহাজনের কবল হইতে মুক্ত করিতে হইবে, মানুষের রুচি অনুযায়ী নূতন নূতন ডিজাইন এ নূতন ধরণের ফিনিশ সম্বন্ধে তাহাদিগকে উপদেশ দিতে হইবে, শিল্পীগণ যাহাতে যথাসম্ভব কম মূল্যে শিল্পজাত দ্রব্যের উপাদান সংগ্রহ করিতে পারে তাহার সুযোগ দিতে হইবে এবং শিল্পজাত দ্রব্য যাহাতে সহজে বিক্রয় হয় তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

মূলধন ও সমবায় প্রচেষ্টা

এক্ষেত্রে স্বভাবতঃই মূলধন সরবরাহ, সমবায় প্রভৃতির কথা আসিয়া পড়ে। এই দুইটী সমস্যা, কৃষি ও শিল্প এই উভয় প্রকার প্রচেষ্টার মূল সমস্যা বলিয়া এক সঙ্গেই উহার উল্লেখ করিতেছি। ছোট বড় কোন কাজই মূলধন ব্যতিরেকে সম্পন্ন হয় না। মন্দার সময়ে মজুত মাল বন্ধক রাখিয়া বড় বড় কলকারখানার কোটীপতি মালিকগণ যেমন বাজার হইতে লক্ষ লক্ষ টাকা ধার করিতে বাধ্য হন সেইরূপ হঠাৎ অজন্মা হইলে, হালের গোরু মরিয়া গেলে অথবা ক্ষেত্রস্থিত ফসল বিক্রয়ের প্রতীক্ষায় কৃষককেও সময়ে অসময়ে টাকা ধার করিতে হয়। এতদিন পর্য্যন্ত গ্রাম্য মহাজনগণই কৃষকগণকে প্রয়োজনের সময়ে টাকা ধার দিয়াছেন। কিন্তু প্রয়োজনের অনুপাতে টাকার অভাব থাকার দরুন মহাজনগণ কৃষকদের নিকট হইতে এত অধিক হারে সুদ আদায় করেন যে, বর্ত্তমানে এই পণ্যমূল্য হ্রাসের দিনে কৃষকের পক্ষে এই হারে সুদ দেওয়া আর সম্ভবপর নহে। গভর্মেণ্ট কিছু দিন পূর্ব্বে ঋণসালিশী আইন বলবৎ করিয়া

বহু কৃষককে অবশ্যম্ভাবী দেউলিয়া অবস্থা হইতে রক্ষা করিয়াছেন বটে—কিন্তু এই আইন দ্বারা মহাজনদের নিকট কৃষকের সুনাম সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হইয়াছে। ভবিষ্যতে কোন কৃষকের পক্ষে মহাজনদের নিকট হইতে প্রয়োজনের সময়ে ঋণ পাওয়া সম্ভবপর হইবে বলিয়া আমি মনে করিনা। এই অবস্থার প্রতিকারের জন্য গভমের্ণ্ট সম্প্রতি যে সব জমিবন্ধকী ব্যাঙ্ক স্থাপন করিয়াছেন তাহার কার্য্যপ্রণালী আমি বিশেষভাবে লক্ষ্য করিতেছি। আমি আশা করি যে, গভমের্ণ্ট অদূর ভবিষ্যতে বাঙ্গালার প্রত্যেক মহকুমাতে একটী করিয়া জমিবন্ধকী ব্যাঙ্ক স্থাপন করিবেন এবং প্রত্যেক ব্যাঙ্কের হাতে বিভিন্ন স্থানের প্রয়োজনানুরূপ অর্থ প্রদান করিবেন। যদি তাহা না হয় তাহা হইলে প্রয়োজনের সময়ে টাকা ধার না পাওয়া হেতু বাঙ্গালাদেশে কৃষির সহায়তায় উৎপাদনের পরিমাণ বহুলাংশে কমিয়া গিয়া দেশের কৃষকসমাজের দুরবস্থা আরও চরমে উঠিতে পারে।

কৃষকদের আর্থিক দুর্গতি

শিল্পীগণের সম্বন্ধেও অনেকটা এই ধরণের কথা বলা যায়। এতদিন দেশের ভিতরে শিল্পপ্রতিষ্ঠানে মূলধন সরবরাহের কোন প্রতিষ্ঠানই ছিল না। আমি দেখিয়া সুখী হইলাম যে, সম্প্রতি গভমের্ণ্ট দেশের কোন কোন ছোট ছোট শিল্পগুলিতে মূলধন সরবরাহের উদ্দেশ্যে ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ক্রেডিট কর্পোরেশন নামক একটী বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের খরচ জোগাইতে এবং এই প্রতিষ্ঠানের ঝুঁকির কতকাংশ নিজের স্কন্ধে বহন করিতে রাজী হইয়াছেন। ক্রমে দেশের সমস্ত ছোটখাট শিল্পপ্রতিষ্ঠানে প্রয়োজনমত মূলধন

শিল্পের উন্নতি প্রচেষ্টা

সরবরাহ, শিল্পীগণকে ধারে ধারে কাঁচামাল প্রদান, বিশেষজ্ঞ দ্বারা তাহাদিগকে সতত উপদেশ দান এবং তাহাদের প্রস্তুত শিল্পজাত দ্রব্য বিক্রয়ের ভার গ্রহণ করিতে পারে তজ্জন্য দেশবাসী সকলেরই সাহায্য করা আবশ্যক।

আজকাল সকলের মুখেই পল্লীসংগঠনের কথা উঠিয়াছে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালার ত্যাগী কর্ম্মবীর দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন বাঙ্গালার পল্লীসংগঠনের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। অতঃপর ভারতের অবিসম্বাদী জননায়ক মহামানব মহাত্মা গান্ধী এই সমস্যার প্রতি সমগ্র ভারতের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। বড়ই সুখের বিষয় যে, বর্ত্তমানে রাজশক্তিও এই বিষয়ে সচেতন হইয়াছেন এবং গত দুই বৎসরে পল্লীসংগঠনের জন্য দুই কোটী টাকার উপর ব্যয় মঞ্জুর করিয়াছেন। কিন্তু ভারতের ৭ লক্ষ পল্লীগ্রামের নৈতিক, সামাজিক, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা সংক্রান্ত যথোচিত উন্নতি সাধন করিতে হইলে, এই দুই কোটী টাকা দ্বারা এক মাসের ব্যয়ও সঙ্কুলান হইবে না। সুতরাং আমরা যদি একমাত্র সরকারী রাজস্ব হইতে অর্থসাহায্যের দ্বারা সর্ব্ববিধ পল্লীগঠনের কাজ সমাধা করার আশায় বসিয়া থাকি তাহা হইলে উহা মৃগতৃষ্ণিকার পশ্চাতে ধাবমান হওয়ারই সমতুল্য হইবে।

পল্লীসংগঠন

পল্লীর যদি উন্নতি সাধন করিতে হয়, তাহা হইলে প্রত্যেক পল্লীতে কৃষি ও শিল্পের উন্নতি সাধন করিয়া জনসাধারণের আয় বৃদ্ধি করিতে হইবে এবং প্রত্যেক পল্লীসংগঠনের ব্যয় পল্লী হইতেই সংগ্রহ করিতে হইবে। সুতরাং পল্লীসংগঠনের আগে যাহাতে কৃষি ও

পল্লীর উন্নতির উপায় নির্দ্ধারণ

শিল্পের উন্নতি হইয়া পল্লীবাসীর আর্থিক অবস্থার উন্নতি হয়, তৎপ্রতিই অধিক জোর দেওয়া আবশ্যক। আজ পল্লীতে শিক্ষা ও চিকিৎসার কোন ব্যবস্থা নাই, পল্লীর নৈতিক ও প্রাকৃতিক আবহাওয়া দূষিত ও অস্বাস্থ্যকর এবং চোর ডাকাতের উপদ্রবে কাহারও ধনপ্রাণ নিরাপদ নহে। গ্রামের পরস্পরের মধ্যে সহযোগিতা ও স্বাবলম্বনের প্রবৃত্তিরও অভাব রহিয়াছে। শ্রমের মর্য্যাদা কেহ উপলব্ধি করিতে পারে না। অধিকাংশ লোক নিরক্ষর ও অজ্ঞ। ফলে সামাজিক দলাদলি, শ্রেণীগত বিভেদ, সাম্প্রদায়িক মনোমালিন্য প্রভৃতি প্রবল হইয়াছে। এই সব বিষয়ের প্রতিকার করিতে হইলে প্রত্যেক পল্লীর মধ্যে বিদ্যালয়,

স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা

হাসপাতাল, লাইব্রেরী, সেবাসমিতি, গ্রাম-রক্ষীদল, সমবায়সমিতি প্রভৃতির ব্যবস্থা করিতে হইবে। এই সব কাজের জন্য যদি প্রতি মাসে গড়ে একশত টাকা ব্যয়েরও প্রয়োজন হয় তাহা হইলে ভারতের ৭ লক্ষ পল্লীর জন প্রতি মাসে ৭ কোটী এবং প্রতি বৎসরে ৮৪ কোটী টাকা ব্যয়ের প্রয়োজন। এই অর্থ গভর্মেণ্টের কোষাগার হইতে আসিতে পারে না। একমাত্র পল্লীসমূহে কৃষি ও শিল্পের উন্নতির দ্বারাই এই অর্থের সংস্থান হইতে পারে এবং একমাত্র এই উপায়েই দেশের নিদারুণ বেকার সমস্যার সমাধান হইতে পারে।

আমাদের দেশে অনেক দিন ধরিয়া সমবায় আন্দোলন প্রচলিত হইয়াছে। কিন্তু সমবায় সমিতিসমূহ আজ পর্য্যন্ত তাহাদের কর্ম্মক্ষেত্র প্রধানতঃ কৃষককে ঋণদানের কাজেই সীমাবদ্ধ রাখিয়াছে। দেশের ধনসম্পদ বৃদ্ধিমূলক কাজে আজ পর্য্যন্ত

সমবায় সমিতিসমূহ একপ্রকার হস্তক্ষেপই করে নাই। যে দেশে জমির অভাব এত বেশী এবং জমির উৎপাদিকা শক্তি এত কম, সেই দেশে মাত্র কম সুদে টাকা ধার পাইলেই দেশের লোক বাঁচিয়া থাকিতে পারে না। যাহারা দেউলিয়া দশাগ্রস্ত তাহারা কমসুদে কেন—বিনাসুদে টাকা ধার পাইলেও রক্ষা পাইবে না। দেশের লোককে পরিশ্রম দ্বারা তাহাদের আয় বৃদ্ধির যদি সুযোগ করিয়া দেওয়া হয় তাহা হইলেই তাহাদের প্রকৃত উপকার হইতে পারে। আমি আশা করি, সমবায় আন্দোলনের প্রবর্ত্তকগণ এই বিষয়টী বিশেষভাবে ভাবিয়া দেখিবেন। সমবায় বিভাগ যদি বর্ত্তমানে উন্নত ধরণের কৃষি, ছোটখাট সেচকার্য্য, পশুপক্ষী পালন, মাছের চাষ, ছোট ছোট শিল্পের প্রতিষ্ঠা, কৃষি ও শিল্পজাত দ্রব্যের বিক্রয় ব্যবস্থা ইত্যাদি কাজে অধিক মনোযোগ দেন, তাহা হইলেই এই আন্দোলন সার্থক হইয়া উঠিতে পারে। অবশ্য এই সব ব্যাপারে সমবায় বিভাগের যে সব অসুবিধা রহিয়াছে আমি তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি। এদেশের লোক নিরক্ষর ও অজ্ঞ বিধায় সকলে সমবায়ের মূল্য উপলব্ধি করিতে পারে না। শিক্ষার অভাবে অবস্থানুযায়ী ব্যয় করিতেও তাহারা অনভ্যস্থ। আমার মনে হয় যে, দেশে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক-শিক্ষা প্রবর্ত্তিত হইলে এই বিষয়ে অসুবিধা অনেক দূরীভূত হইতে পারে। বড়ই দুঃখের বিষয় যে, কয়েক বৎসর পূর্ব্বে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা আইন পাশ হইলেও দেশের আর্থিক দুরবস্থার জন্য গভর্মেণ্ট তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে সাহস পাইতেছেন না।

সমবায় আন্দোলন

প্রাথমিক শিক্ষা

যাহা হউক, বর্ত্তমানে দেশের ভিতরে মন্দা অনেকটা কাটিয়া যাইতেছে। সরকারী রাজস্বেও আয়-ব্যয়ের সমতা সাধিত হইয়াছে। আমি আশা করি, বর্ত্তমানে দেশের সর্ব্বত্র এই আইন বলবৎ করা হইবে।

সকল উন্নতির মূলে শিক্ষা। যতদিন এদেশে অন্ততঃ বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার না হয় ততদিন দেশের লোকের দুঃখ-দুর্দ্দশার কথঞ্চিৎ অপনোদনের আশাও বৃথা। এরূপ শিক্ষা আমাদের দেশে প্রচলন করিতে পারিলেই দেশের শ্রমিক, কৃষক ও সাধারণ লোকের কর্ম্মতৎপরতা বৃদ্ধি পাইবে এবং দেশের চিন্তাধারা একই খাতে প্রবাহিত হইবে।

আমরা এখানে অবিনাশচন্দ্রের ব্রাহ্মণবাড়িয়া কৃষি-শিল্প-প্রদর্শনী সম্পর্কে প্রদত্ত বক্তৃতার কিয়দংশ যাহা উদ্ধৃত করিলাম, তাহা হইতেই পাঠকবর্গ তাঁহার দেশপ্রীতি ও দেশের সমস্যা সম্বন্ধে যে তিনি কত গভীরভাবে চিন্তা করিতেন, তাহার পরিচয় পাইয়া থাকিবেন।

কলিকাতা আসিবার পর তিনি ত্রিপুরা জেলার সর্ব্ববিধ উন্নতির জন্য অগ্রণী ছিলেন। বাঙ্গলাদেশে স্ত্রী-শিক্ষার মূলে

ত্রিপুরা হিতসাধিনী-সভা

এক সময়ে যে সমুদয় প্রতিষ্ঠান দেশের প্রভূত কল্যাণ করিয়াছিল, তাহার মধ্যে ত্রিপুরা-হিতসাধিনী সভা একটি প্রাচীনতম প্রতিষ্ঠান। স্বর্গত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় "মহাত্মা বেথুন ও বঙ্গদেশে স্ত্রীশিক্ষা" নামক প্রবন্ধে লিখিয়াছিলেন :

"১৮৭২ সালে কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় মহিলাগণের উচ্চশিক্ষার্থ একটি বয়ঃস্থা—বিদ্যালয় ও তৎসহ স্ত্রী নর্ম্মাল বিদ্যালয় স্থাপন

প্রৌঢ় বয়সে অবিনাশচন্দ্র সেন

করেন। কয়েক বৎসর এই বিদ্যালয়ের কার্য্য চলিয়াছিল। অচির-কালের মধ্যে তাঁহার সহিত মহিলাগণের উচ্চ-শিক্ষা সম্বন্ধে মতভেদ হওয়াতে উন্নতিশীল ব্রাহ্ম-দলের কতিপয় ব্যক্তি উদ্যোগী হইয়া "বঙ্গ-মহিলা-বিদ্যালয়" নামে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। তাহাতে আমাদের উচ্চ-শিক্ষিতা মহিলাগণের অনেকে শিক্ষালাভ করিয়াছেন। এই বিদ্যালয় অবশেষে বেথুন বিদ্যালয়ের সহিত মিলিত হইয়া ইঁহাকে বেথুন কলেজ রূপে পরিণত করিয়াছে।"

স্ত্রী-শিক্ষা

"ইহার পরে আরও কতকগুলি যুবকের প্রশংসনীয় উদ্যম উল্লেখ করা আবশ্যক। ১৮৭৭—১৮৯০ পর্য্যন্ত এই কালের মধ্যে কলিকাতাতে "যশোর ইউনিয়ান, "বাখরগঞ্জ ইউনিয়ান," "শিলেট ইউনিয়ান", 'বিক্রমপুর সম্মিলনী', 'ফরিদপুর-সুহৃদসভা', 'ত্রিপুরা হিতসাধিনীসভা' প্রভৃতি নাম দিয়া কতকগুলি সভা স্থাপিত হয়। ঐ সকল স্থানের যুবকগণ, ছাত্রগণ প্রধানতঃ উদ্যোগী হইয়া স্ব স্ব জেলার ভদ্রলোক-দিগের সাহায্যে ঐ সকল সভা স্থাপন করিয়াছিলেন। সভার কার্য্য চালাইবার জন্য যুবক সভ্যগণের যেরূপ উৎসাহ এক সময়ে দেখিয়াছি, তাহা স্মরণ করিলে আনন্দ হয়। ক্ষোভ হয় আর কেন সেরূপ উৎসাহ দেখিতে পাই না।" [—প্রবাসী ৪র্থ ভাগ ভাদ্র ১৩১১]

প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে শাস্ত্রী মহাশয় বাঙ্গলাদেশে স্ত্রী-শিক্ষা প্রচার সম্পর্কে যাহা লিখিয়াছেন তাহা হইতেই সেকালের স্ত্রীশিক্ষা বিস্তার ও জেলার উন্নতিকল্পে যে সকল প্রতিষ্ঠান কলিকাতাতে প্রতিষ্ঠাপিত হইয়া দেশের কল্যাণ ব্রতে ব্রতী হইয়াছিল, তাহাদের পরিচয় পাওয়া যায়।

কলিকাতা সহরে আসিয়া কোন নবাগত ব্যক্তির পক্ষে জ্ঞানী, গুণী ও ধনী এবং সম্ভ্রান্ত পরিবারের সহিত পরিচিত হওয়া

বড় সহজ নহে, কিন্তু অবিনাশচন্দ্র কলিকাতা আসিয়া দশ পনেরো বৎসরের মধ্যেই পরিচিত, আদরণীয় এবং সকলের শ্রদ্ধালাভ করিয়াছিলেন; সমাজের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিরূপে পরিচিত হইয়াছিলেন।

অনেককে দেখিতে পাওয়া যায় যে অর্থশালী ও প্রতিপত্তি-শালী হইলে আত্মীয়-স্বজনের কথা ভুলিয়া যান এবং কোনরূপ আত্মীয়তা রক্ষা করা ও সমাচীন মনে করেন না, অবিনাশচন্দ্র সেই প্রকৃতির লোক ছিলেন না, তাঁহার আত্মীয়স্বজনের প্রতি প্রীতি ও অনুরাগ ছিল স্বাভাবিক। আত্মীয়, বন্ধুবান্ধব, সকলের প্রতি তাঁহার স্নেহ ও ভালবাসা ছিল অক্ষুণ্ণ। আমরা এখানে অবিনাশচন্দ্রের এক ভাগিনেয়ের লিখিত একটি বিবরণী হইতে তাহা অতি সুন্দরভাবে জানিতে পারিতেছি।

আত্মীয়স্বজনের প্রতি প্রীতিও ভালবাসা

অবিনাশচন্দ্রের মাতুল-ভগ্নীর পুত্র শ্রীযুত হরেন্দ্রকিশোর দত্ত রায়ের লিখিত যে-পত্রখানি এখানে প্রকাশ করা হইল, তাহাই হইতেছে উহার উৎকৃষ্ট নিদর্শন।

"গত ৩০ বৎসর যাবত আমার শ্রদ্ধেয় মাতুল ৺অবিনাশচন্দ্র সেন-মহাশয়ের পরিবারের সান্নিধ্য লাভের সুযোগ হইয়াছে। এই দীর্ঘকাল আমি এবং অন্যান্য অনেকে তাঁহার নিকট হইতে যেরূপ সাহায্য এবং সদুপদেশ লাভের সুযোগ পাইয়াছি তাহারই কিঞ্চিৎ বর্ণনা—তাঁহার জীবনেতিহাস লেখকের সাহায্যের জন্য দিতেছি।

তাঁহার সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাৎ হয় ১৯১৩ ইংরাজী সনে। আমার কোনও এক নিকট আত্মীয়ের সঙ্গে আমি চক্ষু-চিকিৎসার জন্য কলিকাতা উক্ত আত্মীয়ের বাসায় দুই দিন থাকার পরই আমার অন্যত্র

যাওয়ার প্রয়োজন হয়, তখন প্রথমেই আমার মাতুল মহাশয়ের কথা মনে হয় কারণ মা'এর নিকট তাঁহার কথা পূর্ব্বেই অনেক শুনিয়াছিলাম। বেলা ১০২টায় তৎকালীন তাঁহার ১২নম্বর পটলডাঙ্গার বাসাতে আসি, তিনি তখন আফিসে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হইয়া নীচে নামিতেছিলেন; আমি তাঁহাকে প্রণাম করিলাম এবং আমার পরিচয় দিতেই তিনি আমাকে মামীমার নিকট নিয়া গেলেন এবং বলিলেন অফিস হইতে আসিয়া সব আলাপ করিবেন। এখানে একটু বলা প্রয়োজন—আমি গরীবের ছেলে ছিলাম এবং তিনি খুব বড়লোক শুনিয়া রীতিমত ভয় করিতেছিলাম, এই ভয়টা আমার পক্ষে খুবই স্বাভাবিক ছিল কারণ বড়লোক নিকট আত্মীয়ের নিকট অবহেলিত হওয়ার দুর্ভাগ্য আমার হইয়াছিল, কিন্তু এই পরিবারে অল্পকাল থাকার পরই তাহাদের সহজ, সরল ও অমায়িক ব্যবহারে আমার এই "বড়লোক ভীতি" একেবারে চলিয়া গেল, তিনি অফিস হইতে আসিয়াই আমাকে নিকটে ডাকাইয়া সমস্ত আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুবান্ধব এবং দেশের তাঁহার পরিচিত লোকের খবরাখবর জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন।

তৎকালে আমাদের দাদামহাশয় (৺অবিনাশচন্দ্রের মাতুল) ৺নবীন সেন মহাশয় ঐখানে থাকিতেন, তিনি ৺মামার সুখ সুবিধার প্রতি অত্যন্ত যত্ন নিতেন।

আমার আবশ্যকীয় কাপড়জামা অপ্রচুর ইহা লক্ষ্য করিয়া আমাকে এবং আমি বাড়ী যাওয়ার সময় আমার পরিবারের অন্যান্যদের জন্য প্রচুর কাপড় এবং আবশ্যকীয় জিনিষপত্র কিনিয়া দিয়াছিলেন।"

"১৯১৮ সালে চাকুরীর উদ্দেশ্যে পুনরায় কলিকাতা আসিলাম, সেই সময় ১৩নং লোয়ার সার্কুলার রোডে তিনি থাকিতেন, তখন তাঁহার বাসায় আরও অনেকে—কেহ বা আমার ন্যায় চাকুরীর সন্ধানে, কেহ কেহ কলেজে পড়ার জন্য থাকিতেন, তিনি সকলের প্রতি সমভাবে যত্ন নিতেন, সুখ সুবিধার দিকে লক্ষ্য রাখিতেন এবং কাহার কিভাবে

সংস্থান করিবেন সে দিকে বিশেষ চেষ্টা করিতেন, অনেককেই নিজের আফিসে অথবা অন্যত্র চাকুরী অথবা অন্যান্য ভাবে আয়ের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন এমন কি—অনেককে নিজ অর্থ দ্বারা ব্যবসায় করার সুবিধা করিয়া দিয়াছেন।"

"তাঁহার দান সম্পর্কে সঠিক বিবরণ দেওয়া অত্যন্ত কঠিন, কারণ তাঁহার দানের বিষয় প্রচারিত হউক এই ইচ্ছা তাঁহার কখনও ছিল না, আমার মনে হয় তিনি এমন অনেক দান করিয়া গিয়াছেন যাহার খবর তাঁহার পরিবারস্থ লোকেরাও জানেন না, দুঃস্থ আত্মীয়স্বজনের আজীবন ভরণ-পোষণ, কন্যাদায়গ্রস্ত ব্যক্তিদিগকে অর্থ-দান, রোগে-শোকে নানাভাবে সাহায্য করা তাঁহার নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার ছিল, নিজের দেশের প্রতি তাঁহার অত্যন্ত টান ছিল, নিজ গ্রাম চুণ্টাতে তিনি বহু অর্থ ব্যয়ে দাতব্য চিকিৎসালয়, স্কুল, পাঠাগার ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন, কুমিল্লার লোকের সুচিকিৎসার জন্য তিনি কুমিল্লা হাসপাতালে রঞ্জন-রশ্মির সাহায্যে পরীক্ষার ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন, নানা জনহিতকর প্রতিষ্ঠানে তাঁহার যথেষ্ট দান আছে, আমি ব্যক্তিগতভাবে যাহা জানি কেবলমাত্র তাহাই উল্লেখ করিলাম। ১৯৩০ সনে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলা পরিচালনার জন্য তিনি অর্থ সাহায্য করিয়াছেন, কংগ্রেস, অভয়াশ্রম প্রভৃতি জাতীয় প্রতিষ্ঠান তাঁহার নিকট হইতে বহু অর্থ সাহায্য পাইয়াছে, রাজনৈতিক, স্বাস্থ্য, শিক্ষা প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানে তিনি সর্ব্বদা অর্থ সাহায্য করিয়া গিয়াছেন, তন্মধ্যে কয়েকটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য :—

নোয়াখালী হিন্দুদের জন্য সাহায্য তহবিল।

কুমিল্লা কলেজ।

ব্রাহ্মণবাড়ীয়া শিল্প-স্বাস্থ্য-প্রদর্শনী।

আনন্দময়ী বালিকা-বিদ্যালয় ইত্যাদি—

'যিনি তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়াছেন তিনিই তাঁহার অমায়িক ব্যবহার ও সরল আতিথেয়তায় মুগ্ধ হইতেন, উৎসবাদিতে তিনি ছোট বড় ভেদাভেদ ভুলিয়া সকলকে সমভাবে গ্রহণ করিয়াছেন।

আত্মীয়স্বজনের কথা সব সময়েই তিনি ভাবিতেন, নিজ গ্রামে গিয়া সকলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা, গ্রামের নানাবিধ জনহিতকর উন্নতিসাধন ইত্যাদি বিষয়ে আত্মনিয়োগ করিতেন, ইদানীং যাতায়াতের অসুবিধার দরুন উহার ব্যতিক্রম হওয়ায় তিনি অত্যন্ত দুঃখিত ছিলেন, এই সব কথা প্রায়ই তিনি বলিতেন! আত্মীয়-স্বজনের কথা মনে হইলে তিনি সব কিছু ভুলিয়া যাইতেন, আমার মনে আছে, একবার হঠাৎ মাতুল মহাশয় বলিলেন যে তিনি মামার বাড়ী যাবেন, তখন তাঁহার ৭০ বৎসর বয়স, তাঁহার মামার বাড়ী ত্রিপুরা জিলার যমুনা গ্রামে; যাতায়াত অত্যন্ত অসুবিধাজনক, নিকটবর্ত্তী রেলওয়ে ষ্টেশন ৬ মাইল দূরে—এবং ব্রাহ্মণবাড়ীয়া হইতে দূরত্ব ২০ মাইল, সেই সব দিকে যাতায়াত নৌকায় করিতে হয়, কলিকাতা হইতে তিনি তাঁহার তৃতীয় পুত্র শ্রীমান অনিলকে নিয়া রওয়ানা হইয়া ব্রাহ্মণবাড়িয়া গেলেন এবং সেখান হইতে আবার মাকে সঙ্গে নিয়া যমুনা রওয়ানা হইলেন, কিন্তু কচুরীপানার জন্য তাহাকে বাধ্য হইয়া গ্রাম হইতে দুই মাইল দূরে জলে নামিতে হইল ইহাতে বিন্দুমাত্র বিচলিত না হইয়া জল কাদা ভাঙ্গিয়া তিনি সকলকে নিয়া মামার বাড়ী পৌঁছিলেন, সকলেই একেবারে অবাক, কিছুক্ষণ বিশ্রামের পরই তিনি তাঁহার মাতার শ্মশানে গেলেন এবং সেখানে অনেকক্ষণ শিশুর ন্যায় কান্নাকাটি করিলেন, আত্মীয়-স্বজনের খোজ নেওয়ার জন্য তাঁহার ন্যায় লোকের এত কষ্ট স্বীকার এরূপ দৃষ্টান্ত আমাদের দেশে অত্যন্ত বিরল, বঙ্গ বিভাগের পরেও তিনি সকলের কথা এবং দরিদ্র বিপদগ্রস্ত আত্মীয়-স্বজনকে নিরাপদ স্থানে আনার বিষয় চিন্তা করিতেন, কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য, হঠাৎ আমরা তাঁহার সাহায্য হইতে বঞ্চিত হইলাম।"

অবিনাশচন্দ্রের মাতুল বাড়ী যাওয়ার উদ্দেশ্য ছিল, তাঁহার মাতার শ্মশানোপরি একটি শিব-মন্দির প্রতিষ্ঠা করা, কিন্তু শ্মশানস্থান কেহই নির্দ্দেশ করিয়া দিতে পারিলেন না, একজন অতি প্রাচীনা মুসলমান মহিলা তাঁহার মাতার মৃত্যু ও সৎকার নিজ চক্ষে দেখিয়াছিলেন, কিন্তু দীর্ঘ কাল পরে তাঁহার পক্ষেও নির্দ্দিষ্ট স্থান চিহ্নিত করিয়া দেওয়া সম্ভব হয় নাই।

মাতৃভক্তি

জন্মিয়া মাকে চিনিবার ও বুঝিবার সৌভাগ্য তাঁহার হয় নাই। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে মাত্র দশমাস বয়সে অবিনাশচন্দ্র তাঁহার মাকে হারাইয়াছিলেন, এই মাতৃবিয়োগ-বেদনা, মাকে বুঝিবার, দেখিবার ও জানিবার সুযোগ যে বিধাতা তাঁহাকে দেন নাই, সেজন্য মায়ের কথা উঠিলেই তিনি ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িতেন। কেহ মাতৃবিয়োগের কথা বলিলে, তাঁহার দুই চক্ষু অশ্রুজলে ভরিয়া যাইত। অনেক সময় নিজের জীবনের উন্নতির কথা বলিতে গেলে—বলিতেন, আমার স্বর্গবাসী পিতামাতার আশীর্ব্বাদেই আমার এই সৌভাগ্য লাভ হইয়াছে। তাঁহার মাতৃভক্তি ছিল আদর্শস্থানীয়।

সপ্তম অধ্যায়

স্বদেশী যুগের আদর্শ, অবিনাশচন্দ্রকে স্বদেশের প্রতি অধিকতর অনুরাগী করিয়া তুলিয়াছিল। তাঁহার পরিচয় আমরা নানা ভাবে পাইতেছি। প্রথমে তাঁহার প্রিয় ত্রিপুরা-হিতসাধিনী-সভার কথা বলিব। ত্রিপুরা-হিতসাধিনী সভা বঙ্গাব্দ ১২৭৮ ইংরাজী ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত হইয়াছিল। ত্রিপুরার সর্ব্ব-প্রকার জনহিতকর কার্য্যের জন্য এই সভার প্রতিষ্ঠা হয়। ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের ২১শে ফেব্রুয়ারী রবিবার, ত্রিপুরা-হিত-সাধিনী সভার ঢাকা শাখার বার্ষিক অধিবেশনের সভাপতিরূপে অবিনাশচন্দ্রের ভাষণে উক্ত সভার প্রতি তাঁহার কিরূপ অনুরাগ ছিল তাহার যেমন পরিচয় পাই, তেমনি ত্রিপুরা-হিত-সাধিনী সভার সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ইতিহাস ও সেকালের শিক্ষা, সমাজ ও দেশ-হিতৈষণার পরিচয় পাই। আমরা তাঁহার লিখিত সেই অভিভাষণ হইতে সেই সব প্রয়োজনীয় বিষয়ের অংশ বিশেষ উদ্ধৃত করিলাম। এই অভিভাষণে অবিনাশচন্দ্র, যে ভাবে সব বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার ভিতর হইতে সুস্পষ্ট অনুভূত হয়, তাঁহার দেশপ্রীতি কেন্দ্রীভূত ছিল কোথায়? তিনি মনে করিতেন নিজ পল্লী ও ত্রিপুরা জেলার উন্নতি কল্পে সাধ্যানুযায়ী যদি কিছু করিতে পারেন, তাহা হইলেই দেশের প্রকৃত হিত হইবে। এই জন্য আমরা দেখিতে পাই

ত্রিপুরা হিতসাধিনী সভা ও পল্লীর উন্নতি

তিনি বাসপল্লী চুণ্টার উন্নতি কল্পে এবং ত্রিপুরা জেলার যে কোন কল্যাণকল্পে তাঁহার হৃদয় ছিল মুক্ত, সর্ব্বদা ত্রিপুরার যে কোন সৎ কাজে তিনি সাহায্য করিতেন। তাহা তাঁহার ঢাকা ত্রিপুরা-হিত-সাধিনী সভার শাখার সভাপতির অভিভাষণ হইতে জানা যায়।

ত্রিপুরা হিত-সাধিনী-সভার ঢাকা শাখার অধিবেশন ১৯৩৭ ২১শে ফেব্রুয়ারী রবিবার অবিনাশ-চন্দ্রের অভিভাষণ

অবিনাশচন্দ্র বলেন: ত্রিপুরা-হিতসাধিনী-ঢাকা-শাখার অষ্টকার বার্ষিক অধিবেশনে উপস্থিত হইয়া আমি অতিশয় আনন্দ অনুভব করিতেছি। এই উৎসব সম্মিলনে আমাকে সভাপতিত্ব করিবার আহ্বান আমার প্রতি আপনাদের প্রীতির পরিচায়ক, তজ্জন্য আমি আপনাদের নিকট প্রকৃতই কৃতজ্ঞ।

আমি ত্রিপুরা হিতসাধিনী-সভার সহিত আজ প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী যাবৎ বিশেষ ভাবে সংশ্লিষ্ট। ৪০ বৎসর পূর্ব্বে এই প্রতিষ্ঠানের সম্পাদক ছিলাম এবং তৎপর সভার কার্য্যকরী সমিতির সহিত সংযুক্ত থাকিয়া কিছুকাল সহকারী সভাপতিরূপে এবং পরে সভাপতিরূপে ইহার মঙ্গলসাধনে যথাসাধ্য সাহায্য করিতে সচেষ্ট আছি। যদিও বিগত ১৫ বৎসর যাবৎ এই সভার সভাপতির গৌরবময় আসনে প্রতিষ্ঠিত আছি তথাপি আপনাদের শাখার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া আপনাদের উৎসাহ ও কর্ম্মকুশলতার চাক্ষুষ নিদর্শনলাভ এই আমার প্রথম। আমার কর্ম্মবহুল জীবনে হিতসাধিনীর মঙ্গল সাধনে কথঞ্চিৎ সুযোগ পাইলেও কৃতার্থ মনে করি। আমি আশা করি প্রত্যেক ত্রিপুরাবাসীর শ্লাঘার মূর্ত্তিস্বরূপ আমাদের গৌরবমণ্ডিত এই হিত-সাধিনী-সভা আমাদের জিলাবাসী প্রত্যেকের সহযোগিতা ও শুভা-কাঙ্খার ফলে ত্রিপুরার সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি সাধনে অধিকতর জয়যুক্ত হইবে।

এই সভার ইতিহাস আপনাদের কাহারও অবিদিত নহে। ত্রিপুরার মহিলা-সমাজে, বিশেষতঃ অন্তঃপুরবাসিনীদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের মূল মন্ত্র নিয়াই ত্রিপুরা হিতসাধিনী সভা ৬৪ বৎসর পূর্ব্বে ত্রিপুরার কতিপয় উচ্চশিক্ষিত দূরদর্শী উৎসাহী যুবকের প্রচেষ্টায় স্থাপিত হয়। তৎসময়ে বাঙ্গলা দেশে সর্ব্বত্র স্ত্রীশিক্ষা অনাদৃত ও পশ্চাৎপদ ছিল। বালিকাদিগের জন্য বিদ্যালয় দুই একটী বড় বড় সহরে ব্যতীত কোথাও ছিল না। যাহাতে বালিকা ও যুবতীগণ অন্তঃপুরে থাকিয়াও জ্ঞানালোক পাইয়া সমাজের উন্নতি সাধনে সহযোগিতা করিতে পারে তাহাই ছিল তখনকার উদ্দেশ্য। সে সময় সবেমাত্র পাশ্চাত্যের সংস্পর্শে আসিয়া তাঁহারা উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে প্রাচীন কালের ন্যায় আবার নূতন আদর্শে শিক্ষিতা জননী ও ভগিনীর সহযোগিতা বিনা সমাজের বহু শতাব্দীর সঞ্চিত কুসংস্কার দূর করা ও জাতীয় সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি সাধন অসম্ভব। তখন অন্তঃপুর-বাসিনীদিগকে শিক্ষানুরাগিণী করা, অন্তঃপুরেই তাঁহাদিগের পরীক্ষা গ্রহণ করা ও সাধারণ সভায় উত্তীর্ণ পরিক্ষার্থীগণকে পুরস্কার বিতরণ করা সভার প্রধান কার্য্য ছিল।

সভার ইতিহাস ও উদ্দেশ্য

সভার প্রতিষ্ঠাতৃগণ বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে ভারতবর্ষ স্বাধীন থাকা কালীন ভারতের নারী, শিক্ষা, স্বাধীনতা ও চরিত্র গৌরবে যেরূপ উচ্চাসন অধিকার করিয়াছিলেন পুনরায় তাঁহাদিগকে সেই স্তরে উন্নীত করিতে না পারিলে জাতীয় উন্নতি সুদূরপরাহত। ক্রমশঃ কতক পরিমাণে যুগোপযোগী স্ত্রীশিক্ষা বিস্তার ও মেয়েদের শিক্ষার্থ সর্ব্বত্র বিদ্যালয় স্থাপিত হইলে সভার মূল উদ্দেশ্যের প্রয়োজনীয়তা হ্রাস হইতে থাকে। সভাও সাধ্যানুসারে ত্রিপুরার সর্ব্বপ্রকার অভাব দূরীকরণ ও সর্ব্বপ্রকার উন্নতি সাধনে মনোনিবেশ করেন। আমরা এখন অন্তঃপুরে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের প্রচেষ্টা ব্যতীত নানাপ্রকারে

জেলাবাসীকে সেবা ও সাহায্য করিতে প্রয়াসী। আপনারা বাৎসরিক বিবরণী হইতে জ্ঞাত আছেন যে সভা দীর্ঘকাল যাবৎ প্রবাসী ত্রিপুরাবাসী সকলের মধ্যে যোগসূত্র ও সদ্ভাব সংস্থাপন, দরিদ্র ছাত্র ছাত্রী ও শিক্ষয়িত্রীদের সাহায্য এবং সুদূর পল্লী হইতে চিকিৎসার্থ আগত রোগীদিগকে অর্থ প্রদান, সেবা ও সহানুভূতিতে ও অন্য প্রকারে বৎসরের পর বৎসর যথাসাধ্য সাহায্য করিয়া আসিয়াছেন। দুর্ভিক্ষে ও জলপ্লাবনে বিধ্বস্ত জেলাবাসীর সাহায্যার্থ বিশেষ চাঁদা আদায় করিয়া বহু সহস্র টাকা নগদ ও সহস্রাধিক বস্ত্র বিতরণ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছেন। বিগত অর্দ্ধোদয় যোগে হিতসাধিনী সভার শত শত স্বেচ্ছাসেবক ত্রিপুরা ও বঙ্গের বিভিন্ন জিলা হইতে কলিকাতায় আগত লক্ষাধিক তীর্থযাত্রী ও গঙ্গাস্নান আকাঙ্ক্ষী সরলপ্রকৃতি গ্রামিকগণকে আশ্রয় দিয়া, তাহাদের গতিবিধি পরিচালনা করিয়া ও নানাবিধ বিপদ আপদ হইতে রক্ষা করিয়া এই প্রতিষ্ঠানের গৌরব বর্দ্ধন করিয়াছিল। এসম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ জানিতে ইচ্ছুক হইলে সভার মঙ্গলকামী ও সুযোগ্য কার্য্যাধ্যক্ষ আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু শ্রীযুক্ত জগৎচন্দ্র পাল, যিনি আমার সহিত আপনাদের সম্মুখে আজ উপস্থিত, আপনাদিগকে সর্ব্ববিধ বিবরণ দিতে সক্ষম।

নারী শিক্ষা ও স্বাধীনতা

জনসেবা

১২৭৮ বঙ্গাব্দে যখন হিতসাধিনী-সভা স্থাপিত হয়, তখন ত্রিপুরা হইতে রেলে কলিকাতায় আসার সুযোগ-সুবিধা না থাকায় আমাদের জিলার অধিকাংশ বিদ্যার্থীই ঢাকা নগরীতে অধ্যয়ন করিতেন। সভার প্রতিষ্ঠাতৃগণও তথায় ছিলেন এবং ঢাকাতেই আমাদের এই সভার প্রথম ভিত্তি স্থাপন হয়। ইহা আপনাদের শ্লাঘার বিষয়।

ঢাকা শাখা

স্বর্গত অবিনাশচন্দ্র সেন ও শ্রীযুক্তা গিরিবালা দেবী

কিয়ৎকাল পরেই সভা কলিকাতায় স্থানান্তরিত হয় এবং আজ পর্য্যন্ত এই সভা সাধ্যানুসারে ত্রিপুরার বিবিধ অভাব দূরীকরণে এবং ত্রিপুরাবাসীর মধ্যে সৌহার্দ্দ্য স্থাপনে যত্নবান আছেন। ত্রিপুরার শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রায় সকলই কোন না কোন সময়ে সভার সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন এবং এখনও আছেন। যে সকল মহাপ্রাণ কর্ম্মীগণের উৎসাহে ও কর্ম্মকুশলতায় সভার শ্রী উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইয়াছে তাহাদের নাম এখানে উল্লেখ করা সাধ্যায়ত্ত নহে। আমাদের সভার বিশেষত্ব এই যে, হিন্দু, মুসলমান সমভাবে ইহাকে অভিনন্দিত করিয়া আসিতেছে। বাস্তবিক পক্ষে ত্রিপুরার গৌরব স্বর্গীয় নবাব সিরাজুল ইসলাম ও নবাব সার সামশুল হুদা এবং মহানুভব আব্দুল রসুল সভাপতি বা প্রতিনিধি সভাপতি রূপে জেলাবাসীর শ্রদ্ধার অর্ঘ্য ক্রমে ২৫।৩০ বৎসর পাইয়াছেন। তাঁহাদের সমসাময়িক ৺গোবিন্দচন্দ্র দাস মহাশয়ও আজীবন সভার কর্ণধাররূপে তাঁহাদিগের সহিত সহযোগিতা করিতেন। তিনিও দীর্ঘকাল সভার প্রতিনিধি সভাপতি ছিলেন।

হিন্দু মুসলমানে প্রীতি

আজ ১৩।১৪ বৎসর হইল ঢাকার শাখা স্থাপিত হইয়াছে, তদবধি অতিশয় দ্রুতগতিতে সভার কার্য্য ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জে চলিয়া আসিতেছে। ত্রিপুরা হিতসাধিনী সভাতে প্রতি বৎসর ২৫।৩০ জন আজীবন সভ্য যোগদান করেন এবং প্রায় ৮০০ সাধারণ সভ্য চাঁদা দিয়া থাকেন। ঢাকা-শাখার বিশেষ কৃতিত্ব এই যে আপনাদের যত্নে ও ৩৪ জন আজীবন সভ্য ও শতাধিক সাধারণ সভ্য প্রতি বৎসর এখানেও যোগদান করেন। আপনাদের সংগৃহীত চাঁদা হইতে কিয়দংশ মূল সভাকে প্রদান করিয়া অর্থ সাহায্যও করিয়া আসিতেছেন। এই শাখা যাঁহাদের প্রচেষ্টায় স্থাপিত, যাঁহাদের

যত্নে উহা সাফল্য লাভ করিয়াছে, তাঁহাদিগের নিকট মূল সভা
ঋ।

এই শাখা স্থাপনে যাঁহারা অগ্রগণ্য ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে সকলের শ্রদ্ধাভাজন গুরুবন্ধু ভট্টাচার্য্য মহাশয় আর ইহজগতে নাই। তাঁহার ন্যায় শুভানুধ্যায়ী ও কার্য্যকুশল অগ্রণীর স্থান সহজে পূরণীয় নহে। তিনি শিক্ষাবিভাগের উচ্চাসনে উপবিষ্ট থাকিয়া ও সাহিত্য-সভাদ্বারা আমাদের জেলার গৌরব বর্দ্ধন করিয়াছেন। রাজকীয় কার্য্যে হিতসাধিনীর চিরসুহৃদ্ ও আপনাদের শাখার প্রবর্ত্তক শ্রীযুক্ত যোগেশ-চন্দ্র চৌধুরী ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট মহাশয়ও স্থানান্তরে গিয়াছেন। তবুও

পল্লী ও দেশবাসীর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন

ডাঃ বিধুভূষণ পাল, অধ্যাপক ডাক্তার শচীন্দ্রমোহন চন্দ, শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার দত্ত, মৌলবী মমতাজ-উদ্দিন আহম্মদ সাহেব, ডাঃ শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রচন্দ্র চন্দ্র মহাশয়গণের উৎসাহ ও সহায়তা হইতে আপনাদের সভা বঞ্চিত নহে। আপনাদের উৎসাহী কর্ণধার শ্রীযুক্ত জগদ্বন্ধু বক্সীর কর্ম্মকুশলতা আমা হইতে আপনারাই বেশী পরিজ্ঞাত আছেন। এতদ্ব্যতীত আপনাদের যে-সকল যুবক কর্ম্মীগণ সর্ব্বপ্রকারে শাখার সাফল্যে সাহায্য করিয়া আসিতেছেন, তাঁহাদের সকলের সহিত আমি পরিচিত নহি বলিয়া তাঁহাদের নাম উল্লেখ করিতে পারিলাম না। আমি হিতসাধিনী-সভার পক্ষ হইতে আপনাদের সাহচর্য্যের জন্য প্রত্যেককে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ দিতেছি।

ত্রিপুরার বহুসহস্র লোক রাজকার্য্যে, ব্যবসায়ে ও অন্য কার্য্যব্যপদেশে কলিকাতা প্রবাসী। এতদ্ব্যতীত বহুসহস্র লোক আমাদের জিলা হইতে নানাকার্য্যে প্রতি বৎসর তথায় আগমন ও অবস্থান করে। সকলের মধ্যে সঙ্ঘগঠন ও প্রীতিপরিচয় করিবার স্থান একমাত্র হিত-সাধিনী সভা। সভার জন্য একটী গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে সভার

আফিস স্থায়ীভাবে স্থাপন করা ও যাহাতে দুঃস্থ ও আশ্রয়হীন কিম্বা নবাগত যে কোন ত্রিপুরাবাসী অন্ততঃ ২।৪ দিনের জন্যও আশ্রয় ও যথাসম্ভব সাহায্য পাইতে পারে তাহার প্রচেষ্টা আজ কয় বৎসর যাবৎ চলিয়াছে। তদুদ্দেশ্যে আমরা ৭০০০৲ টাকার বেশী সংগ্রহ করিয়া ব্যাঙ্কে গচ্ছিত রাখিতে সক্ষম হইয়াছি। আমি বিশ্বাস করি আমাদের সভার নিজ গৃহ হইলে ত্রিপুরাবাসীর মিলনের ও ভাববিনিময়ের সুবিধা এবং দূরদেশাগত স্বজেলাবাসীর আশ্রয়স্থানের ব্যবস্থা হইবে। বিল্ডিং ফণ্ডের উৎসাহী কর্ম্মীদিগের ও দাতাগণের একপ্রাণতায় এই সভার গৃহ অচিরে নির্ম্মিত হইয়া তাহার প্রাণকেন্দ্র সমগ্র জেলাতে লক্ষ ধারায় প্রাণশক্তিরূপে বিস্তার লাভ করিবে, এই আশা আমি পোষণ করি।

ত্রিপুরা হিতসাধিনী সভার নিজস্ব ভবন

ত্রিপুরার ইতিহাসে গবেষণাকারী ও পুরাতত্ত্ববিদ-গণ-দ্বারা সংগৃহীত ও প্রমাণিত অতীত গৌরবমণ্ডিত কাহিনী স্মরণে ত্রিপুরাবাসী মাত্রেরই হৃদয় গর্ব্বে স্ফীত হয়। দেড় সহস্র বৎসর পূর্ব্বে লুসাই, মণিপুর, আরাকান প্রভৃতি স্থান ত্রিপুরা রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। এখনও প্রায় ৫০০০ বর্গমাইলব্যাপী স্থান ত্রিপুরার অন্তর্ভুক্ত।
পার্ব্বত্য ও সমতল প্রদেশ স্বাধীন ত্রিপুরার অন্তর্গত এবং ইংরেজশাসিত ত্রিপুরার পরিমাণফল তদর্দ্ধ পরিমাণ। এখনও বিরাট ত্রিপুরা রাজ্য স্বাধীনতার ধ্বজা উড়াইয়া পুরাতন বিস্মৃত ইতিহাসের গৌরবময় জীবন-কাহিনী লইয়া স্বতন্ত্রভাবে আপন গরিমাময় মস্তক উত্তোলন করিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

ত্রিপুরার ইতিহাস

সমগ্র বাংলার গৌরব স্বাধীন ত্রিপুরা-রাজ ইতিহাস-বিশ্রুত চন্দ্রবংশ সম্ভূত। সেই মুকুট আজ আমাদের অমিততেজ যুবক পঞ্চশ্রীযুক্ত মহারাজা সার্ বীরবিক্রম কিশোর-মাণিক্য বাহাদুরের মস্তকে শোভিত। বহু-বৎসর যাবৎ ত্রিপুরাধিপতিগণের আর্থিক সাহায্য ও উৎসাহ বিনা

আমাদের সভা দৃঢ় পদবিক্ষেপে এতদূর অগ্রসর হইতে পারিত কিনা সন্দেহ। আমাদের বর্ত্তমান মহারাজা বীর বিক্রম-কিশোর বাহাদুরের প্রতিভা, তেজস্বিতা, উদারতা ও বদান্যতা ত্রিপুরাবাসীকে গৌরবান্বিত করিয়াছে। সভার গৃহ নির্ম্মাণের সংকল্পে তাঁহার সহানুভূতি দর্শনে তাঁহার নিকট হইতে অর্থ সাহায্য বিশেষভাবে আশা করা যায়।

ত্রিপুরা রাজের বদান্যতা

ত্রিপুরার সর্ব্বত্র বৌদ্ধধর্ম্ম ও তাহার প্রভাব বিশেষভাবে বিদ্যমান ছিল। বহুস্থানে খোদিত লিপিযুক্ত সুবৃহৎ মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। নাটঘরের স্থাপিত মূর্ত্তি এখনও সম্পূর্ণ অভগ্ন অবস্থায় রহিয়াছে এবং তদ্দর্শনার্থ শতসহস্র তীর্থযাত্রিগণ তথায় গমন করেন। বড়কামতার সন্নিকটস্থ প্রাপ্ত ভগ্ননটরাজ মূর্ত্তি আপনাদের ঢাকা সহরে স্থানান্তরিত হইয়াছে। লিপি সহ পাদপীঠের অংশটী ঢাকা সাহিত্য পরিষদের যাদুঘরে বর্ত্তমান ও ঊর্দ্ধাংশ ঢাকা মিউজিয়মে উপহৃত হইয়াছে। দুঃখের বিষয় যে আমাদের অতীতকীর্ত্তি গরিমামণ্ডিত ত্রিপুরা জেলার ইতিহাস রচিত হয় নাই। এবিষয়ে হিতসাধিনী সভার চেষ্টা এখন পর্য্যন্তও সফল হয় নাই।

পল্লী-সমাজ আমাদের জাতীয় জীবনের লীলাভূমি, পল্লীসমাজের সর্ব্বপ্রকার উন্নতি না হইলে জাতীয় জীবনে প্রগতির সুদৃঢ় ভিত্তি আশা করা যায় না। জাতীয়, সামাজিক ও রাজনৈতিক সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির জন্য আমি মনে করি সর্ব্বোপরি আবশ্যক বালক-বালিকা নির্ব্বিশেষে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা। পাশ্চাত্য দেশেও ৬ হইতে ১৪ বৎসর পর্য্যন্ত সকল বালক-বালিকার শিক্ষা বাধ্যতামূলক না হওয়া পর্য্যন্ত জাতীয় উন্নতির স্রোত মন্থর ছিল। এই শিক্ষার মধ্য দিয়াই নিজ নিজ অভিরুচি ও অবস্থা অনুযায়ী অর্থকরী বিদ্যা শিক্ষার ভিত্তিও স্থাপিত হয়। জাতিকে কর্ম্মকুশল একপ্রাণ এবং একই চিন্তাধারায় অভিষিক্ত করিতে হইলে

সমাজ ও শিক্ষা

প্রত্যেক বালক-বালিকাকে কিছুকালের জন্য সাধারণ শিক্ষা দিয়া নিজ নিজ অবস্থা, ধীশক্তি ও অভিরুচি অনুসারে উন্নত কর্ম্মকরী শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক। চাষবাস, শিল্প-বাণিজ্য, স্বাস্থ্যবিধান প্রভৃতি বিষয়গুলিও কতক পরিমাণে লেখা পড়া না জানিলে সম্যক প্রকারে আয়ত্ত করা বা তৎসম্বন্ধে শিক্ষা গ্রহণ করা সম্ভবপর নহে। একমাত্র শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গেই দেশের কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের সর্ব্বপ্রকার উন্নতি নির্ভর করে। এক কথায় বলিতে গেলে শিক্ষাই জাতির সর্ব্ববিধ উন্নতির সোপান এবং স্ত্রীশিক্ষাই জাতীয় শিক্ষার স্বস্তিবাচন।

শিক্ষা ও জাতির উন্নতির মূল

স্ত্রী ও পুরুষ লইয়া সমাজ, উভয়েরই রীতিমত বিদ্যাশিক্ষা আবশ্যক। মেয়েদের শিক্ষাপ্রণালী ছেলেদের শিক্ষাপ্রণালী হইতে কোন কোন বিষয়ে ভিন্ন হওয়া বাঞ্ছনীয়। আমাদের মহিলাগণ সাধারণতঃ কতকগুলি স্বাভাবিক গুণে ভূষিত—তাঁহাদের ত্যাগস্বীকার, অশেষ সহিষ্ণুতা ও পতিব্রততা সর্ব্বজনবিদিত, কিন্তু তৎসঙ্গে তাঁহাদের আত্মনির্ভরশীল ও পাশ্চাত্য নারীর সাহস ও জনহিতৈষণার সমাবেশ আবশ্যক। আজ কাল সমগ্র জাতি স্ত্রী-শিক্ষার পক্ষপাতী, কেবল শিক্ষার বিধান নিয়াই মত ভেদ।

যুবকগণের শিক্ষা

যুবকগণের শিক্ষাপ্রণালীর পরিবর্ত্তন চিন্তাশীল শিক্ষিত মাত্রই বাঞ্ছনীয় মনে করেন। আমার মনে হয় আমাদের স্কুলে ও কলেজে শিক্ষার নামে যে জীবনী শক্তি ও সময় বৃথা ব্যয় হয় তাহা রোধ করা আবশ্যক। ৪।৫ বৎসর সাধারণ শিক্ষা দিয়া বালকবালিকাদিগকে তাহাদের প্রত্যেকের শিক্ষা প্রবণতা অনুসারে কর্ম্মকরী বা উচ্চশিক্ষার জন্য প্রস্তুত করা উচিত। সকলেরই একই প্রকার শিক্ষা লাভ বাঞ্ছনীয় নহে। ধীমান্ ও মেধাবী ছাত্র ব্যতীত ঘষিয়া মাজিয়া এবং অভিভাবকগণকে সর্ব্বস্বান্ত করিয়া বি. এ. পাশ করার সাফল্যে বিশেষ কোন মূল্য নাই। আমাদের যুবকগণ

তাঁহাদের স্ব স্ব স্বাতন্ত্র্য ভুলিয়া, নিজের প্রবণতা অনুসারে না চলিয়া প্রায় সকলেই একই পাঠ্য পড়িতেছেন—একই ভাবে চলিতেছেন। ইহাতে অনেকেরই জীবনীশক্তি ক্ষয় হইতেছে—প্রতিভা বিকাশের সুযোগ ঘটিতেছে না। সাধারণ শিক্ষার ব্যবস্থার ন্যায়, কৃষি বিদ্যা, শিল্প, বাণিজ্য ও অন্যান্য অর্থকরী শিক্ষার ব্যবস্থাও অত্যাবশ্যক। প্রতি মহকুমায়ই কৃষি ও শিল্প শিক্ষার জন্য যথোপযোগী বিদ্যালয় স্থাপিত না হইলে যুবকগণের বেকার সমস্যা সমাধান হইতে পারে না। সর্ব্বোপরি চাই স্বাবলম্বন-শক্তিকে জাগ্রত করা ও শারীরিক পরিশ্রমের কাজকে ঘৃণার চক্ষে না দেখিয়া শ্রমের মর্য্যাদা উপলব্ধি করা। সমাজের বিভিন্ন স্তরের উপযোগী নানা শ্রেণীর বিদ্যালয় স্থাপন করিতে না পারিলে যুগানুরূপ শিক্ষার স্রোত দেশে বহিতে পারে না। ইহাই প্রকৃত শিক্ষা যদ্বারা মানুষকে সমাজের যোগ্য ও জীবন-পথে তদীয় উপযোগী স্থান সংগ্রহ করিয়া নেওয়ার শক্তি প্রদান করে।

কার্য্যকরী শিক্ষা

শারীরিক উন্নতি ব্যতীত কোন জাতিই পৃথিবীতে বাঁচিতে পারে না। আমাদের দেশের যুবকগণকে বাঁচিতে হইলে এবং ভারতের গৌরব সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে চাই সুস্থ, সবল এবং উৎসাহী কর্ম্মক্ষম যুবকগণের আত্মশক্তিতে নির্ভর ও জীবন-পথে সর্ব্বপ্রকার বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া অগ্রসরের উদ্যম। নতুবা আমাদের জাতি ও গৌরব বিলুপ্ত হইবে। আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে দেশে শ্রেষ্ঠ সম্পদ সুস্থ ও শিক্ষিত যুবকগণ। শিক্ষাবিস্তার, সমাজ-সংস্কার এবং সময়োপযোগী ন্যায়-ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা ও আমাদের লুপ্তশক্তিকে পুনরুদ্দীপ্ত করিতে একমাত্র যুবকগণই সমর্থ। দেশের প্রয়োজন প্রভূততর অর্থ, নূতনতর বিদ্যা, বৃহত্তর জীবন—তজ্জন্য যুবকগণকে নূতন পথে—নূতন শক্তি ও সাধনার জন্য ছুটিতে হইবে।

শারীরিক উন্নতি

বৃহত্তর জীবন

কর্ম্মক্ষেত্রে যশস্বী অবিনাশচন্দ্র

পল্লীসংগঠনের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আজকাল দেশবাসীর দৃষ্টি পড়িয়াছে। প্রত্যেক পল্লীতে কৃষি ও শিল্পের উন্নতি সাধন করিয়া জনসাধারণের আয় বৃদ্ধি করিয়া পল্লীসংগঠনের ব্যয় পল্লী হইতেই সংগ্রহ করিতে না পারিলে স্থায়ীভাবে পল্লীবাসীর আর্থিক অবস্থার উন্নতি সুদূরপরাহত।

অবিনাশচন্দ্রের ত্রিপুরা-হিতসাধিনী সভার ঢাকার বার্ষিক অধিবেশনে পঠিত ভাষণের বিভিন্ন মূল অংশ উদ্ধৃত করিলাম। পাঠকগণ উহা পাঠ করিলেই বুঝিতে পারিবেন, প্রায় বারো বৎসর আগে তিনি যে সকল বিষয়ে চিন্তা করিতেন, সেই ভাবধারার সহিত বর্ত্তমান স্বাধীন ভারতের মনীষী নেতারাও তাহাই ভাবিতেছেন এবং নানাভাবে তাহা প্রচার করিতেছেন। যেমন—নারী-শিক্ষা ও স্বাধীনতা, নারীর কর্ত্তব্য, জনসেবা, হিন্দু মুসলমানের সম্প্রীতি, ত্রিপুরার ইতিহাস, সমাজ ও শিক্ষা, —শিক্ষাই জাতির উন্নতির মূল, এই বিষয়টি তিনি যেমন অতি সুন্দরভাবে প্রকাশ করিয়াছেন, তেমনি যুবকগণের শিক্ষার বিষয়ে তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ অভিজ্ঞতা হইতে সমুদয় বিষয় অল্প কথায় আমাদের কাছে উপস্থিত করিয়াছেন। কার্য্যকরী বা বুনিয়াদী শিক্ষা যে আমাদের কত বড় প্রয়োজনীয় তাহা তিনি ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভের পূর্ব্বেই অন্যান্য মনস্বীদের ন্যায় অনুধাবন করিয়া স্বাবলম্বন শক্তির প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আমাদের কাছে বলিয়াছেন—তাঁহার লিখিতঃ—"সমাজের বিভিন্ন স্তরের উপযোগী নানা শ্রেণীর বিদ্যালয় স্থাপন করিতে না পারিলে যুগানুরূপ শিক্ষার স্রোত দেশে বহিতে পারে না। ইহা প্রকৃত শিক্ষা যদ্দ্বারা মানুষকে সমাজের যোগ্য ও জীবন-পথে

তদীয় উপযোগী স্থান সংগ্রহ করিয়া নেওয়ার শক্তি প্রদান করে। এ-বিষয়ে মতদ্বৈধতা থাকিতে পারেনা।

"শারীরিক উন্নতি ব্যতীত কোন জাতিই পৃথিবীকে বাঁচিতে পারেনা। আমাদের দেশের যুবকগণকে বাঁচিতে হইলে এবং ভারতের গৌরব সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে চাই সুস্থ, সবল এবং উৎসাহী কর্ম্মক্ষম যুবকগণের আত্মশক্তিতে নির্ভর ও জীবনপথে সর্ব্বপ্রকার বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া অগ্রসরের উদ্যম। নতুবা আমাদের জাতিও গৌরব বিলুপ্ত হইবে। আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে দেশের শ্রেষ্ঠ সম্পদ সুস্থ ও শিক্ষিত যুবকগণ!"—এ-বিষয়ে কাহারও কোন বিরুদ্ধ মত নাই। আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রগ্রন্থে স্বাস্থ্য সুখের ন্যায় যে আর কোন সুখ নাই, সম্পদ নাই, তাহা বারবার বর্ণিত হইয়াছে। বর্ত্তমান যুগেও প্রত্যেক সুসভ্য দেশে-স্বাস্থ্যও ব্যায়াম সম্পর্কে শিশু বালক ও যুবকদের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে নানারূপ গবেষণা ও আলোচনা হইতেছে। আমাদের দেশেও সেইরূপ আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে, তাহা একদিন সার্থক হইবে বলিয়া মনে করি।

অবিনাশচন্দ্র তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত প্রায় সাতাইশ বৎসর কাল ত্রিপুরা হিতসাধিনী সভার সভাপতিরূপে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। সেই সময়ে ত্রিপুরা জেলার সর্ব্ববিধ অনুষ্ঠানের সহিত তাঁহার অখণ্ড যোগ ছিল। চিন্তাশীল জননায়ক বাগ্মীপ্রবর

ত্রিপুরা হিতসাধিনী সভার সভাপতি

স্বর্গীয় বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় ত্রিপুরা হিতসাধিনী সভার এক বার্ষিক উৎসব-বাসরে বলিয়াছিলেন—"যে দেশে সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সভাসমিতির উৎপত্তি এবং সূর্য্যাস্তের সঙ্গে তাহাদের বিলুপ্তি হয়,

সেদেশে এরূপ জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের এরূপ সুদীর্ঘকাল অব্যাহত স্থিতি ও সংরক্ষণ সবিশেষ গৌরবের বিষয় ইহা বলিতে হইবে।" এইরূপ স্থলে ত্রিপুরা হিতসাধিনী সভা ১২৭৮ বঙ্গাব্দে ইংরাজী ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত হইয়া দীর্ঘ সাতাত্তর বৎসর কাল চলিতেছে, ইহা কোন প্রতিষ্ঠানের পক্ষে কম গৌরবের বিষয় নহে—ত্রিপুরার গৌরব এই প্রাচীনতম জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের উদ্যোক্তা, প্রবর্ত্তক, সহায়ক, হিতৈষী ও অনুগ্রাহকবৃন্দের প্রত্যেকের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাপ্রকাশ করিতে হয়। কলিকাতা মহানগরীতে বিক্রমপুর সম্মিলনী, যশোহর ইউনিয়ান, বরিশাল-সেবা সমিতি, ফরিদপুর সুহৃদ্ সভা, ময়মনসিংহ সম্মিলনী প্রভৃতি যে সকল প্রতিষ্ঠান আছে, তাহাদের মধ্যে কোন

শ্রীহট্ট সম্মিলনী

তিষ্ঠানই নিজেদের জন্য একটি স্বতন্ত্র বাটী নির্ম্মাণের জন্য উদ্যোগী হন নাই, যদিও ঐ সব অঞ্চলের বহু ধনী সন্তান আছেন, যাঁহারা এক একজনেই ইচ্ছা করিলে কলিকাতা সহরে নিজ নিজ জেলার সমিতিও সম্মিলনীর জন্য বাড়ী নির্ম্মাণ করিয়া দিতে পারেন—কিন্তু সেরূপ মনোভাব কাহারও মধ্যে দেখা যায় নাই। এ-বিষয়ে ত্রিপুরা হিতসাধিনী সভার সভাপতি রূপে, সভার একটি নিজস্ব বাটী

অবিনাশচন্দ্র

নির্ম্মাণ করিবার জন্য অর্থ সংগ্রহ করিয়াছিলেন এবং যাহাতে সত্বর বাটী নির্ম্মিত হয়, সেজন্য তিনি চেষ্টা যত্নের কোনও ত্রুটি করেন নাই। তাহা ত্রিপুরা হিতসাধিনী সভার কার্য্য বিবরণীতে সুস্পষ্টভাবে লিখিত আছে এবং আমরা তাহার কিয়দংশ প্রকাশও করিয়াছি। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও বিবিধ রাষ্ট্রীয় গোলযোগের জন্য তাহা

সম্পন্ন করিতে পারেন নাই—আশা করা যায় অদূর ভবিষ্যতে ত্রিপুরার হিতকামী ত্রিপুরা হিতসাধিনীর পরিচালকগণ অর্থ সংগ্রহ করিয়া তাহা সুসম্পন্ন করিয়া—তাঁহাদের কীর্ত্তি অক্ষয় করিবেন এবং অবিনাশচন্দ্রের স্মৃতিগৌরব বর্দ্ধন করিবেন। অবিনাশচন্দ্রের সভাপতিত্বে কয়েক বৎসর পরে সভাভবনের জন্য ভূখণ্ড ক্রীত এবং ভিত্তিও স্থাপিত হইয়াছিল। সে-কথা পরে বলিয়াছি।

ত্রিপুরা সেবাসমিতি

ত্রিপুরা সেবাসমিতির ও অবিনাশচন্দ্র একজন প্রধানতম পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। ত্রিপুরা হিতসাধিনী সভার বার্ষিক বিবরণীগুলি দেখিবার সুযোগ আমাদের হইয়াছে, তাহা হইতে আমরা জানিতে পারি কিরূপ নিষ্ঠার সহিত ত্রিপুরা হিতসাধিনী সভা পরিচালিত হইয়া আসিয়াছে ও হইতেছে। আমরা সভার প্রতিনিধিগণ এবং সম্পাদকগণ কর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া বহুবার ইঁহাদের বার্ষিক সভার উপস্থিত হইয়াছি এবং দেখিতে পাইয়াছি দেশের প্রত্যেকটি বিষয় জানিবার জন্য সভাপতি অবিনাশচন্দ্র কিরূপ আগ্রহের সহিত প্রত্যেকটি বিষয় শুনিতেন এবং সাহায্য করিতে অগ্রসর হইতেন, কতদিন তাঁহার বাড়ীতে

দেশানুরাগ

শ্রীযুক্ত জগৎচন্দ্র পাল, ডক্টর অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, ইউনাইটেড্ প্রেসের শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ সেনগুপ্ত প্রভৃতি ত্রিপুরার শিক্ষিত সম্প্রদায়কে অবিনাশচন্দ্রের সহিত দেশের বিবিধ কল্যাণ কল্পে আলোচনা করিতে দেখিয়াছি, দেশের প্রতি তাঁহার ছিল একটা অকৃত্রিম দরদ,—পণ্ডিত শ্রীশচন্দ্র রায় বেদান্তভূষণ, শ্রীযুক্ত জগদ্বন্ধু ভট্টাচার্য্য, ক্যাপ্টেন নরেন্দ্রনাথ

দত্ত এম. বি. প্রভৃতির ত্রিপুরার বহু মনীষী ও দেশহিতৈষী ব্যক্তির সহযোগিতায় সর্ব্বদা তিনি নানা বিষয়ের যেমন পরিকল্পনা করিতেন, তেমনি সেই পরিকল্পনাকে সার্থক করিয়া তুলিবার জন্য, বন্ধুজনের সহিত সে কার্য্যে ব্রতী হইতেন। বাঙ্গলাদেশের যে সকল সম্মিলনী বা সমিতি বিদ্যমান আছে, তাহার কোনটিই এইরূপ সুনিয়ন্ত্রিতভাবে পরিচালিত হয় নাই এবং তাহাদের প্রতি বৎসরের মুদ্রিত কার্য্য বিবরণীর সন্ধানও পাওয়া যাইতেছে না। কিন্তু ত্রিপুরা হিতসাধিনী সভার ন্যায় প্রাচীনতম প্রতিষ্ঠানের কার্য্য বিবরণী ইত্যাদি মুদ্রিত ও প্রচারিত হওয়ায় বাঙ্গলায় একটি প্রধান জেলার, শিক্ষাও সংস্কৃতির পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। ইহা হইতে একটি জেলার সুসম্বদ্ধ সামাজিক ইতিহাস জানিবার যথেষ্ট সুযোগ হইয়াছে।

মহিলা কর্ম্মী

ত্রিপুরা হিতসাধিনী সভার শিক্ষা-সংস্কৃতি, সেবা বিভাগ, বন্যা রিলিফ কমিটি, ভূমিকম্প রিলিফ কমিটি, বিল্ডিং ফণ্ড প্রত্যেকটি বিষয়ের কর্ম্মপ্রণালী প্রকাশিত হওয়ায় দেখা যায় ত্রিপুরা জেলাবাসী মহিলা ও পুরুষ কর্ম্মীবৃন্দ কিরূপ উৎসাহের সহিত দেশের সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন এখানে আর একটি বিষয় অনুধাবন যোগ্য—সভাপতি অবিনাশচন্দ্র সেন, অশ্বিনীকুমার চক্রবর্ত্তী, বিধুভূষণ সেনগুপ্ত, মৌলবী সৈয়দ মহম্মদ মসী, করুণাকিশোর কর, কেপ্টেন পি. আর. গুপ্ত, ইন্দুভূষণ দত্ত প্রভৃতি বহু খ্যাতনামা ব্যক্তিগণ সভার আজীবন সভ্যরূপে দেশের সেবা করিয়া আসিতেছেন, তেমনি আজীবন মহিলা সভ্যদের মধ্যে—শ্রীযুক্তা গিরিবালা সেন, শ্রীমতী প্রতিভা দেবী বি. এ.

শ্রীযুক্তা প্রিয়তমা গুপ্ত, শ্রীযুক্তা উষারুণা সেন, শ্রীযুক্তা মৃন্ময়ী দত্ত, স্বর্গীয়া প্রিয়দা দত্ত, শ্রীযুক্তা কিরণবালাদেবী, শ্রীযুক্তা প্রতিভা সেন বি. এ. শ্রীযুক্তা লাবণ্যলতাদেবী, শ্রীযুক্তা সাবিত্রীদেবী বি. এ. শ্রীযুক্তা চামেলী মজুমদার, শ্রীযুক্তা সুহাসিনী গুপ্তা, শ্রীযুক্তা প্রভাবতী সেনগুপ্তা প্রভৃতি মহিলাগণের নাম বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। দেশের সেবায় তাঁহাদের সেবা ও দান অতুলনীয় বলিতে হইবে।

ত্রিপুরা হিতসাধিনী সভা ভবনের ভিত্তি স্থাপনোপলক্ষে সভাপতি অবিনাশ চন্দ্রের অভিভাষণ (৪ঠা চৈত্র, ১৩৪৬)

পূর্ব্বে ত্রিপুরা হিতসাধিনী সভা-ভবন নির্ম্মিত হইবার যে পরিকল্পনা চলিতেছিল ক্রমে ক্রমে তাহা সফলতার পথে আসিয়াছিল। ১৯৪০ খৃষ্টাব্দের ১৭ই মার্চ্চ, ১৯৪০ এবং বঙ্গাব্দ ৪ঠা ১৩৪৬ চৈত্র তারিখে—ত্রিপুরা হিতসাধিনী সভা ভবনের ভিত্তি স্থাপনের ব্যবস্থা হয় এবং তদুপলক্ষে ত্রিপুরাধিপতি মহারাজা স্যার বীরবিক্রম কিশোর মাণিক্য, কে, সি, এস, আই বাহাদুরকে আমন্ত্রিত করিয়া ভিত্তি স্থাপনোপলক্ষ্যে যে সভা আহুত হইয়াছিল, তাহাতে অবিনাশচন্দ্র ত্রিপুরা হিতসাধিনী সভার সভাপতিরূপে মহারাজার প্রতি যে সম্ভাষণ দেন, তাহা এখানে উদ্ধৃত করিলাম।

তিনি মহারাজার উপস্থিতিতে—শ্রীশ্রীযুত ত্রিপুরেশ্বর মহারাজা মাণিক্য বাহাদুর ও সমবেত ভদ্রমহোদয়গণ ও মহিলাবৃন্দকে সম্বোধন করিয়া বলেন—

আজ এই শুভদিনে ত্রিপুরা হিতসাধিনী সভার পক্ষ হইতে আমি আপনাদিগকে সাদর অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি।

সভা দীর্ঘ ৬৮ বৎসরকাল ব্যাপিয়া সাধ্যানুসারে ত্রিপুরার কল্যাণকার্য্যে নিযুক্ত রহিয়াছে। আজ ইহার জীবনে একটী স্মরণীয় মুহূর্ত্ত উপস্থিত। সভার একটী নিজস্ব ভবন স্থাপনের পরিকল্পনা অদ্য কার্য্যে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা সূচিত হইয়াছে। আমরা এই চিরাকাঙ্ক্ষিত ভবনের ভিত্তিস্থাপনের উদ্দেশ্যে এখানে সমবেত হইয়াছি। ইহা আমাদের পরম গর্ব্বের ও মহান্ আনন্দের বিষয়।

আমাদের এই আনন্দ শতগুণে বর্দ্ধিত করিয়াছে শ্রীশ্রীযুক্ত ত্রিপুরাধিপতির সানুগ্রহ উপস্থিতি। আজ ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নগরীতে ত্রিপুরাবাসী তাহার নিজস্ব ভূমিখণ্ডে ত্রিপুরেশকে বরণ করিবার সৌভাগ্যলাভ করিয়া ধন্য হইয়াছে। সুপ্রাচীন ত্রিপুর রাজবংশ পৌরাণিক যুগের প্রারম্ভ হইতে তাহার স্বাধীন সত্তা সংরক্ষণ করিয়া ভারত গগনে উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কস্বরূপ বিরাজমান, সুমহৎ কীর্ত্তির গৌরবে উদ্ভাসিত, জ্ঞানবিজ্ঞান ও শিল্পসাহিত্যকলার বিমলপ্রতিভা বিকীরণ করিয়া, শৌর্য্য-বীর্য্য, ধনৈশ্বর্য্য, জ্ঞানগাম্ভীর্য্য, দানধ্যান, প্রজানুরঞ্জন ও লোক-পরিপালনে দেশবিদেশকে মোহিত করিয়া প্রতিষ্ঠার উচ্চতম শৃঙ্গে অবস্থিত। এই ইতিহাসখ্যাত প্রথিতনামা চন্দ্রবংশের সুযোগ্য সন্তান যাঁহার জীবনে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের গুণরাশির অভূতপূর্ব্ব সম্মিলনে রাজ্যে এক নব আশা ও নবীন প্রেরণা সঞ্চারিত হইয়াছে—তাঁহাকে পূজা করিবার যোগ্য উপচার ক্ষুদ্র ত্রিপুরা হিতসাধিনী সভার নাই। কিন্তু মহারাজ স্বকীয় ঔদার্য্যগুণে এবং অপরিসীম স্নেহে সভাকে আপনা হইতেই

ত্রিপুরা রাজবংশের পূর্ব্বকীর্ত্তি

আশ্বাস ও অভয় দিয়াছেন—তাই সভা তাঁহার অতুল রাজৈশ্বর্য্য সত্ত্বেও একমাত্র আত্মজনরূপে পরমপ্রীতির সহিত তাঁহার সম্মুখে আন্তরিক ভক্তি-অর্ঘ্য প্রদান করিতে সাহসী হইয়াছে।

মহারাজ! আজ যে ত্রিপুরা হিতসাধিনী সভার আবাস গৃহের ভিত্তিস্থাপনের জন্য আপনার সম্মুখে নিবেদন জানাইতেছি ইহা আমাদের পক্ষে অতি স্বাভাবিক। আপনার ও আপনার উর্দ্ধতন স্বর্গগত পূর্ব্বপুরুষগণের কৃপাবর্ষণ দ্বারাই সভার পরিস্থিতি ও পরিপুষ্টি সম্ভব হইয়াছে। আপনার প্রপিতামহ কীর্ত্তিমান গুণীশ্রেষ্ঠ বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুরের সময়ে এই সভার প্রথম আরম্ভ এবং তিনিই এই সভার উপরে প্রথম স্নেহধারানিষেক করিয়াছিলেন। আপনার পিতামহ মহাদানশীল রাধাকিশোর মাণিক্য বাহাদুর সেই ধারা অবিচ্ছিন্ন রাখিয়াছিলেন, আপনার পিতৃদেব পরম-যশস্বী প্রজাবৎসল বীরেন্দ্রকিশোর মাণিক্য বাহাদুর তাহাকে পরিপুষ্ট করিয়াছিলেন এবং আপনি স্বয়ং তাহা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া যাইতেছেন। আমার একান্ত সৌভাগ্যবশতঃ আমি এই মহামনাঃ মহারাজাগণের দর্শনলাভ করিয়া ধন্য হইয়াছি। আমি যে সময় বালকমাত্র, যখন স্কুল-কলেজে অধ্যয়ন করিতাম, সেই সময়েই মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্যের দর্শনলাভ করিয়াছিলাম। তাঁহার সেই প্রশান্ত গম্ভীর মূর্ত্তি, আজও আমার হৃদয়পটে অঙ্কিত রহিয়াছে। মহারাজা রাধাকিশোর মাণিক্য ও মহারাজা বীরেন্দ্রকিশোর মাণিক্যের সহিত আমার একাধিকবার দর্শনলাভের সুযোগ হইয়াছিল এবং হিতসাধিনী সভা সম্পর্কেও আমি তাঁহাদিগকে অভিনন্দিত করিবার সৌভাগ্যলাভ করিয়াছিলাম।

সভাভবনের ভিত্তিস্থাপনের আনন্দ

আমরা সভাগৃহের জন্য ভূমিখণ্ড ক্রয়ের প্রস্তাব স্থির করিয়া আপনার দ্বারে উপস্থিত হইয়া আপনার নিকট হইতে প্রচুর দান লাভ করিয়াছি বলিয়াই আমাদের পক্ষে অদ্যকার এই উৎসবায়োজন সম্ভব হইয়াছে। সুতরাং আজ আপনার শরণ গ্রহণ না করিয়া কোথায় যাইব ?

ভদ্রমহোদয়গণ, আমাদের এই ত্রিপুরা হিতসাধনী সভা ৬৮ বৎসর পূর্ব্বে ত্রিপুরায় অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষা প্রচারের উদ্দেশ্য লইয়া প্রথম স্থাপিত হয়। ক্রমে কালের স্রোতে দেশের অবস্থা পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে সভার কার্য্যধারা বিভিন্নমুখী হইয়াছে এবং সভা সাধ্যানুসারে ত্রিপুরার সর্ব্ববিধ কল্যাণসাধনের ব্রত গ্রহণ করিয়াছে। সভা ত্রিপুরার গ্রামে বালিকাবিদ্যালয় সমূহে যথাসাধ্য সাহায্য প্রেরণ করে, ত্রিপুরার দরিদ্র ছাত্রদিগকে পুস্তক ক্রয়, পরীক্ষার ফি ইত্যাদি দ্বারা সহায়তা করে, দুঃস্থ ত্রিপুরাবাসীর জন্য অর্থ সাহায্যদানে অগ্রসর হয়, কলিকাতা সহরে কার্য্যব্যপদেশে আগত বিপন্ন ত্রিপুরাবাসীর উপকারের চেষ্টা করে, কর্ম্মানুসন্ধানের জন্য কলিকাতায় উপস্থিত ত্রিপুরাবাসীর কর্ম্ম সংস্থানের যথাসম্ভব সহায়তা করে, নানাবিধ কলকারখানা ইত্যাদি দর্শন করিয়া ত্রিপুরাবাসী যুবকবৃন্দ যাহাতে অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করে, দুর্ভিক্ষের জন্য বা বন্যা, ঝঞ্ঝা ও অগ্ন্যুৎপাত ইত্যাদি দৈবদুর্ব্বিপাকে যখন ত্রিপুরার স্থানে স্থানে দুঃখ কষ্টের অবধি থাকে না তখন এই সভা কলিকাতা সহরে নানা ভাবে অর্থ সংগ্রহ করিয়া সেই অর্থ দুর্গতদের সাহায্যের জন্য প্রেরণ করে। কলিকাতা সহরে বিশেষ বিশেষ যোগ উপলক্ষে সমাগত

সভার কার্য্য-পরিচয়

অসংখ্য যাত্রীর সুখসুবিধা বিধানের জন্য সভার স্বেচ্ছাসেবকগণ যথাসাধ্য সাহায্য করিতে প্রস্তুত থাকেন। এই সমস্ত কার্য্যই যে সভা সকল সময়ে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করিতে পারিয়াছে এইরূপ গর্ব্ব করা অসম্ভব কিন্তু সভা ইহার সংগৃহীত অর্থ এবং ইহার কর্ম্মশক্তি ও শুভেচ্ছা সর্ব্বদা ত্রিপুরার কল্যাণে নিয়োজিত করিতে চেষ্টা করিয়াছে এবং সভার কৃত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কর্ম্ম-খণ্ডের সম্মিলিত কল্যাণ-সমষ্টি নিতান্ত উপেক্ষণীয় বিষয় নহে এই কথা বলিয়া আত্মপ্রসাদ অনুভব করা বোধ হয় সভার পক্ষে দোষের হইবে না।

ত্রিপুরার বৈশিষ্ট্য

সর্ব্বোপরি ত্রিপুরার বৈশিষ্ট্য এবং নিজস্ব কৃতিত্বের বিষয় গুলিকে কলিকাতা নগরীর বিশাল ক্ষেত্রে লোকলোচনের সমক্ষে প্রকাশিত করিয়া ত্রিপুরার প্রাচীন কীর্ত্তির ধারাবাহিকভাবে সঞ্জীবিত করিয়া রাখিবার প্রচেষ্টা কিছুকাল যাবৎ সভা একটী সুমহৎ কর্ত্তব্য স্বরূপে গ্রহণ করিয়াছে। এই সকল কার্য্যের সংসাধন ব্যাপারে সভার একটী নিজস্ব ভবনের প্রয়োজনীয়তা সভার কর্ম্মিগণের নিকট নিত্য গভীর ভাবে অনুভূত হইয়াছে। বিশ বৎসরের অধিককাল পূর্ব্বে সভা এই প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়া সামান্য অর্দ্ধশতমুদ্রা লইয়া একটী Building fund স্থাপন করিয়াছিল। তখন অনেকের নিকট কলিকাতায় সভার আবাস স্থানের পরিকল্পনা আকাশকুসুমবৎ প্রতীয়মান হইয়াছে। কিন্তু ভগবৎ কৃপায় সভার কর্ম্মীদিগের বহুবর্ষব্যাপী সাধনার ফলে এবং সভার নিয়ত শুভাকাঙ্ক্ষীদের সৌজন্যে ও সহকারিতায় সভার পক্ষে ১৮০০০৲ টাকা মূল্যের ভূমিখণ্ড ক্রয় করা সম্ভব হইয়াছে।

অবিনাশচন্দ্র সেন—নাতি-নাতিনীসহ

আজ আমাদের আশা হইতেছে যে অনতিকাল মধ্যে সমগ্র ত্রিপুরার গর্ব্বের স্থান, ত্রিপুরাবাসীর মিলনকেন্দ্র, ত্রিপুরাবাসীর অক্লান্ত সাধনার প্রত্যক্ষ ফল, ত্রিপুরার কীর্ত্তিধ্বজা এই ত্রিপুরা-হিতসাধিনী সভার ভবন কল্পনার রাজ্য অতিক্রম করিয়া বাস্তবাকার ধারণ করিয়া আমাদের উৎসাহের উৎসস্বরূপ কলিকাতা নগরীতে প্রতিষ্ঠিত হইবে।

ত্রিপুরা হিতসাধিনী সভার অতীতে গর্ব্ব করার কারণ ছিল। বর্ত্তমান সময়ে স্ত্রীশিক্ষার যে অবস্থা প্রত্যক্ষ করা হয় ৬৮ বৎসর পূর্ব্বে যখন এই সভার প্রতিষ্ঠা হয় তখন সেই অবস্থা ছিল না। যাঁহারা ঐ সময়ে শিক্ষার প্রচার দ্বারা তদানীন্তন মাতৃকুলের মানসিক উন্নতিবিধানের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়াছিলেন এবং কার্য্যতঃ ঐ বিষয়ে অগ্রসর হইবার জন্য এই সভার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন তাঁহাদের দূরদৃষ্টি নিতান্ত প্রশংসার যোগ্য। তখন তাঁহাদের এই ক্ষেত্রে কোনও সহযোগীর আবির্ভাব হয় নাই। ফলতঃ এই সভার ১৬।১৭ বৎসর বয়সে যখন প্রতীচ্যের মহীয়সী নারী মিস্ ম্যানিং ভারতের নারীকুলের প্রতি গভীর সহানুভূতিসম্পন্না হইয়া ভারতে আগমন করেন তখন কলিকাতায় তাঁহার অভ্যর্থনা সভায় প্রথম অভিনন্দন পাঠের গৌরবময় ভূমিকা এই সভার সম্পাদকের উপরেই অর্পিত হইয়াছিল—সমসাময়িক সমুদয় স্ত্রীশিক্ষা সহায়তাবিধায়িনী সমিতির মধ্যে ত্রিপুরা হিতসাধিনী সভা প্রথম বলিয়া। তারপর অর্দ্ধশতাব্দী অতিক্রান্ত হইয়াছে, কত সমিতি কালগর্ভে বিলীন হইয়াছে, কিন্তু ত্রিপুরা হিতসাধিনী সভা শুধু জীবিত থাকিয়াই সন্তুষ্ট নয় পরন্তু এই দেশে কোনও জিলা সমিতির যাহা হয়

নাই এই সভার তাহাই হইতে চলিয়াছে—সভার একটী নিজস্ব স্থান। স্বতঃই মনে প্রশ্ন উদিত হয় কিরূপে ইহা সম্ভব হইয়াছে। ইহার একটী কারণ সভার উদারভাব—কোনওরূপ মত বা সম্প্রদায়বিশেষের ক্ষুদ্র গণ্ডীতে ইহা নিজেকে আবদ্ধ করে নাই—ত্রিপুরার সকল মনস্বী সন্তানই হিন্দু-মুসলমান নির্ব্বিশেষে কোনও না কোনও সময়ে কোনও না কোনও ভাবে এই সভার কার্য্যে নিজেকে নিয়োজিত করিয়াছেন। দূরদেশগত সন্তান যেরূপ আগ্রহে তাহার মাতার প্রতিমূর্ত্তি নিজের নিকট সংরক্ষিত করে, কলিকাতাপ্রবাসী ত্রিপুরাবাসী তেমনই আগ্রহে এই সভাটীকে তাহার জন্মভূমি ত্রিপুরাজননীর প্রতিমূর্ত্তি স্বরূপে স্বাভাবিক প্রীতি ও মাধুর্য্যের সহিত রক্ষা করিয়া আসিয়াছে। এই সভার ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে ত্রিপুরার প্রত্যেক সন্তানের সম্মিলিত শুভেচ্ছা ও সহকারিতার উপর। আমি জীবন-সায়াহ্নে এই প্রার্থনাই সর্ব্বদা করিব যেন ত্রিপুরাবাসী প্রত্যেকে স্বার্থবিরহিত হইয়া বাঙ্গালার এই প্রাচীনতম প্রতিষ্ঠান-টীর কল্যাণের জন্য সদা জাগ্রত ও সচেতন থাকেন। আমাদের এই সভা সার্ব্বজনীন প্রতিষ্ঠান ও মহামিলনের স্থান। এখানে আমাদের জেলার উচ্চ, নীচ, জ্ঞানী, কর্ম্মী, সকলকেই কায়মনোবাক্যে আমি আহ্বান করিতেছি। আসুন, আপনাদের সকলের এই প্রতিষ্ঠানের মিলনমন্দির যাহাতে অনতিবিলম্বে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে তৎপ্রতি যত্নবান হই।

এক্ষণে আমি একান্ত বিনীতভাবে ত্রিপুরাধিপতি মহারাজ মাণিক্য বাহাদুরের নিকট প্রার্থনা করিতেছি তিনি তাঁহার কল্যাণময় হস্ত দ্বারা আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানটীর আবাস

ভবনের ভিত্তিস্থাপন করুন। আমরা প্রতিনিয়ত অনুভব করি তাঁহার নিকট আমরা কিরূপ ঋণী।

মহারাজাকে ভিত্তি-স্থাপনে আহ্বান

আমরা আকাঙ্ক্ষা রাখি মহারাজের নিকট হইতে এই সভা পুরুষানুক্রমে যে প্রসাদ লাভ করিয়া আসিয়াছে তাহা হইতে কদাপি বঞ্চিত হইবে না এবং আমরা আশা করিতেছি মহারাজার আশীর্ব্বাদে এবং নেতৃত্বে এই সভা উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধির পথে অগ্রসর হইবে।

আজ এই যে মিলনমন্দিরের ভিত্তি স্থাপিত হইতেছে,—বিধাতার কাছে প্রার্থনা করি, তাহা যেন সত্য সত্যই মিলন-মন্দিররূপে গড়িয়া উঠে এবং চিরকাল স্থায়ী থাকিয়া বংশ-পরম্পরাক্রমে ত্রিপুরাবাসীর গৌরব বর্দ্ধন করে এবং স্বদেশপ্রেমে তাঁহাদের চিত্তকে উদ্বোধিত করিয়া তোলে—

মিলন-মন্দির

সকলে এক মন, এক প্রাণ হইয়া সঙ্ঘবদ্ধভাবে দেশজননীর সেবায় আত্মনিয়োগ করে। মহারাজার শুভ বরদ হস্তে প্রোথিত এই শিলা-ভিত্তির উপর মঙ্গলময় ঈশ্বরের শুভাশীষ বর্ষিত হউক ইহাই আমার শেষ নিবেদন।

অবিনাশচন্দ্রের কর্ম্মকুশলতার গুণেই তাঁহার এই আশা ও আকাঙ্ক্ষা সিদ্ধির পথে অগ্রসর হইয়াছিল।

১৯৩১ সালের জানুয়ারী মাসের 'Insurance World' পত্রিকায় তাঁহার একটি সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রকাশিত হইয়াছিল, সেই পত্রিকায় তাঁহার জীবনী লেখক একস্থানে লিখিয়াছেন :

"When after a hard struggle in life, fortune smiled on him he spent money to remove distress in diverse ways. His benefactions such

as the founding of a Charitable Dispensary and a Girls School in his native village and his generous contributions for the welfare of his village generally are known to many, but how few know his private Charities? He hates to parade them and is anxious to conceal what he does by stealth. His charm of manners, his old-world courtesy are appreciated by those, who come into contact with him, and will it be far-fetched to surmise that he has built up his business on the sure foundation of the good will of his clients? The house he has built will be an enduring monument to his sterling qualities, and his sons, when he is carefully training up to carry on his ideals and traditions, may build loftier and imposing edifices in times to come, but the foundation of rock on which Mr. A. C. Sen has built. will ever testify what grit hard work and honesty can achieve," তাহা অক্ষরে অক্ষরে সত্য।

গ্রাম্য বিদ্যালয় ও চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা

চুণ্টা কৃষ্ণানন্দ দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপিত ১৯১৯

চুণ্টা কৃষ্ণানন্দ দাতব্য চিকিৎসালয় অবিনাশচন্দ্রের একটি অমরকীর্ত্তি। এই দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠার ইতিহাস এইরূপ :—ইংরাজী ১৯১২ সালের অক্টোবর মাসে যে-বার অবিনাশচন্দ্র সপরিবারে নিজবাসপল্লী চুণ্টায় যান, সেবার সেখানে তাঁহার বড় মেয়ের আমাশয় হয়। গ্রামে উপযুক্ত

চিকিৎসক ও ঔষধপত্রের অভাব থাকায় চার মাইল দূরে অবস্থিত সরাইল গ্রাম হইতে ডাক্তার ও ঔষধ আনিবার ব্যবস্থা তাঁহাকে করিতে হয়। সে-সময় তিনি বিশেষভাবে অনুভব করিয়াছিলেন যে, গরীব গ্রামবাসীদিগকে অসুখ-বিসুখে ও মৃত্যু-যন্ত্রণায় চিকিৎসার অভাবে কিরূপ কষ্ট পাইতে হয়। গ্রামের লোকদের অভাব-অভিযোগ ও পীড়ার যন্ত্রণা যে কতদূর বেদনাদায়ক তাহা তিনি অনুভব করিলেন, এবং গ্রামে একটি স্থায়ী সেবাপ্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার জন্য উদ্যোগী হইলেন। কন্যার পীড়াই হইল—তাঁহার মহৎ প্রেরণার মূল।

এই ঘটনাটিই তাঁহাকে চুণ্টায় দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপনার প্রেরণা জোগায়। সে-বারই গ্রাম হইতে কলিকাতা ফিরিবার পথে তিনি ত্রিপুরার জেলাবোর্ডে সংশ্লিষ্ট তাঁহার বন্ধু-বান্ধব ও জেলার সে-সময়কার সিভিল সার্জ্জনের নিকট হইতে দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপনায় কত খরচ পড়ে এবং কি কি নিয়মে কাজ করিতে হয়, ইত্যাদি সকল জ্ঞাতব্য বিষয় জানিয়া আসেন এবং কলিকাতায় পৌছিয়াই দাতব্য চিকিৎসালয়ের জন্য জমি, বোর্ডের নিয়মানুযায়ী ডাক্তারখানার দালান, ডাক্তার-কম্পাউণ্ডার ও অন্যান্য কর্ম্মচারীর বাসস্থান, আসবাব ও তৈজসপত্র, ঔষধ ও যন্ত্রপাতি প্রভৃতির সমুদয় ব্যয়ভার গ্রহণ করিবেন বলিয়া জেলা-বোর্ডকে চিঠি দেন।

চিকিৎসালয় স্থাপনের প্রেরণা

সেই অনুসারে ইংরাজী ১৯১৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে জেলা বোর্ড, কি-কি সর্ত্তে ডাক্তারখানা স্থাপনা হইতে পারে, তাহা তাঁহাকে জানায়। জমি নির্ব্বাচনের জন্য অনেক দিন লাগে। পরে ১৯১৫ সালের

১২ই জানুয়ারীতে চুক্তিপত্র দলিল লেখা হয় এবং তাহা রেজেষ্টারী করিতেও কয়েকমাস কাটিয়া যায়। ইং ১৯১৫ সালের ২৩শে আগষ্ট রেজিষ্টারী করা চুক্তিপত্র সহ চিকিৎসালয় নির্ম্মাণ খরচের প্রথম কিস্তির টাকা অবিনাশচন্দ্র জেলাবোর্ডকে পাঠান। তাহারও অনেক পরে ইং ১৯১৮ সালের ডিসেম্বর মাসে চিকিৎসালয় ও ডাক্তার কম্পাউণ্ডারদিগের বাসস্থান জেলাবোর্ডের তত্ত্বাবধানে তৈয়ারী হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে চুক্তি সর্ত্তানুযায়ী চিকিৎসার যন্ত্রপাতি, ঔষধ ও আসবাব পত্র প্রভৃতি তিনি কলিকাতা হইতে চুণ্টা পাঠান।

এখানে উল্লেখ করা দরকার মনে করি যে, চিকিৎসালয়ের সংলগ্ন উত্তর দিকে রঘুত্তম দীঘি নামে যে সুবৃহৎ দীঘি আছে তাহা ডাক্তারখানা নির্ম্মিত হইবার সময়েই জিলা বোর্ড কর্ত্তৃক ব্রাহ্মণবাড়ীয়া মহকুমার সে-সময়কার ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী (S. D. O.) শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার দাশের তত্ত্বাবধানে ৮০০০৲ টাকা খরচে দুর্ভিক্ষ-লাঘব-করণ কাজ উপলক্ষে পঙ্কোদ্ধার করা হয়। নিজস্ব পুকুর ব্যতীত এই দীঘিও ডাক্তারখানার সংশ্লিষ্ট থাকায় অনেক প্রকার সুবিধা হইয়াছে।

অবিনাশচন্দ্রের ইচ্ছানুযায়ী তখনকার জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার ওয়েরেস্ সাহেব (Mr. Wares, I. C. S.) ইং ১৯১৯ সালের ৬ই ফেব্রুয়ারী তারিখে দাতার উপস্থিতিতে চিকিৎসালয়ের দ্বারোদ্ঘাটন করিতে স্বীকৃত হন। সেই অনুসারে সমস্ত ব্যবস্থাও করা হয়। কিন্তু অনুষ্ঠানের মাত্র দুই দিন আগে ৪ঠা ফেব্রুয়ারী দাতার কনিষ্ঠ ভ্রাতা দেবেন্দ্রনাথের অকাল মৃত্যু সমস্ত পরিকল্পনাকে ওলট্ পালট্ করিয়া দেয়। এই

আকস্মিক দুর্ঘটনার দুইদিন পরেই কলিকাতা হইতে আসিয়া অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়া অবিনাশচন্দ্রের পক্ষে একেবারেই সম্ভবপর ছিল না। এই দুঃসংবাদ যখন ওয়েরেস্ সাহেব শুনিতে পান তখন তিনি ব্রাহ্মণবাড়ীয়া অবধি পৌঁছিয়াছিলেন; কিন্তু সেরূপ পরিস্থিতিতে চিকিৎসালয়ের দ্বারোদ্‌ঘাটন কার্য্য করিতে তাঁহার আর ইচ্ছা রহিল না। তিনি ব্রাহ্মণবাড়ীয়া হইতেই কুমিল্লায় ফিরিয়া গেলেন এবং তাঁহার অভিপ্রায় অনুসারে মহকুমার ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার দাশ মহাশয় উক্ত ৬ই ফেব্রুয়ারী চিকিৎসালয়ের দ্বারোদ্‌ঘাটন করেন।

দ্বারোদ্‌ঘাটন

সে সময়ে কুমিল্লার উকিল শ্রীযুক্ত রজনীনাথ নন্দী ও শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র দাশ, ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার উকিল শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র সেন, গ্রামবাসী এবং পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের আরও কয়েকজন বিশিষ্ট-ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। উক্ত দাশ মহাশয় "পরিদর্শন-মন্তব্য" পুস্তকে লিখিয়া গেলেন :

I came here today and formally opened the Chunta Dispensary on being asked by the District Magistrate to do so. B. K. DAS.
6. 2. 1919

তাৎপর্য্য—

জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের আদেশ অনুসারে আমি আজ এখানে আসিয়া নিয়মিত ভাবে চুণ্টা চিকিৎসালয়ের দ্বারোদ্‌ঘাটন করিলাম। বি. কে. দাশ.
৬. ২. ১৯১৯.

অবিনাশচন্দ্র চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠার জন্য নিজে একটি বিস্তৃত ভূমিখণ্ড জেলাবোর্ডকে দান করেন। সেই জমিটি গ্রামের দক্ষিণ পশ্চিমে অবস্থিত। দক্ষিণ দিকে বিস্তৃত মাঠ। জেলাবোর্ডের তত্ত্বাবধানে চিকিৎসালয়টি সেই ভূমির উপর তাঁহারই অর্থে তৈয়ারী হয়। প্রথমে ডাক্তারখানার উত্তর পার্শ্বের ভূমিখণ্ডের উপরই ডাক্তার ও কম্পাউণ্ডারের বাস ভবন তৈয়ার করা হয়।

অবস্থান

তাহাতে স্থানাভাব হয়, এবং সঙ্গে সঙ্গে সে-স্থানের সৌন্দর্য্যও নষ্ট হইয়া যায়। সে-জন্য চিকিৎসালয়ের পশ্চিম পার্শ্ববর্ত্তী জমি অবিনাশচন্দ্রের অর্থেই জেলাবোর্ড কর্ত্তৃক দখল নেওয়া হয় এবং সে-স্থানে ইং ১৯২৫ সালের মার্চ্চ মাসে চিকিৎসালয়ের নিজ ব্যবহারের জন্য একটি পুকুর খনন করা হয়। সেই পুকুরের উত্তর পারে ডাক্তার ও কম্পাউণ্ডারের জন্য সুন্দর বাসভবন নির্ম্মাণ করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

নামকরণ—

চিকিৎসালয়টির নামের পরিচয় দিবার জন্য এখানে অবিনাশ-চন্দ্রের সংক্ষিপ্ত বংশধারা উদ্ধৃত করিতেছি।
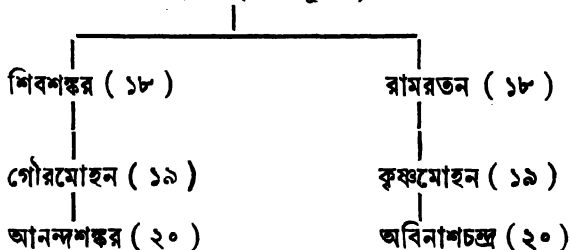
অবিনাশচন্দ্রের পিতৃদেব ৺কৃষ্ণমোহন এবং নিঃসন্তান জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, ৺আনন্দশঙ্কর এই দুই জনের নামানুসারে চিকিৎসালয়টির নাম কৃষ্ণানন্দ দাতব্য চিকিৎসালয় রাখা হইয়াছে। বাল্যকালে পিতৃবিয়োগের পর ৺আনন্দশঙ্করই অভিভাবকরূপে অবিনাশ-চন্দ্রের শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

পরিচালনা—

জেলা বোর্ডের কর্তৃত্বাধীনে স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের দ্বারা গঠিত একটি সমিতির উপর চিকিৎসালয়টির পরিচালনার ভার ন্যস্ত আছে। এই কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সভ্য সংখ্যা এগার জন। তাহার মধ্যে একজন সভাপতি ও একজন সম্পাদক আছেন। কয়েক বৎসর অন্তর অন্তর এই সমিতি নূতন ভাবে গঠিত হয়। প্রতিষ্ঠাতা অবিনাশচন্দ্র বরাবর সমিতির সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়া আসিতেছেন।

আমরা এখানে প্রথম বর্ষের কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সভা-পতি ও কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সভ্যদের নামোল্লেখ করিলাম।

দাতা কর্তৃক প্রথমে ইং ১৯১৯ ৩রা মার্চ্চ তারিখে নিম্নলিখিত ভাবে কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি গঠিত হয়।

প্রথম কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি—

(১) অবিনাশচন্দ্র সেন (সভাপতি)
(২) ৺হরিশ্চন্দ্র সেন
(৩) ৺প্রতাপচন্দ্র সেন (সম্পাদক) (পশ্চিমপাড়া)
(৪) মহেশচন্দ্র দেব (ঘাগড়াজোড়)
(৫) ৺মুন্সী ইছা মিঞা (ভুঁইসহর)
(৬) ৺প্যারীচরণ গুপ্ত
(৭) সুদর্শন ভট্টাচার্য্য
(৮) ৺পরমানন্দ বিদ্যারত্ন
(৯) ৺অঘোরচন্দ্র সেন
(১০) রজনীকান্ত দে সরকার
(১১) ৺অম্বিকাচরণ সেন

৺প্যারীচরণ গুপ্তের স্থলে ইং ৮।১০।১৯ তারিখ হইতে পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এবং ৺অম্বিকাচরণ সেন মারা গেলে ইং ১৫।১১।২১ তারিখে সেই স্থানে দীনেশচন্দ্র সেন সভ্য নির্ব্বাচিত হন।

দ্বিতীয় কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি—

ইং ১১।৩।২২ তারিখে নিম্নলিখিত ভাবে সমিতি গঠিত হয়।

(১) অবিনাশচন্দ্র সেন (সভাপতি)
(২) ৺হরিশ্চন্দ্র সেন
(৩) ৺প্রতাপচন্দ্র সেন (সম্পাদক) (পশ্চিমপাড়া)
(৪) ৺পরমানন্দ বিদ্যারত্ন
(৫) সুদর্শন ভট্টাচার্য্য
(৬) অবনীকুমার গুপ্ত
(৭) দীনেশচন্দ্র সেন
(৮) অঘোরচন্দ্র সেন
(৯) মহেশচন্দ্র দেব (ঘাগড়াজোড়)
(১০) রজনীকান্ত দে সরকার
(১১) ৺মুন্সী ইছা মিঞা (ভূঁইসহর)
(১২) পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য
(১৩) মুন্সী আরজউদ্দীন (রসুলপুর)

অঘোরচন্দ্র সেন জেলা বোর্ডের নিকট এই নির্ব্বাচন সম্পর্কে আবেদন করিলে ইং ২।৪।২২ তারিখে অবনীকুমার গুপ্ত স্থলে ৺অপূর্ব্বকৃষ্ণ সেন সভ্য নির্ব্বাচিত হন। ৺অপূর্ব্বকৃষ্ণ মারা গেলে ইং ১৭।৮।২৪ তারিখে সেইস্থানে প্রিয়কৃষ্ণ সেনকে মনোনীত করা হয়। ৺প্রতাপচন্দ্র সেন সম্পাদক ছিলেন; কিন্তু পরে তিনি কলিকাতায় চলিয়া গেলে অঘোরচন্দ্র সেন সম্পাদক নির্ব্বাচিত হন।

পরবর্ত্তী কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি—

ইং ২০।৫।২৭ তারিখে নিম্নলিখিত ভাবে সমিতি গঠিত হয়।

(১) অবিনাশচন্দ্র সেন (সভাপতি) (৭) শশীভূষণ সেন (সম্পাদক)

(২) ৺অলিউল্লা মিঞা (পানীসহর) (৮) উদয়চন্দ্র ভট্টাচার্য্য

(৩) মুন্সী ইছা মিঞা (ভুঁইসহর) (৯) বামাচরণ অধিকারী (অরুয়াইল)

(৪) মৌলবী আব্দুল করিম (পাকসিমুইল) (১০) ৺নীলকান্ত দত্ত (প্রধান শিক্ষক)

(৫) মুন্সী আরজউদ্দীন (রসুলপুর) (১১) অঘোরচন্দ্র সেন

(৬) শশীভূষণ গুপ্ত ভায়া (তহশীলদার) (১২) রজনীকান্ত দে সরকার

(১৩) সুদর্শন ভট্টাচার্য্য

৺অলিউল্লা মিঞা ও ৺মুন্সী ইছা মিয়ার মৃত্যু হইলে সেই সেই স্থানে ধীরেন্দ্রকিশোর সেন ও ভুঁইসহরের মজহর মিঞা সভ্য মনোনীত হন। শশীভূষণ সেন চলিয়া গেলে সেই স্থানে ৺প্রতাপচন্দ্র সেনকে সভ্য মনোনীত করা হয় এবং রজনীকান্ত সরকার সম্পাদক নিযুক্ত হন। ৺নীলকান্ত দত্ত চুণ্টা হইতে চলিয়া যাওয়ায় সেই স্থানে প্রিয়কৃষ্ণ সেনকে সভ্য মনোনীত করা হয়।

অন্যান্য পরবর্ত্তীকালের কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির বিষয় এখানে আর উল্লেখ করা হইল না। অবিনাশচন্দ্র যত দিন জীবিত ছিলেন, ততদিন তিনিই কৃষ্ণানন্দ দাতব্য চিকিৎসালয়ের সভাপতি ছিলেন। আমরা কৃষ্ণানন্দ দাতব্য চিকিৎসালয়ের বিবরণ—মণিলাল সেন শর্ম্মা লিখিত

চুণ্টা কৃষ্ণানন্দ দাতব্য চিকিৎসালয়ের বিবরণী হইতে সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিলাম। এই চিকিৎসালয় দ্বারা যে চুণ্টা গ্রামবাসী ও উহার চতুঃপার্শ্বস্থ লোকের কত উপকার হইয়াছে তাহা চিকিৎসালয়ের পরিদর্শনীয় মন্তব্যসমূহ হইতে জানা যাইতেছে। ১:।১২।২৮ তারিখে মিঃ এফ. ডব্লিউ. রবার্টসন আই. সি. এস. (F. W. Robertson, I. C. S.) District Magistrate লিখিয়াছিলেন :—The whole expense of the Hospital is borne by Bábu A. C. Sen and the Hospital is a great benefit of the neighbourhood." অর্থাৎ হাসপাতালটির সমুদয় খরচ বাবু এ. সি. সেন বহন করিতেছেন। ইহার চতুঃপার্শ্বস্থ সকলের ইহা একটি মহোপকারী প্রতিষ্ঠান।

মণিলাল বাবু দাতব্যচিকিৎসালয়ের বিবরণী লিখিতে গিয়া একস্থানে অবিনাশচন্দ্র সম্বন্ধে লিখিয়াছেন :—"ইনি স্বাবলম্বী কৃতি পুরুষ। অসাধারণ অধ্যবসায়, পরিশ্রম, নিষ্ঠা এবং একাগ্রতার বলে তিনি অতি সামান্য অবস্থা হইতে উন্নতির উচ্চশিখরে আরোহণ করিয়াছেন এবং ধনে, মানে, মর্য্যাদার এবং চরিত্রে বাংলা দেশে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছেন। প্রভূত ধনার্জ্জন করিলেও তিনি তাঁহার শৈশবের স্বপ্নদোলা এবং বাল্যের ক্রীড়াভূমি চুণ্টা গ্রাম এবং তাঁহার অধিবাসীদিগকে ভুলেন নাই। তাহাদের দুঃখ এবং অভাব মোচনের প্রেরণার ফলে আজ চুণ্টা গ্রামে অবিনাশচন্দ্রের সেবা-ধর্ম্ম হাসপাতালের মধ্য দিয়া মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে।

কুমিল্লার হাসপাতালে এক্স-রে যন্ত্রপাতি ক্রয়ের জন্য দান

A. C. SEN X-RAY DEPARTMENT

কুমিল্লা এক্স-রে হাসপাতাল সম্মুখে অবিনাশচন্দ্রের অভ্যর্থনা

এ-বিষয়ে এতটুকু অত্যুক্তি নাই। প্রসঙ্গক্রমে এখানে উল্লেখ করিতেছি যে কুমিল্লার হাসপাতালে X Rayর যন্ত্রপাতি ক্রয়ের জন্য তিনি সাড়ে বারো হাজার টাকা দান করেন।

অবিনাশচন্দ্র স্ত্রী-শিক্ষার একান্ত পক্ষপাতী ছিলেন। সে-কথা আমরা পূর্ব্বেও প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করিয়াছি। তিনি গ্রামে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া বালিকাদের প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করাতে গ্রামবাসী বিশেষভাবে উপকৃত হইতেছে। এ-সব ছাড়া অবিনাশচন্দ্র গ্রাম্য পাঠাগারও নানা শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করিয়া, সে সব প্রতিষ্ঠানে দান করিয়া গ্রামের শ্রীবৃদ্ধি করিয়াছেন। এখানে গৌরবের সহিত উল্লেখ করিতেছি,—বাঙ্গালা দেশের নানা স্থানে অবিনাশচন্দ্রের ন্যায় অনেক কৃতি পুরুষ জন্মিয়াছেন ও জীবিত আছেন, তাঁহারা যদি অবিনাশচন্দ্রের ন্যায় প্রত্যেকে সাধ্যানুযায়ী নিজ নিজ পল্লীর উন্নতি-কল্পে, অগ্রসর হ'ন, তবে বাঙ্গালার অতীত গৌরব গরিমা, বিনষ্ট স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্য আবার ফিরিয়া আসা সম্ভাবনা ছিল। গ্রামের উন্নতির জন্য, গ্রামবাসী আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধবের প্রতি তাঁহার ঐকান্তিক অনুরাগ ও সহানুভূতি আমরা বরাবর লক্ষ্য করিয়াছি। শত কার্য্য ফেলিয়াও অবিনাশচন্দ্র দেশবাসীর অভাব-অভিযোগের কথা শুনিতেন ও তাহা দূর করিতে চেষ্টা করিতেন।

অবিনাশচন্দ্রের জীবন ছিল কর্ম্মের, কল্পনার নহে। আমরা নিম্নে ১৯৩১ সালের জানুয়ারী মাসের অবিনাশচন্দ্রের যে সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার এক স্থানে লেখক লিখিয়াছেন :—

"Mr. Sen had imagination and vision, while

antipartition agitation was sweeping the country from one end to the other he foresaw that national consciousness had been awakened and the people were bound to patronise things Indian more and more with the time. Through the noise and turmoil of the swadeshi agitation, he recognised that after the tide subsides, sufficient silts would be left, to fertilise the national spirit. But he abhorred exploitation of patriotism. The substitute which India would give must be as good as, if not better than what the European offer. That has been his guiding principle and he has tried to translate it into action through his business career."

স্বদেশীযুগের মহান্ আদর্শ তাঁহার অন্তরে যে প্রেরণা জাগাইয়াছিল, তাহা ছিল সম্পূর্ণ অন্যরূপ, তাহা ছিল প্রকৃত কর্ত্তব্যনিষ্ঠতার পরিচায়ক, সে-পরিচয় পল্লী সংগঠন, দেশসেবা এবং পল্লীবাসীদের দুঃখদুর্দ্দশা মোচনের জন্য—দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন, বালিকাবিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা, লাইব্রেরী ও পথ, ঘাট, পুষ্করিণী ও সরোবর প্রভৃতির সংস্কারের মধ্য দিয়া রূপায়িত হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি যে প্রকৃতভাবেই সত্যরূপে স্বদেশী আন্দোলনকে গ্রহণ করিতে পারিয়াছিলেন তাহা তাঁহার কার্য্যাবলীর মধ্য দিয়াই অবিনাশচন্দ্রের গৌরব বর্দ্ধন করিয়া জীবিত রহিয়াছে।

১৯২৬ সালে অবিনাশচন্দ্র সপরিবারে ইউরোপ ভ্রমণে

যাত্রা করেন। ইউরোপ-ভ্রমণের যথাযথ বিবরণীটি লিখিবার জন্য তাঁহাকে কয়েকবার অনুরোধ করিয়াছিলাম—কিন্তু তিনি সর্ব্বদাই বলিতেন—আচ্ছা দেখা যাবে—'অনেক কিছুত বুঝে নিয়ে এসেছি,' যে কারণেই হউক তাহা কার্য্যে পরিণত করিয়া যাইতে পারেন নাই। আমরা এ-বিষয়ে তাঁহার সাধ্বী পত্নী শ্রীযুক্তা গিরিবালা দেবীকে অনুরোধ করায় আমাদিগকে সংক্ষিপ্তাকারে যাহা লিখিয়া দিয়াছেন, আমরা এখানে তাহা প্রকাশ করিলাম। শ্রীযুক্তা গিরিবালা দেবী বলেন:

ইউরোপ-ভ্রমণ
১৯২৬ সাল এপ্রিল

১৯২৪ সনের ফেব্রুয়ারী মাসে আমাদের এই নূতন বাড়ী আলিপুরে আসি। তখনও বাড়ী সম্পূর্ণ শেষ হয় নাই। চারিদিকে কাজ চলছে। রেণুর বয়স তখন ৪।৫ বৎসর হবে। সে বলত কোথায় এসেছো মা! এ যে কুলির বাড়ী।

আগষ্ট কিম্বা সেপ্টেম্বর মাসে নেরু (শ্রীমান্ প্রবোধকুমার সেন) বিলাত যায়। খোকন তখন ২।৩ মাসের। বিলাত যাওয়ার আগে তাকে কোলে নিয়ে বসে সে আদর করত এবং ঘণ্টার পর ঘণ্টা কোলে নিয়ে বসে থাকতো তা আমার এখন ও চোখে ভাসে। ছেলেপিলে নিয়ে খেলা করতে নেরু খুব ভালবাসে; এটা তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করছিল এবং তিনি দেখে খুব খুসী হয়েছিলেন। এইবার কালীপূজার দিন হাজারিবাগে ছেলে-মেয়েদের সব নিয়ে সে যখন মেতে খেলা করছিল, তিনি একদৃষ্টে দেখছিলেন এবং বলছিলেন নেরু ত ছেলেদের নিয়ে খুব পারে! যাক্ আমার স্থানটা বজায় রাখতে পারবে!

১৯২৬ সালের ১লা এপ্রিল আমরা কলকাতা হতে লণ্ডনাভিমুখে রওনা হই। রেণু আমাদের সঙ্গে গিয়েছিলো। তখন তাহার বয়স ছিল ৬॥ বৎসর। ছয় মাস পর ৩১শে অক্টোবর আমরা দেশে ফিরি, সে-দিন তাহার ৭ বৎসর পূর্ণ হয়েছিল।

৩রা এপ্রিল S. S. Naldarah জাহাজে আমরা পোর্টে উঠলাম। তখনকার দিনে উহা বেশ বড় জাহাজ ছিল। ১৬ হাজার টনের জাহাজ। তাহার নিয়ম-কানুন অতি সুন্দর। খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা ও খুব চমৎকার ছিল। তিনটা বেড নিয়ে একটা বড় কেবিনই আমরা পেয়েছিলাম। লর্ড রিডিং (Lord Reading) ও আমাদের জাহাজেই প্রত্যাগমন করেন। এডেন পর্য্যন্তই তিনি বড়লাটের যোগ্য সম্মান পেয়েছিলেন। সেখানে পৌঁছলে পর কয়েকটি তোপ-ধ্বনি দ্বারা তাঁকে শেষ সম্মান জ্ঞাপন করা হয়। তারপরই তিনি সর্ব্ব-সাধারণের মত একজন যাত্রী হলেন।

১লা এপ্রিল থেকেই কলকাতায় সাম্প্রদায়িক গোলযোগের সৃষ্টি হয় কিন্তু আমরা সেই খবর এডেনে পৌঁছবার কিছু পূর্ব্বে পাই।

কলিকাতায় সাম্প্রদায়িক গোলযোগ

Radio এর তখন এত বহুল প্রচলন ছিল না। জাহাজের লোক বেতারে এ সংবাদ পায় এবং তাঁহাকে জানায়। সংবাদ পাবা মাত্র আমাকে এসে বললেন, "বড়ই ভাবনায় পড়লাম।" বিলাতে ছয় মাস ব্যাপী এই দুর্ভাবনায় দিন কাটাতে হয়েছে। ছয় মাস ব্যাপী এই বীভৎস ব্যাপার চলছিল। ছেলে-মেয়েরা সব বাড়ীতে রয়েছে, আমরা কেউ নেই; মন এই ক্লেশদায়ক-বেদনা বহন করেই চলেছিলো সমানে ছয় মাস।

মিশরে (ইজিপ্টে) জাহাজ পৌঁছলে কয়েকজন ভদ্রলোক প্রাতঃ-রাশ সমাপন করেই নেমে গেলেন তিনিও তাঁদের সঙ্গে গেলেন। তাঁরা ট্রেনে কাইরো (Cairo) গিয়ে সেখানে হোটেলে লাঞ্চ খেয়ে পিরামিড ইত্যাদি পরিদর্শন করে রাত্রি ১০টার সময় একজন পোর্ট সৈয়দ, (Port-said) এ জাহাজে উঠলেন। সারাদিন আমাদের জাহাজ সুয়েজ খাল দিয়ে আস্তে আস্তে চলতে লাগলো। আমি একা একা সারাদিন কেঁদে কেঁদে দিন কাটালাম। আমার কেবলই মনে হতে লাগলো এই মরুভূমির ভিতর দিয়ে ও জাহাজ চলবার বন্দোবস্ত হলো কিন্তু আমাদের সুজলা-সুফলা দেশে জলের অভাবে

শ্রীযুক্তা গিরিবালা দেবী—জন্ম—১৩ই আষাঢ় ১২৮৭

লোকের কষ্টের সীমা নেই। আখাউড়ার ষ্টেশনে এক গ্লাস জল ছ' পয়সা করে বিক্রি হওয়ার খবর শুনেছিলাম; আমার চোখের সামনে কেবল সেই দৃশ্যই ভেসে ওঠছিল। আমি সেখানেই প্রতিজ্ঞা করলাম এবার দেশে গিয়েই গ্রামের পুকুরের পঙ্কোদ্ধার করব। ভগবানের আশীর্ব্বাদে আমার সেই প্রতিজ্ঞা সফল হয়েছিল। চুণ্টায় আমাদের সামনের পুকুর ও ক্রমশঃ প্রজাদের আরও ২।৩ টা পুকুর কাটানো হয়েছিলো।

তারপর ভূমধ্যসাগরে ভেসে পড়লাম এবং যথা সময়ে মার্সেয়ে গিয়ে পৌঁছলাম। টমাস্ কুকের লোক সব জায়গায় আমাদের সাহায্য করাতে সব বিষয়েই বেশ সুবিধা হয়েছিল। মার্সেয়ে হোটেলে লাঞ্চে প্রকাণ্ড একটা চিংড়ি মাছ দিয়েছিল। এত বড় চিংড়ি আমি আর কখনো দেখি নাই। ভেবেছিলাম এটা অখাদ্য হবে, কিন্তু খুব নরম ও মোলায়েম ও উপাদেয় ছিল।

ট্রেনে চড়ে কেলে গেলাম, তারপর ইংলিশ চ্যানাল পার হওয়ার পালা। আধঘণ্টায় অন্নপ্রাশনের ভাত বের করে দিল। ক্যাবিন ভাড়া করা ছিল তাই সেখানে শুয়ে কোন মতে কাটিয়ে দিলাম। সেদিন রেণুও বমন করেছিল; তিনি ত হেসে আমাদের ঠাট্টা করেই আনন্দ উপভোগ করছিলেন। বাস্তবিক তাঁর সে-সব কোন বালাই ছিল না।

ভ্রমণ করতে যেমন ভালবাসতেন তেমনি তাঁর সে বিষয়ে ক্ষমতাও ছিল অসাধারণ, কখনও কাতর হতেন না। এখান থেকে টমাস্ কুকের সঙ্গে যে ভাবে ছয় মাসের প্রোগ্রাম তৈরী করেছিলেন, ঠিক্ সেই ভাবে ঘণ্টা মিনিট হিসাব করে কাজ করে এসেছিলেন। কথার এক তিল ব্যতিক্রম হয় নাই। মুখের কথার ব্যতিক্রম হতে পারবে না এই প্রতিজ্ঞা চির দিন রক্ষা করে গিয়েছেন।

কথা ও কাজ

জীবনে আলস্য বা কোন কাজে শৈথিল্য কখনও দেখি নাই। বলতেন সুস্থ শরীরে সংসার পথে চলতে না পারলে সুখ নাই। একথা অন্তর দিয়ে অনুভব করেছিলেন এবং এই কর্ত্তব্যই চিরদিন সামনে এগিয়ে নিয়ে গেছে। বিছানায় শুয়ে থাকতে ঘৃণা

বোধ করতেন। রুগ্নাবস্থায় ও উঠে বসতে বা সাধ্যমত চলা করতে আমাকে সর্ব্বদা বলতেন। নিজের বেলায় ত বিছানায় থাকতেনই না। বলতেন, এমন বাঁচা আমি বাঁচতে চাই না। ভগবান প্রাণের কথা প্রাণ দিয়ে শুনেছিলেন। শেষ নিশ্বাস ও চেয়ারে বসেই ত্যাগ করেছিলেন। বিছানায় আর শুতে হয় নাই।।

১৭ই এপ্রিল বিকাল ৪টায় আমরা ভিক্টোরিয়া ষ্টেশনে পৌছলাম। কিশোরী, নেরু, কমল বোস, রঞ্জিত বোস, সব ষ্টেশনে গিয়েছিলো। ঈজিপসান হাউসে নেরু আমাদের জন্যে একখানি ফ্ল্যাট ঠিক করে রেখেছিল। কিশোরী আমাদের নিয়ে গেলো এবং নেরু আমাদের জিনিষপত্র নিয়ে পরে এলো। সঙ্গে তাঁর তামাক ছিল সেই নিয়ে কাষ্টমের সঙ্গে গোলযোগে তাদের পৌছাতে একটু দেরীই হয়েছিল। আমি 'ত গিয়েই বিছানায় লম্বা। একটু পরে সুস্থির হয়ে উঠে হাত মুখ ধুয়ে বসবার ঘরে এসে চা-টা খেলাম এবং সকলের সঙ্গে গল্পগুজব সব চললো। কমল বোস ত তাঁর গুড়গুড়ির ব্যবস্থা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লো এবং কোথা থেকে কি সব নল ইত্যাদি এনে ঠিক্ করে দিল।

লণ্ডনে উপস্থিতি

২৭।৪।৪৮

আমরা লণ্ডন পৌছবার এক সপ্তাহ পরেই সেখানে সাধারণ ধর্ম্মঘট (General Strike) আরম্ভ হয়। এত বড় Strike নাকি ইতিপূর্ব্বে আর হয় নাই। সকাল বেলা হঠাৎ দেখি-ট্রাম, বাস ইত্যাদি কিছু চলে না। ভাবলাম ৯॥টার সময় যে মেয়েটি প্রাতঃরাশ নিয়ে আসবে, তার কাছে অনেক গল্প শুনব। আমিও উৎসুক নয়নে তার মুখের দিকে চেয়ে আছি ; সে গম্ভীর ভাবে রীতিমত খাদ্য পরিবেশন করে গেল একটি কথাও বল্‌ল না। পরের দিন ট্যাক্সিও বন্ধ হয়ে গেল। আমরা পিকাডেলি (Piccadilly)তে আছি। এ-জায়গাটা Heart of the London বলা হয়। লণ্ডনের চারিদিকের দৃশ্য হেঁটে হেঁটে দেখতে লাগলাম। সকালে স্নান খাওয়া সেরে রাস্তায় হেঁটে দোকান-পাট ঘুরে বাড়ী এসে দুপুরের খাওয়া শেষ করে নিকটের

লণ্ডনে ধর্ম্মঘট

Plaza ইত্যাদি Cinema houseএ গিয়ে বসে থাকি এবং সন্ধ্যার পর আবার হেঁটেই বেড়াই কিম্বা Cinema দেখি। ৭ দিন এই ধর্ম্মঘট ছিল। অতি ধীর স্থির ও তৎপরতার সঙ্গে তারা এই দুঃখ বহন করেছিল এবং আমরাও শ্রদ্ধার সঙ্গে তাদের চরিত্রের দৃঢ়তা ও স্থির মস্তিষ্কের পরিচয় পেয়েছিলাম।

লণ্ডনে কিছুদিন আমি নার্শিং হাউসে (Nursing house)এ ছিলাম। Egyptian house থেকে আমরা Kensington Palace Manssion এ যাই। সেখানে রেণুর জন্যে একটি Governess রাখা হয়। নেরুও ছুটীর সময় (কেম্ব্রিজ) থেকে এসে কিছুদিন আমাদের কাছে ছিল। তখন সেই হোটেলের ৫।৬টি কামরা আমরা নিয়েছিলাম। অনেক আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুবান্ধবও সেখানে আসা যাওয়া করতেন এবং বলতেন আপনারা দেখ্‌ছি আধখানা হোটেল নিয়ে বসে আছেন। সেখানকার চাকর বাকর আমাদের অত্যন্ত খাতির করত, Liftএর ছোকরাকে উনি মাঝে মাঝে সিনেমা দেখবার পয়সা দিতেন। সে এত বাধ্য ছিল যে আমাদের কামরায় লোক আসলে যতক্ষণ পর্য্যন্ত না যেতেন সে তার dutyর পরেও অপেক্ষা করত।

আমরা সাড়ে তিন মাস লণ্ডনে ছিলাম। তারপর প্যারিস, বার্লিন, ভিয়েনা, রোম, নেপলস্‌, মিলান, ইণ্টার লেকেন্‌, জেনেভা, ক্যান, নিস্‌ ইত্যাদি ঘুরে দেশে ফিরে আসি।

দেশে ফিরে আসবার সময় Canএ এসে নেরু আমাদের সঙ্গে ২।৩ দিন থেকে আমাদের একেবারে মার্সেয়ে জাহাজে তুলে দিয়ে আবার লণ্ডনে ফিরে যায়। অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে তখন ছেলেকে আবার বিদায় দেই। সেই কথা মনে হয়ে আবারও ব্যথা অনুভব করছি। তিনি ত অত্যন্ত স্নেহশীল পিতা ছিলেন; তখন কতই কাতর হয়ে কাঁদতে আরম্ভ করলেন সে সময়ে আমাকেই কঠোরতা অবলম্বন করে শান্ত থাকতে হয়েছিল। সর্ব্বদাই এইরূপ হত। ভগবান জানেন আরও কত কঠোর আমাকে হতে হবে!

ইউরোপের নানাস্থানে অনেক সুন্দর সুন্দর দৃশ্য দেখেছি। অনেক লোকের সঙ্গে আলাপ হয়েছে। কত দেশে কত জনে স্মৃতিচিহ্ন দিয়েছে সে-সব আজও সযত্নে রাখা আছে কিন্তু সেসব এখন অতীতের কাহিনীতে পরিণত হয়েছে। সব কথা লিপিবদ্ধ করা এখন সম্ভব নয়।

নেপলসের Blue Groto এক চমৎকার স্বাভাবিক দৃশ্য। দুরন্ত ছেলের ন্যায় তাঁ বিশ্ব মাতার গুপ্ত-ভাণ্ডার তন্নতন্ন করে কত কিছু বের করেছে ও উপভোগ করেছে, আমি কেবল সবিস্ময় অন্তরে তা উপলব্ধি করতাম। Continent যাওয়ার পূর্ব্বে উনি স্কটলেণ্ড গিয়েছিলেন। শরীর অসুস্থ থাকায় আমি যেতে পারি নি। সেখানকার হ্রদগুলি নাকি খুব সুন্দর। আমি সুইজারলেণ্ডে জেনেভায় খুব সুন্দর সুন্দর হ্রদ ভ্রমণ করেছি। সেখানকার ঘড়ির কারখানা ও ভেনিসের কাঁচের কারখানা (Factory) দেখেছি এবং মুগ্ধ হয়েছি ও স্মৃতি চিহ্নস্বরূপ কিছু কিছু কিনেছি। দুঃখের বিষয় জেনেভায় আমার হাতের ঘড়িটি চুরি হয়ে গেল। বিলাতের কোটটি ও রক্ষা করতে পারলাম না। ত্রিপুরা-হিতসাধিনী সভার সভানেত্রী রূপে যেদিন এলবার্ট হলে বক্তৃতা দিতে গেলাম ফিরে এসে আর বাড়ীতে কোটটি পেলাম না।

ভিসুবিয়াস, পম্পে ইত্যাদি সব বিস্ময়াকুলনেত্রে পরিদর্শন করেছিলাম। আমাদের হোটেল হতেই ধূম উদ্‌গীরণ দৃশ্য দেখা যেত। Electric Train এর সাহায্যে তার উপরে ও উঠেছিলাম এবং লাভা পড়ে যে-সব উর্ব্বরা জমি নষ্ট হয়েছে তাও দেখলাম। কিছুদিন পূর্ব্বে ভিসুবিয়াস জাগ্রত হয়ে যে-সব উদগীর্ণক রেছিল তার সাত রকমের লাভা নিয়ে এক একটা কাঁচের নল তৈরী করে তাহা বিক্রি করেছিল, আমি তা কিনে আনলাম। নীচে গিয়ে সেই স্থানটা ও দেখে এসেছি। তারপর পম্পে এসে কত ইতিহাস-প্রসিদ্ধ কীর্ত্তি দেখলাম, তার অন্ত নাই।

তিনি ত অনেক কিছু লিখে এনেছিলেন, কিন্তু সে-সব কোথায় আছে তা জানিনা। খুঁজে বের করাও আমার পক্ষে বর্ত্তমানে

জ্যেষ্ঠ জামাতা স্বর্গত কিশোরীমোহন গুপ্ত

সম্ভব নয়। প্যারিসের পুরাকালের রাজাদের কীর্ত্তিকলাপও দেখেছিলাম কিন্তু আজ ত সে সব কিছুই লিখতে পারছি না। অনেক ছবি এনেছিলেন তা বোধ হয় এখনও আছে।

আমি যা স্মরণে আছে তাই লিখ্‌লাম। তাঁকে শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র বাবু ও আমরা সকলেই সবকথা লিখতে অনুরোধ করেছিলাম কিন্তু রাবণের সিঁড়ি তৈরীর ন্যায়, আজ করবেন, কাল করবেন করে আর তা সম্পন্ন করে যেতে পারেন নাই।

অষ্টম অধ্যায়

অবিনাশচন্দ্রের দান সম্বন্ধে একথা উল্লেখযোগ্য যে তাঁহার দান শুধু নিজ জেলা, গ্রাম বা আত্মীয়-স্বজনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, তিনি যখন যে কোন প্রতিষ্ঠান সৎভাবে পরিচালিত হইতেছে দেখিতেন, সেখানেই সাহায্য করিতেন। সাহিত্যসেবিগণের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা ও প্রীতি একান্ত প্রশংসনীয়। তিনি বহু গ্রন্থকারকে অর্থ সাহায্য দ্বারা তাঁহাদের গ্রন্থ প্রকাশে সহায়তা করিয়াছেন। এ-বিষয়ে অনেক গ্রন্থকারই অবিনাশচন্দ্রের সাদর সহানুভূতি ও প্রেরণা লাভ করিয়াছেন। 'চুণ্টা প্রকাশ' নামে একখানি পত্রিকাও তাঁহার অর্থানুকূল্যে এবং সহানুভূতিতেই কিছুদিন প্রকাশিত হইয়াছিল।

সাহিত্যসেবিগণের প্রতি শ্রদ্ধা ও সাহায্য

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদের নিকট ব্যবসায় বাণিজ্য এবং শ্রম-শিল্প সম্বন্ধে যে বক্তৃতা দেওয়ার ব্যবস্থা করেন, তাহাতে অবিনাশচন্দ্র "Insurance As A Career" সম্পর্কে যে বক্তৃতা দিয়াছিলেন, আমরা এখানে সেই চিন্তাপূর্ণ প্রবন্ধের কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম। তিনি তাঁহার সুচিন্তিত বক্তৃতাটিকে নিম্নলিখিত কয়েকটি অংশে বিভাগ করিয়া লইয়া অতি সুন্দর ভাবে বিশ্লেষণ করিয়াছিলেন, পাঠকগণ বক্তৃতাটি পাঠ করিলেই তাহা উপলব্ধি করিতে পারিবেন। আমরা তাহার কতক অংশ উদ্ধৃত করিলাম।

বেকার সমস্যার সমাধান ও জীবন বীমা

INSURANCE AS A CAREER

MR. PRESIDENT AND DEAR STUDENTS,

I am extremely thankful to the Information and Appointment Board of the Calcutta University, and particularly to its distinguished Chairman. and our erstwhile illustrious Vice-Chancellor. *Dr. S. P. Mookerjea, for giving* me this opportunity of addressing you on a subject, which is very dear to my heart, *viz.*, insurance and the scope it offers for a career in life. I felt greatly honoured by this invitation. But it was not without some trepidation on my part that I ventured to come within the precincts of this great seat of learning to relate to you my experience of one particular sphere of our humdrum work-a-day world. What prevailed upon me to come here to-day was the thought that if my discourse would in any way assist my young friends in choosing an avocation in life. I will have done something, however little, in helping to solve a problem which has been occasioning grave anxiety as much to the Government as to all of us—I mean the problem of unemployment among our educated youngmen.

I am very happy indeed to be able to speak on the subject of insurance. For it is insurance, which has given me my business career, and enabled me to achieve the little success that I have gained in life. And what I know of insurance is the result of my long association with an insurance organisation, which ranks amongst the foremost Indian concerns of the day. Like so many other institutions, the company, which I have the privilege to represent, was started on a very modest scale. Commencing its business with a paltry capital of about ½ lakh, it has, by

dint of honest and efficient dealings with the public and sound management, accumulated to-day a fabulous insurance fund of over Rs. 5 crores. Its average new annual business during the first quinquennium hardly exceeded Rs. 12 lacs. But so soundly has the institution developed, that the company was able to write an average new annual business of over a crore and 60 lacs during the last quinquennium. This progress, however, is in keeping with the advance made by many other Indian companies, including a few sponsored in Bengal, and testifies to the phenomenal growth of Indian insurance business during the last few decades. I will not take your time with the details of my reminiscences for the last four decades—my experiences of the various trials and tribulations and my personal efforts and contributions in building up a big institution from a very small beginning. I will only relate to you to-day the opportunities of employment in the insurance business, and some of the conditions necessary for attaining success, And if these experiences of an old man who is at the threshold of his 70th year, will ever be of any use to you in shaping your future course of life, I shall consider myself very fortunate indeed.

University.

Before I take up the subject-matter of my discourse, I should like to say a few words about our University as it has often pained me to hear this cherished institution most unjustifiably held responsible for the backwardness of youngmen in business careers. The achievements of the Calcutta University in the realms of literature, science and arts are known all over the world. It has produced savants and thinker of the highest order in various walks of life, and of whom any nation may feel legitimately proud. I know it is not necessary to cite names of our world-renowned scholars and scientists generally, for they

কন্যা স্বর্গীয়া মাধুরী দেবী, জন্ম ১৩০৬ বাংলা ২৬শে
আশ্বিন, ইংরাজি ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দ ১২ই অক্টোবর
মৃত্যু ১৯১৫, ইংরাজি ১২ই জুলাই, বাঙ্গালা ১৩২২ সন

are so many. Many are the sons of our Calcutta University who have attained singular eminence, even without the aid of foreign education, as great educationists, unrivalled jurists, renowned physicians, world-famous philosophers and literary seers.

To the towering personality of Sir Asutosh, one of the greatest educational reformers, this University owes a deep debt of gratitude. For, his bold move in popularising higher education and introducing Post-graduate Research Scheme, has yielded a very rich harvest. Further, he and his equally illustrious son, Dr. Shyamaprosad, have rendered a signal service to the children of the province by removing a serious handicap encountered in a foreign language that has so far been the medium of instruction.

In view of the achievements of this University, the charges often brought against it are either misinformed or unjustified. I doubt if any other university under a similar constitution, and in a land which for centuries has been under foreign domination, could have made greater progress, or more promptly and quickly met the changing demands of the time than has been achieved by the University of Calcutta. It is true that in its earlier career it concentrated its attention mostly on Arts and Law for a pretty long time, but it is also true that its alumni have adorned every sphere of cultural, social, economic and political life of not only Bengal but more or less of every other part of India for more than half a century.

No sooner has the University realised the necessity of diverting the attention of the students and youths of Bengal towards commercial careers than they introduced "The Appointment and Information Board" to take effective steps in the matter. Undoubtedly these Career Lectures dealing with various problems connected with Commercial, Industrial and Agricultural developments of the province should place very useful information before

our youngmen. Very often our views are clarified by inter-change of ideas. These lectures will at least help to infuse a business-mindedness amongst our youngmen and remove the false notion that service is preferable to a career in Trade and Commerce. Recently Bengalees have evinced a keen desire to take more and more to commercial occupations. But progress has been checked at every step for want of proper knowledge, commercial education or sufficient capital or banking facilities. All the same I am optimistic about ultimate success. The political salvation of the nation also depends in a very real sense on its economic development. For, a nation of starving and needy millions can hardly fight for freedom consistently and determinedly.

Unemployment is unquestionably one of the most dangerous of social diseases. It is a great menace to humanity, There is a large number of our graduates who are willing to work, but find no opportunities to do so. This is undermining the fabric of our society. There is no denying the fact that our younger generation has to struggle against severe disadvantages. Further their present-day education often ill-equips them to earn a decent living, and in many cases to earn a living at all. A great crisis faces the country. Our youngmen should be encouraged to exploit the wider fields in Commerce and Industry for a living. Now that the question of career for our youngmen has become almost all-absorbing I foresee a period of brisk industrial activity ahead of us. It is, therefore, incumbent upon our youngmen in the University not to rest satisfied with mere academic laurels, but to apply themselves to the task of acquiring practical knowledge as well If there is dearth of opening there is also dearth of suitable candidates to hold responsible positions in trade and commerce.

। প্রতিভা দত্ত

Brief History Of Insurance

Before I proceed to discuss the real aspects of to-day's discourse, it is perhaps necessary that I should tell my young friends something about the history of Insurance business. Generally, Insurance is a contract according to which a company, in consideration of payment of a paltry sum of money called premium, is liable to indemnify the insured or his successor against pecuniary loss that may occur by death, illness, accident, unemployment, fire, burglary, shipwreck and similar elements of uncertainty to which a human being is liable. It is based on the co-operative principle to cover a mishap that may happen to any one of the contributing members—the necessary fund being raised from among all the assured for the benefit of all concerned. By the very nature of the basic principles of this business it stands for all—it obtains help from those who are in a position to help and brings succour to others who are in need of such assistance. It is perhaps the only business which combines social service with suitable means of livelihood.

There are various branches of Insurance business, the main divisions of which are Life, Fire, Marine and Accident. I would not like to go deep into the origin and history of Insurance. I will only mention that the germ of Insurance originated as far back as 3 centuries prior to Christian Era from the motive of protecting import and export business, loss of lives of merchants and captains of merchantmen as well as of ships from brigandage and perils of the seas off Babylon. In England too, even during the time of Anglo-Saxons similar necessity was felt and Guilds were formed for the same purpose. Thus the germ of Insurance, which originated in meeting the perils of the seas, was gradually extended, with the expansion of civilization, to cover loss of not only marine but of

human life and every kind of property that comes to a man's possession, against nature's vicissitudes. Since the collection of datas and tabulation of Mortality Charts from the birth and death Registers and Investment Returns in Europe over a century and a half ago and the introduction of Actuarial Science and establishment of Institute of Actuaries in London and some other Western cities in the middle of the nineteenth century, the progress of Life Insurance business in the Western countries has been almost phenomenal

Insurance In India

About sixty years back a few English companies monopolised whatever insurance business was available among the Indians and there is no denying the fact that these companies paved the way for the great progress that is noticeable now in the field of Life Insurance in India. Although the foreign Life companies are not now making so much headway among the Indian Insurance public, the credit for giving an impetus to Life Insurance in India must be given to them. They still retain almost a monopoly of other kinds of Insurance, such as, Marine, Fire, Accident, etc.

It is less than a century that the first Insurance company was registered in India and also a few Pension Funds for the exclusive benefit of British officers and Christian missioanaries and the widows of Government servants. The credit of starting the first Indian company open to the general public irrespective of colour and creed, goes to "Bombay Mutual" which was established in 1871. It was followed by "Oriental," and "Empire" in Bombay, "Bharat" in Lahore, and "United India" in Madras. Although Bengal was a few years late in following suit, it has more than made up the lag by the highly successful 'push' its early companies, Hindusthan Cooperative and

National Insurances have made. There are many good and indifferent companies since established in Bengal some of which are working their way up, and will, I hope, eventually achieve as much sucess as the older companies have done.

Coming to general Insurance business, such as Fire, Marine, etc., the bulk of the business is still in the hands of non-Indian concerns. During the year 1936 the total premium income from non-life business in India amounted to Rs. $2\frac{3}{4}$ crores of which the shareof Indian companies was Rs. $\frac{3}{4}$ crore. I believe, there is tremendous scope for the development of non-life business in India. Very few people among us hold Fire Insurance policies against their houses, and even among traders only a small percent-age of the people holds such covers. In Marine Insurance, there is very good scope for immediate development of Insurance in connection with motor vehicles and country-boats, while in regard to personal accidents, I think, the scope is practically unlimited. If we take into consideration other kinds of business, such as Burglary Insurance, Hailstorms and Cattle Insurance, etc,, I think, I can safely declare that we have still very great possibilities in these lines.

Unemployment And Career In Insurance

I will now say a few words about the contribution made by the business of insurance towards alleviating the tragic distress which obtains among the educated middle classes. I refer to the problem of unemployment among this section of the population, and to its ugly social and political consequences. Our youngmen have been unusually hard hit by the narrowing, for various reasons, of those spheres of Government and other services, as well as various professions which for over a century were almost their exclusive preserves. And the situation has been further aggravated by the fact that there has not been a

commensurate development in the country of trade, commerce and industry to absorb our unemployed youth. It is, therefore, imperative that we should all pool our resources and exercise our minds to explore every avenue of possible employment, so that the clouds of gloom and despondency which now ominously hang over our educated youngmen may be lifted. It is my purpose to-day to indicate what insurance can do in this direction.

To those who complain of lack of capital to start business, the Insurance Agency business can be pointed out as an ideal occupation. For success in the line, no long and intensive training or heavy expenses are required as in the legal, medical, engineering and similar other professions. nor is there any painful period of waiting, as in many other lines, even after being fully qualified, An Insurance Agent starts earning from the very first day he puts in his first case. The larger the sums assured through his influence, the larger is his immediate income, while the recurring income from the renewal commission in regard to life business swells his account and forms the nucleus of a pension in old age. Any person with moderate education, perseverance, self-confidence and pleasing manners can within a few years achieve good success and secure for himself an independent position. If it is contended that there is competition, it may be said that the field for expansion of the business is also unlimited. If millions have already profited by insurance, there are millions more who can still do the same.

Insurance companies are always eager to obtain the services of capable and efficient men. And the opportunities to steadily rise to more responsible and remunerative position are very large nowadays. There is hardly any other profession which is so honourable, so potent of good, not only to the individual but also to the community at large. Further, no capital is required, no risks have to

be undertaken and there is no waiting period. And to crown all, it is a vocation with a social purpose, *viz.*, the education of the public in the virtues of thrift, foresight, economic independence and selfrespect.

I have prefaced my remarks regarding a suitable career in the Insurace line with a picture about the prospects of an agent, because I feel that this is the line which can be very easily taken up by our youngmen without any capital and also because of the fact that in many cases it is necessary that Insurance Agency should be the starting point in the ladder which one has to climb to reach to yet higher and more responsible occupations. There are sill other avenues in the Insurance world, whose full exploitation will, I hope, provide many of our youngmen with employment. I may enumerate the more important among these.

First, there is the demand for executives, assistants and clerks to run insurance offices. Youngmen with education, energy and vision who are capable of filling executive positions may always count on securing a good berth in the insurance business. To rise to the top, however, it is generally to begin at the bottom. It is only in exceptional cases that a person can aspire to reach the top at the very start. If, therefore, a person has to start life as a clerk, or an assistant or a mere agent in the insurance business, he should not feel discouraged, but should work hard, gather experience, extend his knowledge by diligent study. If he does all this, he may be sure that he will slowly, but nevertheless surely, rise in life. Unfortunately, our youngmen are very often satisfied with the work they are able to obtain and do not exert to qualify themselves to improve their position. A sort of 'divine discontent'

would therefore be a helpful trait in the youngmen's character.

There is another very important in the insurance line, *viz.*, that of the expert, who in our parlance, is known as the Actuary. He is the friend, philosopher and guide of insurance business. He is the person to whom the insurance company looks up for advice with a view to steer clear of the many pitfalls which beset the field of insurance business. One has to undergo a rigorous test to become a qualified Actuary. Nobody without special aptitude in mathematics and statistics should go in to qualify as an Actuary. The examination is very stiff and it takes about six years to qualify as a full-fledged Actuary. But once a person has qualified as such, he is sure to obtain a very decent employment. The scope of employment in this line is still wide, and the prospects bright.

Life Insurance provides yet another professional class with ample opportunities for earning decent income. I refer to the medical profession. Not only do insurance companies retain the services of doctors on the permanent staff as their medical officers and advisers, but many doctors all over the country earn good income by examining proponents for insurance. Careful medical examination and correct assessment of the vitality of each proponent for life insurance is one of the most important factors in Insurance.

I think I have said enough to demonstrate that insurance offers ample opportunities for employment to our youngmen. It is difficult to make an estimate of the number of people actually employed in or earning their living by direct or indirect association with the insurance business. But I think I shall not be far wrong if I place the figure at about a quarter of a lac in Bengal. Since

Indian Insurance is still in its infancy, I am sure that, with its future progress and expansion, even still wider opportunities will be opened up.

I have no doubt that to a man of ability and character, the prospects in the Insurance line are bright. The beginners may have to undergo a considerable amount of drudgery to adapt themselves more fully to the line they have chosen as their vocation. But this is unavoidable in almost every sphere of life. The chances, however, of rising to the top is so great in the insurance business that the novice should patiently bear with the period of initial apprenticeship.

Young Bengal

Standing in the midst of our young hopefuls, I cannot resist the temptation of saying a few words about the ambitions and difficulties of our young Bengal. As he has achieved laurels after laurels in various fields of cultural, political and economic enterprises, so there is no reason whatever why he should not be able to take more and more to commercial career, now that he has realised that his goal lies in exploring the possibilities of finding useful career in various branches of Trade and Commerce. As the ground is being cut from under his feet in every walk of life, he is bound to make a determined effort to overcome all obstacles in the way of success in business. If he really lacks dignity for labour and enterprise as he is repeatedly charged, let him prove that he can even under most unfavourable circumstances, earn a living and that no work is too small for him and that by honesty of purpose and wholehearted devotion to his duties he is capable of improving his position. Most of the successful businessmen of every country started work in a small way and

they availed themselves of every opportunity that presented itself and it should be remembered that opportunities are often created by successful men. Where there is ambition, common sense and determination to succeed, success is a certainty—not even lack of capital is a bar.

It may be that we have not yet achieved any remarkable success in Commerce and Industry. The little industrialisation that the Bengalees have to their credit so far, is however, enough not to make us despondent, considering that they came late in the field. I have therefore the optimism to think that Bengalees will soon show the requisite self-sacrificing energy, practical enthusiasm and constructive idealism to catch up the go-aheads and take more and more to commercial careers and gradually reach the topmost rung in every sphere of commercial and industrial life.

One matter, however, demands consideration. Individual efforts, however brilliant cannot change the destiny of the commercial and industrial life of Bengal. An all-round industrial development requires a supply of honest and efficient workers—manual as well as mental. It is incumbent upon the authorities responsible for our national welfare to provide for the requisite training. Above all, primary education should be made compulsory for both boys and girls ; and there should be ample facilities for technical and technological education. This will increase the capacity for work in every sphere of social life and awaken the minds of the people to the need for higher standards of living and thus create a motive power for developing the resources of the country.

Standing here before my young friends I feel inclined to say a few words about character-building. I want them to avoid a slavish imitation of western ways as well

as a dogmatic acceptance of all that is Indian. We should try to imbibe western habits that are conductive to progress, such as a sense of duty, patriotism and love of liberty. On the other hand, we should not forget the Indian ideal of happiness through service and sacrifice, and our emphasis upon bodily discipline and spiritual outlook on life.

Prospects of Commercial Career

My young friends may naturally ask me, "What are the prospects in Commercial Career?" It is so very difficult to answer the question as the success and its scope depend entirely on the person who seeks the Career. From my experience I should say that a consuming passion for work (be the same congenial or not), ambition to get on, common sense, watchfulness in money matters, general education and a sense of fairness and honesty are essentials for success in business. The greatest defects of the Bengali character that stand in the way of complete and continued success in trade are, so far as I can see, unwillingness to do the ground-work which necessarily is tedious and to do the same with utmost economy, want of level-headednes and attempts to get quick result. Never take a rosy or a pessimistic view of a problem till its ins and outs are throughbly considered from different angles. One is bound to make mistakes in business as in other spheres of life—let not such mistakes worry you much. When an honest mistake is made, find ways and means to minimise its evil effects. In business one is bound to experience ups and downs. Do not get too much elated when you make a sudden success nor get disheartened on a reverse. Unlimited patience is necessary to avoid a crushing defeat in business.

The main object in business is to make a living and to make money by legitimate means, but avarice is a great drawback in business as it may lead to utter ruin. Theoretical knowledge and specialised commercial training are of very great use in every line of business but without experience and practical sagacity one is bound to be led astray. The combination of both is indispensable to success. It is necessary to cultivate the habit of clear thinking and of coming to correct decisions quickly in all matters. I don't see any reason why one should lose heart if one has to start from the lowest rung of the ladder. If he has the will and is willing to pay the price for it, he is bound to steadily work his way up. Even lack of brilliancy may be easily overcome by perseverance and common sense. Above everything, the secret of success, as I can testify from my own experience, lies in one's desire and determination, not only to perform the duties entrusted to him in a perfect manner, but to create an impression all round, by his equipment and character—that he is fully qualified and prepared to hold a much higher position of trust and intelligence in any of the upper rungs of his ladder.

In the midst of so many University students who are on the threshhold of their life's career, I cannot resist the temptation of adding a few words to impress upon them that they should not so exhaust themselves during their student life, as to find themselves bereft of all reserve force both physical and mental to fight the life's battle afterwards. Body and intellect should be equally developed. Good health is no less important than intellect for success.

When all is said and done the fact remains that one's salvation depends to a great extent, if not wholly, on his

individual efforts. Life's battle must be fought and won; the struggle, though at times painful brings out his latent qualities and makes him confident of his goal.

Thanking you, gentlemen, once again for the patient hearing you have given me.

অবিনাশচন্দ্র যেমন বাঙ্গালাদেশের ও বাঙ্গালী জাতির কথা সার্ব্বজনীন ভাবে চিন্তা করিতেন, তেমনি স্বজাতির প্রতিও ছিল, তাঁহার অসাধারণ অনুরাগ ও প্রীতি, কিন্তু তাহাতেও কোনরূপ অনুদার ভাব ছিলনা।

বৈদ্যবান্ধব সমিতির বার্ষিক অধিবেশন ২৬শে বৈশাখ ১৩৪৪-১৯৩৭ ৯ইমে

বাঙ্গলা ১৩৪৪ সালের এবং ইংরাজী ১৯৩৭ সালের মে মাসে, 'বৈদ্যবান্ধব সমিতির' বার্ষিক সম্মিলনী সভায় অবিনাশচন্দ্রকে সভাপতির পদে বরণ করা হয়, তিনি সেই সভায় যে অভিভাষণ প্রদান করেন, তাহার মধ্যে বৈদ্যজাতির প্রতি তাঁহার যেরূপ অনুরাগ প্রকাশ পাইয়াছিল—তেমনি এই জাতির উন্নতি কল্পে অবিনাশচন্দ্র যে কত গভীর ভাবে চিন্তা করিতেন তাহাও দেখিতে পাই। আমরা এখানে সেই অভিভাষণটির ও কিয়দংশ প্রকাশ করিলাম।

অবিনাশচন্দ্র বলেন :

শ্রদ্ধাস্পদ সভ্যবৃন্দ ও উপস্থিত
ভদ্রমহোদয় ও মহিলাগণ,

আমাদের এই শুভ-সম্মিলনে সর্ব্বাগ্রে সর্ব্বমঙ্গলের আধার, সকল জীবনের আলোক এবং সকল কার্য্যের সিদ্ধিদাতা মঙ্গলময় পরমেশ্বরের পবিত্র নাম স্মরণ করিতেছি।

অদ্যকার বৈদ্যসম্মিলনীতে আমা হইতে নানাপ্রকারে যোগ্যতর অনেক মহাশয় ব্যক্তি উপস্থিত থাকা সত্বেও আমাকে সভাপতি নির্ব্বাচিত করায় আমি নিজকে অতিশয় গৌরবান্বিত মনে করিতেছি এবং আপনাদের নিকট আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। যদিও জানি যে এই গুরু দায়িত্বের জন্য আমি সর্ব্বতোভাবে উপযুক্ত নই, তথাপি আপনাদের প্রীতির আহ্বান—বিশেষতঃ আমার উৎসাহী বন্ধু শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ সেন মহাশয়ের অনুরোধ আমি নতশিরে গ্রহণ করিয়াছি। আপনাদের সকলের সহানুভূতি ও শুভাকাঙ্ক্ষা আমাকে যোগ্যতা প্রদান করিবে, আমার এই ভরসা।

আমাদের অগ্রণী যে সকল মনীষী ২০।২২ বৎসর পূর্ব্বে এই অনুষ্ঠানের সর্ব্বপ্রথম সূচনা করেন, তাঁহাদিগকে আমাদের প্রাণের শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার অর্ঘ্য কৃতাঞ্জলিপুটে অর্পণ করিতেছি। তাঁহাদের কেহ কেহ আজ ইহজগতে নাই, তাঁহাদের বিদেহ আত্মা আমাদিগকে এই উৎসবে অনুপ্রাণিত করুক। আমাদের এই প্রতিষ্ঠানের কল্যাণকামনায় যে সকল কর্ম্মী চিন্তা, অর্থ ও সহানুভূতি দ্বারা উত্তরোত্তর ইহার শ্রীবৃদ্ধি ও পুষ্টিসাধন করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে আমাদের সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা অর্পণ করিতেছি। এই সমিতি বৈদ্যগণের মিলনের কেন্দ্রস্থল। এরূপ প্রীতিসম্মিলনে পরস্পরের মধ্যে আলাপ-পরিচয়ে ও ভাবের আদান-প্রদানে সকলের মধ্যে সৌহার্দ্দ স্থাপনের সুযোগ হয়।

সমগ্র বঙ্গীয় বৈদ্যসাধারণের মধ্যে পরিচয়, সদ্ভাব ও একতা প্রতিষ্ঠা, এবং বৈদ্যসন্তানগণ যাহাতে সুশিক্ষিত হইয়া স্বাবলম্বী হইতে পারে এবং বৈদ্যজাতির আর্থিক উন্নতির সহায়তা করিতে
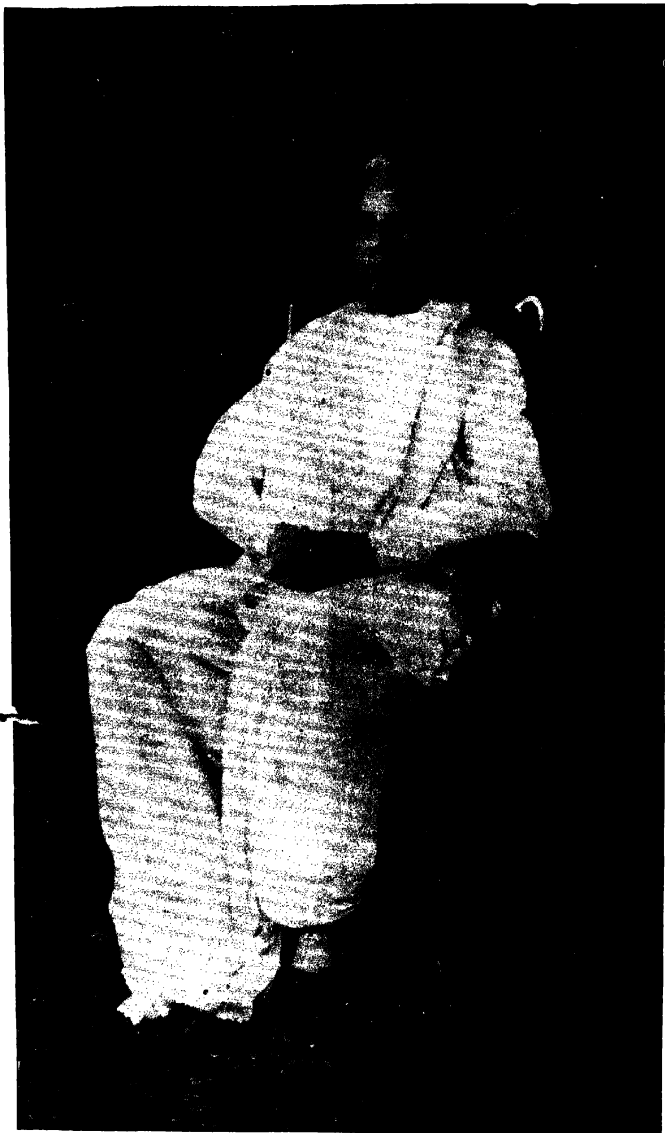
প্রৌঢ় বয়সে অবিনাশচন্দ্র সেন

সক্ষম হয়, তাহাই সমিতির মুখ্য উদ্দেশ্য। আমাদের দেশে বর্ণগত ও সাম্প্রদায়িক মতভেদ বিশেষভাবে বিদ্যমান আছে, এবং একের প্রতি অপরকে বিদ্বেষভাব উদ্গীরণ করিতে দেখা যায়। কিন্তু আমাদের এই বৈদ্যসমিতি উহার স্থাপনাবধি যে মূলমন্ত্র গ্রহণ করিয়াছেন তাহা হইতেই পরিষ্কাররূপে প্রতীয়মান হয় যে, বৈদ্যেতর সমাজের প্রতি কোন প্রকার বিদ্বেষভাব পোষণ না করিয়া আপন সমাজের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতিসাধন করাই ইহার চিরন্তন প্রথা। দেখা যায় যে, এই সমিতি স্থাপনকালে যদিও বর্ণভেদের কঠোরতা শিথিল হইতে আরম্ভ হইয়াছিল, তথাপি বর্ণবিশেষের গণ্ডির ভিতর আবদ্ধ সভাসমিতি দ্বারা বিভিন্ন বর্ণমধ্যে অসদ্ভাবের সৃষ্টির আশঙ্কার কথা সমিতির প্রতিষ্ঠাতৃগণ বিশেষভাবে বিবেচনা করিয়াই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। বৈদ্যগণের যে সম্মিলনীতে এই সমিতি অনুষ্ঠিত হয়, তাহার সভাপতি স্বদেশপ্রেমিক ও ওজস্বী বক্তা স্বর্গীয় অম্বিকাচরণ মজুমদার মহাশয় নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন যে, অন্য বর্ণের প্রতি বিন্দুমাত্র বিদ্বেষভাব না রাখিয়া স্বকীয় বর্ণের ও সমাজের সর্ব্বপ্রকার উন্নতির চেষ্টা অবাঞ্ছনীয় নহে। এই বৈদ্যবান্ধব সমিতির এই দীর্ঘকালের কার্য্যবিবরণী আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, তাহার সভ্যগণ দৃঢ়ভাবে এই মূলনীতি অনুসরণ করিয়া সমিতির সর্ব্বপ্রকার কার্য্য পরিচালনা করিয়া আসিয়াছেন এবং বৈদ্যগণের স্বাভাবিক সহৃদয়তা ও উদারতা কখনও এ সমিতিকে বিপথগামী হইতে বা দেশের বা বিভিন্ন সমাজের অকল্যাণকর কোন চিন্তা পোষণ করিতে দিবে না, ইহা আমার দৃঢ় বিশ্বাস। দেশের

সমিতির উদ্দেশ্য

বর্ত্তমান শোচনীয় অবস্থায় দেশের ও বাঙ্গালার বিভিন্ন সমাজের ও স্তরের সকলের মধ্যে একতা স্থাপনের প্রচেষ্টা প্রত্যেক বাঙ্গালীরই কর্ত্তব্য এবং আমাদের সমিতি নিজ সমাজের উন্নতিকল্পে বদ্ধপরিকর হইবেন, ইহা স্বাভাবিক—কিন্তু সভ্যগণ দেশের সর্ব্বপ্রকার শ্রীবৃদ্ধিসাধনে ও বিভিন্ন সম্প্রদায়কে একতাসূত্রে গ্রথিত করিতে কখনও বিমুখ হইবেন না তাহা নিশ্চিত। নিজের পরিবারের, প্রতিবেশীর ও স্বকীয় সমাজের সর্ব্বপ্রকার উন্নতি সাধন সুধী মাত্রেরই কর্ত্তব্য—তাহা সম্পাদনে পরশ্রীকাতরতার গ্লানি হইতে নিজকে উর্দ্ধে রাখিতে এই সমিতির সভ্যগণ সর্ব্বদা জাগরূক, ইহা তাঁহাদের বৈশিষ্ট্য ও আভিজাত্যের নির্দ্দেশক।

বিগত আদমসুমারীর রিপোর্ট হইতে দেখা যায় যে, বাঙ্গালার বৈদ্যসংখ্যা সর্ব্বসমেত ১,১০,৭৩৯। আপনারা অবগত আছেন যে, বঙ্গের বাহিরেও অনেক বাঙ্গালী বৈদ্য বাস করিতেছেন। মোটামুটি গণনায় তাঁহাদের সংখ্যাও ১৫,০০০ এর কম নহে। ব্রাহ্মণ ও কায়স্থের সংখ্যার অনুপাতে বৈদ্যের সংখ্যা এক চতুর্দ্দশাংশের মত দাঁড়ায়। কিন্তু সংখ্যালঘিষ্ঠ হইলেও আবহমানকাল হইতে বৈদ্যগণের শিক্ষা, দীক্ষা, আত্মমর্য্যাদা জ্ঞান, স্বাবলম্বনস্পৃহা ও মানবসমাজের কল্যাণকল্পে ভেষজ আবিষ্কার ও চিকিৎসাপদ্ধতি প্রবর্ত্তন সর্ব্বজনবিদিত। বৈদ্যগণের একতা, একের অন্যের প্রতি অকৃত্রিম সহায়তা, চরিত্রমাধুর্য্য, সাহসিকতা ও সংস্কৃতি তাহাদের সমাজকে গৌরবময় স্থানে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। বৈদ্যজাতির উৎপত্তি ও তাহার কীর্ত্তি ইতিহাস

বৈদ্যসমাজ

বিখ্যাত। আমাদের পূর্ব্বপুরুষদিগের সদাচার, শাস্ত্রজ্ঞান, ত্যাগ ও পরোপকারিতা সংখ্যায় মুষ্টিমেয় হইলেও তাহাদিগকে গৌরবান্বিত ও সমাজপতি হইতে সক্ষম করিয়াছিল। বহুপূর্ব্ব-পুরুষদিগের অতীত কীর্ত্তি ও বিজয়মাল্য বাদ দিয়াও যদি বাঙ্গালা চতুর্দ্দশ শতাব্দীর আরম্ভ হইতে বৈদ্যসমাজের কার্য্যকলাপ আলোচনা করা যায়, তাহা হইলে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, শিক্ষায় এখনও আমাদের ক্ষুদ্র বৈদ্যসমাজই অগ্রণী। শিক্ষিতের হার বৈদ্যসমাজে অন্যান্য শ্রেষ্ঠ সমাজ অপেক্ষা প্রতি হাজারে ২০০ শতেরও বেশী এবং তন্মধ্যে বৈদ্যমহিলাদিগের শিক্ষিতার সংখ্যা অপর সমাজের তুলনায় দ্বিগুণেরও উপর। এই কলিকাতা মহানগরীতে আয়ুর্ব্বেদীয় জ্ঞান ও গবেষণা এবং চিকিৎসা-নৈপুণ্যে আমাদের জীবনেও ৺গঙ্গাপ্রসাদ সেন, মহামহোপাধ্যায় ৺বিজয়রত্ন সেন, মহামহোপাধ্যায় ৺ দ্বারকানাথ সেন, ৺রাজেন্দ্র-নাথ সেন, মহামহোপাধ্যায় শ্যামাদাস কবিরাজ প্রভৃতি চিকিৎসক-শিরোমণিগণের কৃতিত্বে ও যশঃপ্রভায় সমগ্র বৈদ্যসমাজ গৌরবান্বিত ও ধন্য হইয়াছে। অক্লান্তকর্ম্মী ৺কবিরাজ যামিনী-ভূষণ রায় ও ৺শ্যামাদাস কবিরাজ মহাশয়ের স্থাপিত আয়ুর্ব্বেদীয় বিদ্যালয় ও চিকিৎসালয় দর্শনে কেবল বৈদ্যগণ নহে, সমস্ত বাঙ্গালী জাতি গৌরবান্বিত। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত গণনাথ সেন মহাশয় এখনও পাণ্ডিত্যে ও আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে অপরাজিত। এতদ্ব্যতীত আরও বহুসংখ্যক কৃতবিদ্য বৈদ্যচিকিৎসক আছেন, যাঁহাদের নাম এখানে বাহুল্যভয়ে উল্লেখ করিতে বিরত রহিলাম।

বৈদ্যজাতি শিক্ষা প্রভৃতি বিভিন্ন ক্ষেত্রে বহুমুখী সাধনার

ফলেই বঙ্গসমাজে শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছে। আমি পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি যে, বৈদ্যসমাজে শিক্ষিতের অনুপাত অন্য যে কোন সমাজ হইতে বেশী। তবুও আমি বলিতে বাধ্য যে, আমাদের সমাজ শিক্ষাবিষয়ে এখনও আমাদের আশানুরূপ অগ্রসর হয় নাই। আমাদের মধ্যে বহুলোক এখনও প্রায় নিরক্ষর। প্রায় বলিতেছি এই জন্য যে, বৈদ্যসমাজে পুরুষের মধ্যে সম্পূর্ণ নিরক্ষর আছে কিনা সন্দেহ। সমাজের এক-তৃতীয়াংশের অধিক এখনও রীতিমত বিদ্যাশিক্ষা লাভ হইতে বঞ্চিত। সাধারণতঃ বৈদ্যগণ যেরূপ শিক্ষাপ্রবণ, তাঁহারা সুযোগ ও সুবিধা পাইলে যে তাঁহাদের মধ্যে অশিক্ষিতের সংখ্যা অচিরে একেবারে বিলুপ্ত হইয়া যাইবে, তাহাতে আমার কোন সন্দেহ নাই।

শিক্ষা

শিক্ষাই সমাজের সর্ব্ববিধ উন্নতির সোপান। যে সকল দূরদর্শী মহাশয়গণ আমাদের এই বৈদ্যসমিতি গঠন করিয়াছিলেন ও পরিচালনা করিয়া আসিতেছেন, তাঁহারা ইহা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই দুঃস্থ বৈদ্যগণের শিক্ষাবিষয়ে সাহায্যদান তাঁহাদের কার্য্যসূচীভুক্ত। বৎসরের পর বৎসর আমাদের সমিতি সাধ্যমত এসম্বন্ধে বৈদ্যবালকগণকে অর্থ বিতরণ করিয়া আসিতেছেন। দুঃস্থ বালিকাগণও এ-প্রকার সাহায্য প্রাপ্ত হইতেছেন, তাহার কোন নিদর্শন আমি দেখিতে পাইতেছি না। স্ত্রী ও পুরুষ লইয়া সমাজ। স্ত্রীশিক্ষা জাতীয় শিক্ষার স্বস্তিবাচন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। জাতীয় জীবন ও জাতীয় চরিত্র গঠনের পক্ষে স্ত্রীজাতির প্রভাব ও প্রতিপত্তি অসীম। স্ত্রীশিক্ষার প্রণালী লইয়া সকলে একমত না হইলেও, তাহার আবশ্যকতা
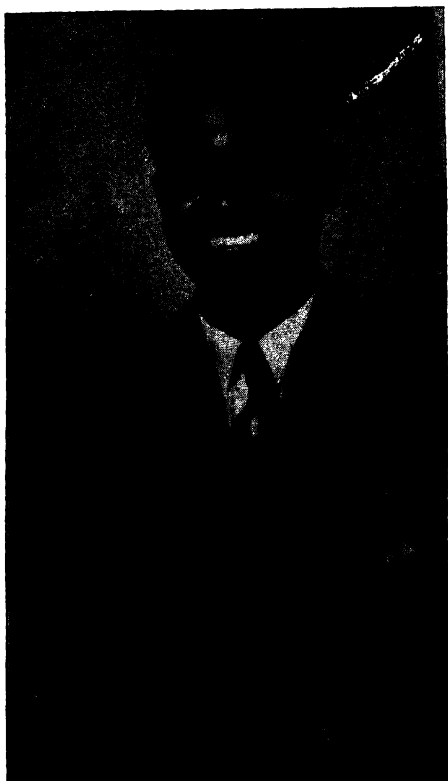
ক্রিকেট টেষ্ট ম্যাচের সর্ব্বপ্রথম বাঙ্গালী খেলোয়াড়
পৌত্র শ্রীমান্ প্রবীরকুমার সেন (মিঃ পি. সেন)

সম্বন্ধে এই বিংশ শতাব্দীতে আর মতভেদ নাই। উচ্চশিক্ষা সকল বালিকার পক্ষে সম্ভব না হইলেও স্বাস্থ্যরক্ষা, শিশুপালন, শিশুশিক্ষা ও যথোপযুক্তরূপে সন্তানকে অন্ততঃ প্রাথমিক শিক্ষাদান এই পরিমাণ শিক্ষা প্রত্যেক বালিকারাই প্রাপ্ত হওয়া একান্ত আবশ্যক। ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, আমাদের মেয়েরা প্রকৃত শিক্ষা ও জ্ঞানলাভ করিলে তাঁহাদের নারীত্ব আরও বিকশিত হইবে, তাঁহারা পরিবারের, দেশের ও দশের সেবায় অধিকতর সমর্থ হইবেন। সাধারণতঃ তাঁহাদের বিবাহিত জীবনই বাঞ্ছনীয়, কিন্তু যদি কোন কারণে তাহা না ঘটে, বা দৈবদুর্ব্বিপাকে অসহায় অবস্থায় পড়িতে হয়, তবে যাহাতে জীবিকা উপার্জ্জনে সক্ষম হন, তাহাও তাঁহাদের শিক্ষার একটি মূলমন্ত্র হওয়া কর্ত্তব্য। যে দিন কাল পড়িয়াছে, তাহাতে আমাদের মেয়েদের আত্মসম্মান, জাতিকুল রক্ষার্থ সুবুদ্ধি, শক্তি ও সৎসাহস সঞ্চয় করা একান্ত প্রয়োজন। আমাদের পূর্ব্বেকার বালিকাগণের শিক্ষালাভের প্রণালী আমূল পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। তাই সমসাময়িক শিক্ষাবিস্তারের ব্যবস্থার আবশ্যক। আদমসুমারীর রিপোর্ট হইতে দেখা যায় যে, বৈদ্যমহিলাগণের মধ্যে প্রায় অর্দ্ধেকই ঈদৃশ শিক্ষা হইতে বঞ্চিত। উর্দ্ধতন সমাজের বহুসংখ্যক বালিকা ও যুবতীগণ বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধিলাভ করিতেছেন, এবং সর্ব্বোচ্চ পরীক্ষায়ও সময় সময় প্রথম স্থান অধিকার করিতেছেন,—ইহা বৈদ্যসমাজের গৌরবের কথা,—কিন্তু সর্ব্বোপরি আবশ্যক, প্রতি বালক-বালিকার প্রাথমিক শিক্ষা। পাশ্চাত্যদেশে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা

নারীজাতির কর্ত্তব্য

প্রবর্ত্তিত হওয়া অবধি তথায় নিম্নস্তরের লোকেরও কর্ম্মতৎপরতা বৃদ্ধি পাইয়াছে। আমাদের বাঙ্গালাদেশে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার আইন পাশ হইলেও কবে তাহা কার্য্যে পরিণত হইবে তাহার স্থিরতা নাই। আমরা গভমে´ন্টকে এ-বিষয়ে বাধ্য করিতে না পারিলেও সমিতির নিজ চেষ্টা দ্বারা দুঃস্থ বৈদ্য বালিকাদের মধ্যে অধিকতর প্রাথমিক শিক্ষাবিস্তারের চেষ্টা করিতে পারি। আবশ্যক মত বৈদ্য মেয়েদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের জন্য সভ্যগণ হইতে বিশেষ চাঁদা আদায় করিতে চেষ্টা করিলে কতক সাফল্যের আশা করা যায়। সকল সমাজেই বালক-বালিকার প্রাথমিক শিক্ষার একান্ত প্রয়োজন। আমার অদ্যকার বিষয় বৈদ্যসমাজ-সংক্রান্ত বলিয়াই বিশেষভাবে বৈদ্য বালক-বালিকাদিগের কথা বলিলাম—সাম্প্রদায়িকভাবে নহে।

বাধ্যতামূলক শিক্ষা

শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে বেকারসমস্যা যেরূপ বিস্তার লাভ করিতেছে তাহা বাস্তবিকই অতিশয় ভীতিপ্রদ। বৈদ্য-সম্প্রদায়ের মধ্যেও ক্ষুধিতের বেদনার অভাব নাই। গভমের্ন্টের শিক্ষানীতি ও আমাদের শিক্ষা-পদ্ধতির সহিত যুবকদিগের জীবনযাত্রার মিল না থাকায় বেকারসমস্যা প্রতিদিন তীব্রতর হইতেছে। বালক-বালিকাগণ লেখাপড়ার সঙ্গে সঙ্গে উপজীবিকা অর্জ্জনের শিক্ষাগ্রহণের সুযোগ পাইলে এ-দুঃখের আংশিক অবসান হইতে পারে। আমাদের মধ্যবিত্ত দুঃস্থ বালক-বালিকারা কুটীর-শিল্প, কৃষি, বয়ন-শিল্প, কারুকার্য্য ও এরূপ কার্য্যকরী শিক্ষার দিকে অধিকতর মনোযোগ

বেকার সমস্যা

দিলে পরবর্ত্তী জীবনে নিজের ও পরিবার প্রতিপালনের পথ প্রশস্ত করিতে পারে। বৈদ্যগণ কিছুকাল যাবৎ নানাপ্রকার ব্যবসায়ে মনোনিবেশ করিয়া সাফল্যলাভ করিয়াছেন,—তাহার উদাহরণ বিরল নহে। ব্যবসা-বাণিজ্য ব্যতীত কোন জাতিই ধনশালী ও শক্তিশালী হইতে পারেনা। বৈদ্যগণের অধ্যবসায় ও বুদ্ধিমত্তা তাঁহাদের সহায়। স্বনামধন্য ডি, গুপ্ত ও কলুটোলার কবিরাজ সেনমহাশয়গণের কীর্ত্তি এখনও বর্ত্তমান। চিকিৎসা-শাস্ত্রে তাঁহারা পারদর্শী ছিলেন সন্দেহ নাই, কিন্তু কেবল রোগী দেখিয়াই কি তাঁহারা এরূপ অগণিত ধন সঞ্চয় করিতে সমর্থ হইতেন? আমাদের এই সমিতির ভূতপূর্ব্ব বাৎসরিক সভার সভাপতি শ্রীযুক্ত আই, বি, সেন ও শ্রীযুক্ত জে, সি, দাসের কর্ম্মকুশলতা ও ব্যবসায়ে সাফল্য আপনাদের অবিদিত নাই। এরূপ লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যবসায়ী বৈদ্যসমাজে আরও দেখা যায়, কিন্তু আমি তাঁহাদের নাম এখানে উল্লেখ করিয়া আপনাদের ধৈর্য্যচ্যুতি করিতে চাহি না।

এই বেকার অবস্থার আর একটি ভয়াবহ দিক আছে। সর্ব্বদেশে ও সকল জাতির মধ্যেই মধ্যবিত্ত শিক্ষিত শ্রেণী, যে সংস্কৃতিকে নিয়া জাতির বিশেষত্ব, তাহা রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। জাতির মস্তিষ্ক শিক্ষিতসম্প্রদায় চলিয়া গেলে সঙ্গে সঙ্গেই সেই সংস্কৃতির বিনাশও অনিবার্য্য।

ভদ্রমহোদয়গণ, এখানে উপস্থিত জ্ঞানবৃদ্ধগণের এবং আশাদীপ্ত যুবকবৃন্দের উপদেশ ও মন্তব্য শুনিবার জন্য আমার ন্যায় আপনারাও উদ্‌গ্রীব হইয়া আছেন। অতএব আমি আর আপনাদের সময় নষ্ট করিতে ইচ্ছা করি না। আপনারা যে

ধৈর্য্যসহকারে আমার কথা শুনিয়াছেন, তজ্জন্য আপনাদিগকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। আমার ত্রুটি বিচ্যুতি হইলে আপনারা আমাকে ক্ষমা করিবেন। আমি বৈদ্যসমাজের যুবকগণকে বলিতে চাই যে, তাঁহারা যেন সর্ব্বদা মনে রাখেন যে, তাঁহাদের শিক্ষার উপরেই স্বজাতির উন্নতি সর্ব্বতোভাবে নির্ভর করে। সমাজের সর্ব্বপ্রকার দুঃখ দূর করিতে, শিক্ষা ও ব্যবসা-বাণিজ্যদ্বারা অর্থ উপার্জ্জন ও সঞ্চয় করিতে, লোকশিক্ষাদ্বারা জনসাধারণের দৈহিক, নৈতিক ও মানসিক উন্নতিসাধন করিতে তাঁহারাই একমাত্র সহায়। সর্ব্বোপরি চাই স্বাবলম্বন শক্তিকে জাগরিত করা ও শারীরিক পরিশ্রমের কাজকে ঘৃণার চক্ষে না দেখিয়া শ্রমের মর্য্যাদা উপলব্ধি করা। আমার মনে হয় আমাদিগকে বাঁচিতে হইলে কালের স্রোতের সহিত আধুনিক ভাব ও মতবাদকে বিচার করিয়া যাহা আমাদের সমাজের পক্ষে শ্রেয়স্কর তাহা গ্রহণ করিয়া যাহা অশুভ, যাহা জাতীয় বৈশিষ্ট্যের প্রতিকূল তাহা নির্ব্বাসিত করিতে হইবে।

শেষ নিবেদন

দশম অধ্যায়

কর্ম্মজীবনে অবিনাশচন্দ্র যেমন নানা দিক্ দিয়া দেশ ও জাতির কল্যাণ বিধান করিয়াছিলেন, তেমনি স্বদেশবাসী বাঙ্গালী জনসাধারণ এবং ত্রিপুরা জেলার অধিবাসী ও বিবিধ প্রতিষ্ঠান হইতেও তাঁহার এক সপ্ততিতম বার্ষিক জয়ন্তী উপলক্ষে বিষম সমরবিজয়ী স্বাধীন ত্রিপুরাধিপতি শ্রীশ্রীশ্রীশ্রীশ্রীযুত মহারাজা মহামহোদয় স্যার বীর বিক্রমকিশোর মাণিক্য বাহাদুর কে, সি, এস, আই মহোদয়ের সভাপতিত্বে কর্ম্মযোগী অবিনাশচন্দ্রকে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান হইতে যে সমুদয় অভিনন্দন প্রদান করিয়াছিলেন, এখানে তাহা প্রকাশ করিলাম। প্রথমে ত্রিপুরা-হিতসাধিনী সভার সদস্যবৃন্দ প্রদত্ত অভিনন্দন প্রকাশিত হইল।

এক সপ্ততিতম বার্ষিক জয়ন্তী-উৎসব ৫ই চৈত্র, ১৩৪৬ বাং ১৯৩৯ ইং

ত্রিপুরা-হিতসাধিনী সভার সভাপতি—
শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র সেন মহাশয়ের—
এক সপ্ততিতম বার্ষিক জয়ন্তী উৎসবে

অভিনন্দন

হে মহাভাগ! আপনার এক-সপ্ততিতম জন্মতিথি উপলক্ষ করিয়া আজিকার আনন্দ-মুখর সন্ধ্যায় ত্রিপুরা-হিতসাধিনী সভার পক্ষ হইতে আপনাকে আমাদের সাদর সম্ভাষণ ও শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করিতেছি, গ্রহণ করিয়া আমাদিগকে ধন্য করুন।

হে কর্ম্মযোগি! সুদীর্ঘ অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে ত্রিপুরা হিত-সাধিনী সভার সভ্যরূপে জেলাবাসীর কল্যাণ কামনায় যে-ব্রত উদ্‌যাপিত হইয়াছে, সিদ্ধিলাভের শুভলগ্ন আজ সমাগত। আপনার কর্ম্মময় জীবনের পরম ক্ষণে আমাদের অন্তরের অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি করিয়া কৃতার্থ হইতেছি।

হে প্রিয় বন্ধু! ত্রিপুরা হিতসাধিনী-সভার সভাপতিরূপে আপনার ত্যাগ ও দানের মহত্ত্বে আপনি মহিমময় হইয়াছেন। আমাদের অভাব-অভিযোগ দাবী ও অধিকারের সকল দায় আপনার উপর ন্যস্ত করিয়া আমরা নিশ্চিন্ত হইয়াছি।

হে কর্ম্মবীর! আপনার নেতৃত্বে আমাদের নির্ভরতা চিরকাল অটুট থাকিবে। পরমেশ্বরের চরণে আপনার গৌরবময় দীর্ঘ জীবন প্রার্থনা করি,—হে মৃত্যুঞ্জয়! দেশ ও জাতির ইতিহাসে আপনি অমরত্ব লাভ করুন।

হে অগ্রগামি! আপনার কর্ম্মপন্থা অনুসরণ করিয়া আমাদের অনুগমন সার্থক হউক, জয়যুক্ত হউক! আপনার মহান্ আদর্শে অনুপ্রাণিত হৃদয়ের সশ্রদ্ধ অভিনন্দন গ্রহণ করুন।

কলিকাতা
৫ই চৈত্র, ১৩৪৬
বাং ১৯৩৯ ইং

আপনার গুণমুগ্ধ
ত্রিপুরা-হিতসাধিনী সভার সদস্যবৃন্দ

TO

A. C. Sen, Esquire

Sir,

On this auspicious occasion of the completion of your 70th birth day, we beg to offer you our most hearty congratulations.

Many are your qualities.

You have treasured a character unblemished, wealth and allurements leave it undefiled. Verily, it shows the Man that you are.

Benevolence is your another good trait. It bespeaks a kind heart. Many are there who will bear testimony to this from their personal experience. Yours is not the benevolence that seeks publicity for its own sake, neither is it undiscerning. It blesses the hand that gives, satifies the hand that receives.

•Yours is affectionate heart. Friendliness is yet your another virtue which does not restrict its limits within narrow surroundings. Kindliness is your special characteristic. No doubt, you are affable and lovable.

In you there is a harmonious blending of softness and firmness. Soft where occasions demand it, firm where duty dictates it. There is, however, no unnecessary manifestation of either.

Your devotion to duty and perseverance are worthy of imitation. These have enabled you to overcome difficulties and attain success.

Your punctuality and moderation give you youthful energy even at your present age.

In business you display those qualities—foresight, industry, accurate judgment, prompt decisions, financial sagacity, shrewd judgment of men and matters which all go to make a keen businessman. No wonder your endeavour has met with success giving inspiration to many to emulate.

Qualities which we fiind epitomised in you naturally call for admiration and praise which we express with all the warmth we can.

May you live long and enjoy serene happiness !

We have the honour to be,

Sir,

Your most obedient servants,

Calcutta, **THE STAFF**

The 18th March of Messrs, **D. M. Das.** & **Sons, Ltd.**

1940, and **National Agency Co., Ltd.**

শ্রদ্ধাভাজন সুহৃত্তম

শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র সেন মহাশয়ের

জন্মদিনে প্রীতিপুষ্পাঞ্জলি

সপ্ততিবর্ষের তুমি হে নব তরুণ
এনেছে উষার আলো নবীন অরুণ
আজি এ প্রভাতে হাসি। এই জন্মদিনে
এনেছে প্রকৃতি হের নব আভরণে
সাজায়ে বরণডালা। শেফালীর রাশি
ঝরিয়া পড়িছে শিরে কি সুধার হাসি
জাগে তাহাদের মুখে। অই শোন দূরে
নিকুঞ্জ প্লাবিয়া গেছে সঙ্গীতের সুরে।
আকাশে সুনীল দীপ্ত প্রফুল্ল তপন
নবীন জীবনধারা করে বরিষণ
তোমারে হে অবিনাশ! কীর্ত্তি অবিনাশ,
হে সৌম্য! দিগন্তে আজি তোমাতে প্রকাশ।

হে কর্ম্মী বীরেন্দ্র, দেশজননীর সেবা,
তোমাতে হ'য়েছে মূর্ত্ত, ধরি নব শোভা।
পল্লীর শ্যামল স্নিগ্ধ সুপারির বনে,
বেণুবনে শিহরণ, কোকিলের গানে
গায় তব কীর্ত্তি-গীতি। শোন আজি তুমি
আশিস্ পাঠায়ে দেছে তব জন্মভূমি
তব দেশবাসী কণ্ঠে, বলে হোক জয়,
হোক্ তব অবিনাশী কীর্ত্তি সে অক্ষয়।

পল্লীবাসিদের কণ্ঠে বালিকার গানে
বধুর সলাজ হাসি আবরি গুণ্ঠনে
জাগায় প্রসন্ন প্রীতি, শত কণ্ঠে ঘোষে
ভালবাসা পাইয়াছ সবে ভালবেসে।

নানা কর্ম্মে থাকি রত, তবু ধ্যান তব
কেমনে সাজিবে শ্যামা পল্লীমাতা নব
সাজে নব গর্ব্বে নিত্য নব সুষমায়,
কেমনে জানাবে তুমি প্রণতি তাহায়।
হে সেবক জননীর, কীর্ত্তি বাঙ্গালার
তোমারে রাখিবে নিত্য হৃদয় মাঝার
আপনার জন ভাবি, তোমার অন্তর
নিত্য চাহে দেশসেবা কল্যাণ সুন্দর।

নারীর হৃদয়ে জ্বালি জ্ঞানের প্রদীপ,
তুমি পরায়েছ তারে দীপ্ত স্বর্ণ টিপ,
উজলি আঁধার মোহে,—কর্ম্মহীন জনে,
তুমি ধ্রুবতারা সম, পথের সন্ধানে
আনিয়াছ হাত ধরি, তুমি ত্রিপুরার
উজ্জ্বল গৌরবমণি,—তুমি বাঙ্গালার
সার্থক বাণিজ্যনেতা, ভারতমাতার
তুমি সুসন্তান. তব দীপ্ত গৌরব মহিমা
ভুলিব না, ভুলিবে না—সেকি শুধু মহত্ত্ব গরিমা
শুধু তব গৃহকোণে, পরিজন মাঝে।

বাঙ্গালার ঘরে ঘরে সে মহিমা রাজে
আজি। লহ দেব, লহ মোর সশ্রদ্ধ প্রণতি
লহ মোর অন্তরের প্রসন্ন ভকতি
তব এই জন্মদিনে।—দেবতার বরে,
শতজীব হও তুমি, পুত্র পরিবারে
বরণীয়—মহিমায় থাকিও অচল,
কনক কিরণ দীপ্ত যেন হিমাচল।

হৃদয় নিঃসৃত তব স্নেহ গঙ্গাধারা
প্লাবনে বহিয়া যাক হয়ে আত্মহারা
ঝরি স্নিগ্ধ সুশ্যামল মরুভু উষরে
প্রসন্ন ফুলের হাসি ফুটায়ে অধরে।
কবি-হৃদয়ের এই ক্ষুদ্রতম বাণী,
এনে দিক আজি নব সঙ্গীতরাগিণী।
যে সঙ্গীতে মুগ্ধ, স্তব্ধ, নিখিল ভুবন
যে সঙ্গীতে সিন্ধু বুকে প্রলয় গর্জ্জন,
যে সঙ্গীতে ফুটে উঠে বিশ্ব-শতদল
তাঁহারি আশিস লও হয়ে অবিচল।

স্নেহমুগ্ধ

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

প্রদত্ত অভিনন্দনের উত্তরে শ্রীযুক্ত সেন মহাশয়ের অভিভাষণ

সমবেত ভদ্রমহিলাবৃন্দ ও ভদ্রমহোদয়গণ!

আজ আপনারা প্রীতি, স্নেহ, ভালবাসা ও শ্রদ্ধার সহিত যে অতুলনীয় আসনখানিতে আমাকে বরণ করিয়া লইলেন, যে সম্মান দান করিলেন, সে জন্য আমি আপনাদের নিকট আমার প্রীতিপূর্ণ হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। যে সকল বন্ধুগণের অক্লান্ত পরিশ্রমে অদ্যকার আয়োজন সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে তাহাদিগকে আমার ধন্যবাদ জানাইতেছি। আমি জানি আমার যোগ্যতা কতখানি, কিন্তু প্রিয়জনের কাছে অনেক সময়েই যোগ্যতা ও অযোগ্যতার কোন বিচার থাকে না; তাই এক্ষেত্রেও আপনাদের অপরিসীম শ্রদ্ধা ও ভালবাসাই জয়ী হইয়া আজ আমার এই জয়ন্তী উৎসব আয়োজনে আপনাদিগকে প্রবুদ্ধ করিয়াছে। এই যে আপনাদের অপূর্ব্ব প্রীতি ও ভালবাসা তাহা যেন আমার জীবনে স্থায়ী রহিয়া আমাকে আপনাদের ও দেশের কল্যাণকল্পে নিয়োজিত করিতে পারে তাহার অপেক্ষা অন্য কিছু কামনা আমার নাই। মানুষের সেবা, জাতির সেবা, আমার নিজ দেশের সেবাই যেন আমার জীবনে সার্থক ও সুন্দর হয়।

আমার জীবনের দুই একটি কথা আজ আমি আপনাদের কাছে বলিব। আপনারা হয়ত অনেকে জানেন না যে কি কঠোর সংগ্রাম, কি সুগভীর শোক-দহন, কি কঠোর শ্রম ও অধ্যবসায়ের ভিতর দিয়া আমার জীবন-যাত্রা আরম্ভ হইয়াছিল

পশ্চাতে দণ্ডায়মান (বাম হইতে) সুধেন্দু, দুর্গামোহন, হরেন্দ্র, সুধীন্দ্র, হীরেন্দ্র। ২য় লাইন—নীলিমা, প্রতিমা, প্রবোধ, অবিনাশচন্দ্র, অময়, উষা, কনক, সুষমা
সম্মুখের লাইনে—অনুপম, কমলা, সুধাময়ী, গিরিবালা (ক্রোড়ে প্রবীর), বাসন্তী (ক্রোড়ে বুমু), রেণু, স্বর্গীয়া সরলা দেবী, রণজিৎ, সুবর্ণ, আরতি। ১৯২৪ সন

এবং কত সাধনার ফলে অবশেষে ভাগ্য-দেবতার প্রসন্ন দৃষ্টি কিয়ৎ পরিমাণে আকর্ষণ করিতে সক্ষম হই।

তারপর কত না সংগ্রাম, কত না প্রতিকূল বায়ুর বিরুদ্ধে অভিযান করিতে করিতে আমার জীবন-তরীখানি আজ জীবনের সায়াহ্নে আসিয়া কূলের কিনারায় পৌঁছিয়াছে।

প্রত্যেক মানুষের জীবনেই এক একটি লক্ষ্য থাকে। আমার জীবনেও একমাত্র কামনা ছিল স্বাধীনভাবে ব্যবসায় ও বাণিজ্য দ্বারা প্রতিষ্ঠা লাভ করিব এবং জীবনের সর্ব্ব বিষয়েই স্বাবলম্বন দ্বারা আপনার জীবনকে গড়িয়া তুলিব। কি শিক্ষা, কি স্বাস্থ্য, কি ব্যবসায় কোন দিক্ দিয়াই আশানুরূপ কিছুই ছিল না। আমার জীবনে যদি কিছু আত্মোন্নতি ও সাফল্য হইয়া থাকে তবে তাহা আমার আজীবন কঠোর সাধনা ও সংযম দ্বারাই সম্ভবপর হইয়াছে। প্রথম জীবনে যে সরকারী চাকুরী গ্রহণ করিয়াছিলাম তাহাতে ভবিষ্যৎ উন্নতির সম্ভাবনা ছিল না এমন নহে, তথাপি আমি উহা পরিত্যাগ করিয়া আমার জীবনের নির্দ্দিষ্ট পথে অগ্রসর হইলাম। সৌভাগ্যক্রমে আমি সে সময় স্বর্গত দুর্গামোহন দাশ মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র ব্যারিষ্টার সত্যরঞ্জন দাশ মহাশয়ের সহিত ব্যবসায়ে যোগদান করি। আমি যখন Empire of India বীমা কোম্পানীর কার্য্যে সত্যরঞ্জনের অংশীদাররূপে অগ্রসর হই, তখন আমাদের দেশের জনসাধারণ দেশীয় বীমা কোম্পানীগুলির প্রতি আস্থা স্থাপন করিতেন না। ফলে বিদেশী প্রতিষ্ঠানগুলির সহিত প্রতিযোগিতায় দেশীয় বীমা কোম্পানীগুলিকে কুণ্ঠার সহিত কাজ করিতে হইত। কিন্তু আমি বিফল মনোরথ হই

নাই; সৎ ও সাধু সঙ্কল্প লইয়া কর্ত্তব্য কার্য্যে প্রাণ ঢালিয়া দিয়াছিলাম।

আমরা বীমা ও চা উভয় ব্যবসায়ই তখন ন্যাশনাল এজেন্সী নাম দিয়া পরিচালনা করিতেছিলাম। কিন্তু আমি যখন বীমা ও চা ব্যবসায়ের ভার প্রাপ্ত হইয়া ন্যাশনাল এজেন্সীতে যোগদান করি তখন চায়ের ব্যবসায়ে অত্যন্ত মন্দা চলিতেছিল। সেই জন্য চা ব্যবসায়ের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়া সত্যরঞ্জন উহা বন্ধ করিয়া দিতে সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। কিন্তু আমি তাহাতে সম্মত হই নাই। সেই সময়ে সেই ব্যবসায়ের মধ্যে প্রাণসঞ্চার করিবার জন্য আমাকে কি পরিমাণ পরিশ্রম করিতে হইয়াছে তাহা বন্ধু-বান্ধবদের অনেকেরই অজ্ঞাত নাই। আজ আমার প্রধান গৌরবের বিষয় এই যে বিগত চল্লিশ বৎসর যাবত Empire পূর্ব্ব ভারতের সর্ব্বত্র পরিচিত হইয়া এক গৌরবময় স্থান অধিকার করিয়াছে। আমার অফিসে বর্ত্তমানে তিন লক্ষ টাকা হইতে ক্রমে প্রায় ৬০।৭০ লক্ষ টাকার বাৎসরিক কাজ সংগ্রহ হইতেছে এবং আমরা নিজস্ব কয়েকটি চা কোম্পানী স্থাপন করিতে সক্ষম হইয়াছি।

আমার এই সামান্য সার্থকতার মূলে মাত্র দুইটি জিনিষ রহিয়াছে। এক মঙ্গলময় জগদীশ্বরের উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করিয়া আমি আত্মশক্তিতে বিশ্বাস করিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়াছি এবং তিনিও প্রতিপদে আমার উপর করুণা বর্ষণ করিয়াছেন। দ্বিতীয়তঃ কোনরূপ কঠোর পরিশ্রম করিতে আমি পশ্চাৎপদ হই নাই। নিজের কর্ম্মক্ষমতাকে বৃদ্ধি করিবার জন্য আমি পরনির্ভরশীল না হইয়া প্রত্যেকটি বিষয় নিজে

সম্পন্ন করিতে যত্নবান্ হইয়াছি। আমি আমার জীবনে কর্ম্মকেই একমাত্র ধর্ম্মস্বরূপ বলিয়া বরণ করিয়া লইয়াছি। আমার বিশ্বাস জীবনের উন্নতির মূলে একান্ত আবশ্যক—ঈশ্বরে বিশ্বাস, সাধুতা, কঠোর পরিশ্রম এবং সূক্ষ্ম পর্য্যবেক্ষণ শক্তি।

আজ আমার জীবন-সূর্য্য পশ্চিম দিকে হেলিয়া পড়িয়াছে। এখন যতই অতীতের কথা স্মরণ করি ততই আমার হৃদয় গর্ব্বে ও পুলকে এই বলিয়া উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে যে বিধাতা আমাকে বন্ধু-সৌভাগ্যে গৌরবান্বিত করিয়াছেন। তাঁহাদের অকৃত্রিম শুভেচ্ছা, তাঁহাদের সহানুভূতি, তাঁহাদের কর্ম্মপ্রেরণা আমাকে সাফল্যের পথ প্রদর্শন করিয়াছে। আজ সেই সমুদয় পরলোকগত ও জীবিত বন্ধু ও প্রিয়জনকে সশ্রদ্ধভাবে স্মরণ করিতেছি।

কিন্তু আমি আপনাদের আজিকার অনুষ্ঠানটীকে ব্যক্তিগত ভাবে নিজের সম্পর্কে অনুষ্ঠিত বলিয়া গ্রহণ করিতে চাই না। এইমাত্র কলিকাতা সহরের বক্ষে শ্রীশ্রীযুত ত্রিপুরাধিপতি মহারাজা মাণিক্য বাহাদুর ত্রিপুরার শিল্প ও চারুকলা প্রদর্শনী উদ্বোধন করিয়াছেন। ইহা ত্রিপুরা হিতসাধিনী সভার পক্ষে একটী স্মরণীয় মুহূর্ত্ত। কোন একটী জিলার প্রতিষ্ঠান জিলা হইতে দূরে থাকিয়া জিলার প্রতি কতটুকু গভীর প্রীতি ও নিষ্ঠা পোষণ করিলে এত অসুবিধার মধ্যে এবংবিধ কষ্টসাধ্য আয়োজনে অগ্রসর হইতে পারে তাহা বাস্তবিকই গর্ব্বের সহিত ভাবিবার বিষয়। এই যে সাহস, এই যে আমার নিজের সব কিছু জিনিষকে কলিকাতার ন্যায় মহানগরীর জনসমুদ্রের চঞ্চল তরঙ্গ-রাজির সম্মুখে উপস্থিত করার আকুল আগ্রহ ইহা আমি অমূল্য বলিয়া মনে করি। আমি দেখিতেছি এই প্রদর্শনীই আমাদের

মুখ্য উৎসব। আমার বন্ধুগণ যেন এই প্রদর্শনীতে দেখাইতে চান যে আমাদের জিলার এই সুপ্রাচীন প্রতিষ্ঠানটীর মধ্যে এমনও কেহ কেহ আছেন যাঁহারা একাদিক্রমে দীর্ঘ পঞ্চাশৎ বৎসর কাল এই প্রতিষ্ঠানটীর সুখ দুঃখ, উত্থান পতনের সঙ্গে নিজেকে সংশ্লিষ্ট রাখিয়াছেন—এই দীর্ঘকাল সভার উদ্দেশ্যে সময় শক্তি ও অর্থ সাধ্যানুসারে অর্পণ করিতে কাতর হন নাই—সভার স্থায়ী কল্যাণ স্বহস্তে করিবার সামর্থ্য না থাকিলেও সভার নির্দ্দেশ সর্ব্বদা নতমস্তকে স্বীকার করিয়াছেন, সভার দ্বারা নিজেকে গৌরবান্বিত বোধ করিয়াছেন। আমি যদি কোন সুখ্যাতির যোগ্য হইয়া থাকি, তবে তাহা এই যে আমি সর্ব্বদাই ত্রিপুরা হিতসাধিনী সভার সহিত আমার সংশ্রবকে গৌরবের বস্তু মনে করিয়াছি, মতের অনৈক্য অথবা নিজের ব্যক্তিগত কর্ম্মব্যস্ততা আমাকে কদাপি সভার কার্য্যক্ষেত্র হইতে দূরে লইয়া যায় নাই, সভার মতকেই আমি শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করিয়া যথাসম্ভব তাহার কার্য্যের সহায়তা করিতে প্রয়াসী হইয়াছি, আমি কখনই ভুলিয়া যাই না যে সভার সম্বন্ধ দ্বারা আমি নিজে উপকৃত হইয়াছি।

ত্রিপুরা হিতসাধিনী সভার কার্য্যধারার সঙ্গে আপনাদের অনেকেই সুপরিচিত। সভা এই দীর্ঘকাল মধ্যে কি প্রশংসনীয় কার্য্য করিয়াছে এই প্রশ্ন মনে উঠে। তাহার সদুত্তর পাইতে হইলে খণ্ডভাবে ব্যাপারটীকে দেখিলে নৈরাশ্যই মাত্র হইবার কথা। কিন্তু সমগ্রভাবে দেখিলে সভার পক্ষে নিরুৎসাহ হইবার কারণ থাকে না বলিয়া আমার বিশ্বাস। উপযুক্ত সময়ে করা হইলে অতি ক্ষুদ্র কাজও মহান্ বলিয়া গণ্য

হওয়ার যোগ্য এবং যথা সময়ে প্রদত্ত অতি সামান্য সাহায্যও বহু কল্যাণের কারণ হয়। এক একটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কার্য্যের সমষ্টি ফল উপেক্ষণীয় নয়। যে-সময়ে স্ত্রীশিক্ষা ব্যাপারে দেশে বিরাট ঔদাসীন্য ছাড়া আর কিছু ছিল না সেই সময়ে সভার বর্ষের পর বর্ষের প্রচেষ্টার ফলে সহস্র সহস্র ত্রিপুরা জিলা-বাসী মহিলার অন্ততঃ সাধারণ শিক্ষার পথ উন্মুক্ত হইয়াছিল সন্দেহ নাই। সকলেই জানেন সংসারের জটিল পথে অগ্রসর হইবার কালে অনেক ক্ষেত্রে এমন সঙ্কট সময় উপস্থিত হয় যে অতি সামান্য অভাব পূরণের পন্থাও সহজলভ্য হয় না—সেই দুঃসময়ের ক্ষুদ্র অভাবটি পূর্ণ হইলে যেন পথিক পুনরায় শতগুণ শক্তিলাভ করিয়া যাত্রাপথে চলিতে পারে। ত্রিপুরার বহু দরিদ্র ছাত্র ও অভিভাবক, দুরবস্থাগ্রস্ত বহু ত্রিপুরার নর-নারী এইরূপ সঙ্কট মুহূর্ত্তে সভার নিকট হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপকার লাভ করিয়া আশ্বস্ত হইয়াছেন। দৈবদুর্ব্বিপাকে বিপন্ন ত্রিপুরাবাসীর জন্য সভার প্রাণে আকুলতা উপস্থিত হইয়াছে—বহু ক্ষেত্রে সভা নানা ভাবে দুর্গতের কষ্ট মোচনে যত্নপর হইয়াছে। সাময়িক উত্তেজনাপূর্ণ একটী বৃহৎ কার্য্যে হস্তার্পণ করিয়া তাহার সুষ্ঠ সমাপন দ্বারা কীর্ত্তি অর্জ্জন করা যায়। সভা সেইরূপ কীর্ত্তিকর কার্য্য সম্মুখে উপস্থিত হইলে তাহাতে পরাঙ্মুখ হয় না—কিন্তু একমাত্র তাহা দ্বারাই জীবনের ব্রত সমাপ্ত হইয়াছে বলিয়া মনে করিতে পারে না। সভার সম্মুখে রহিয়াছে অনন্ত কালের কার্য্য, ক্ষুদ্র ও সাধারণ কর্ম্মবিন্দুসমূহের মধ্য দিয়া সভা তাহার কর্ম্মসূত্র অবিরাম গতিতে প্রবাহিত করিয়া লইয়া যাইতেছে। ধৈর্য্যের সহিত যদি তাহার কৃতকর্ম্মগুলি একত্র গ্রথিত করিয়া

সম্মুখে উপস্থিত করা যায় তবে তাহা চিত্তাকর্ষক হইবে সন্দেহ নাই। ত্রিপুরার সঙ্গে সঙ্গে ত্রিপুরা হিতসাধিনী সভা অমর হইয়া থাকিবে, ইহার বিশেষ বিশেষ কর্ম্মীর আবির্ভাব ও তিরোভাব হইবে, কিন্তু নদী যেমন চিরপরিবর্ত্তনশীল জলরাশির মধ্যেও স্বীয় স্রোতের ধারাটীকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া চলে, তেমনই সভা নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল কর্ম্মিসঙ্ঘের মধ্যেও নিজের বৈচিত্র্যময় অস্তিত্ব অব্যাহত রাখিবে।

আজ আমি ত্রিপুরা হিতসাধিনী সভার প্রতি ত্রিপুরার ছাত্র-বৃন্দের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। ছাত্রগণ ছিল অতীতে সভার প্রধানতম কর্ম্মী। সভা চায় যে ছাত্রগণই ইহার ভবিষ্যতেরও ভরসাস্থল হউক। এমন সময় ছিল যখন ত্রিপুরার ছাত্রগণ অধিকাংশ একই অঞ্চলে বাস করিত এবং অনেকে একই কলেজে অধ্যয়ন করিত। তাহাতে পরস্পরের মধ্যে যোগসূত্র অবিচ্ছিন্ন থাকা সহজ ছিল। এখন ছাত্রগণ কলিকাতা সহরের নানা স্থানে বাস করিতেছে, অনেকে ছাত্রাবাসে না থাকিয়া নিজেদের অভিভাবকদের সঙ্গে থাকিবার সুযোগ পাইয়াছে। এখন ত্রিপুরাবাসী ছাত্রসমূহের পক্ষে সম্মিলনের উপলক্ষ অপেক্ষা-কৃত কম। ত্রিপুরা হিতসাধিনী সভা ত্রিপুরার ছাত্রদের মিলন-কেন্দ্র হইতে পারে। শুধু ছাত্রদের পরস্পরের মধ্যেই নয়, ত্রিপুরাবাসী যাহারা কলিকাতা সহরে নানা-ক্ষেত্রে সুপরিচিত হইয়াছেন তাঁহাদের সঙ্গেও ছাত্রদের যোগ স্থাপন হইতে পারে এই সভার মধ্য দিয়া। ফলতঃ আমার নিজের অভিজ্ঞতা হইতেই বলিতে পারি এইরূপ মিলন ছাত্রদের পক্ষেও অতিশয় বাঞ্ছনীয়। আজ যাহারা ছাত্র দু'দিন পরে তাহাদের ছাত্রত্ব ঘুচিয়া যাইবে

এবং তাহারা কঠোর জীবনসংগ্রামে প্রবিষ্ট হইতে বাধ্য হইবে। সেই সময়ে অনেকেই তাহাদের পূর্ব্বগামীদের সহিত আলাপ পরিচয়ের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিবেন। একটী প্রধান বিষয় ছাত্রদের শিক্ষনীয় আছে যাহা কলেজের অধ্যাপকদের বক্তৃতার মধ্য দিয়া লাভকরা যায় না। সেইটি হইতেছে সাধারণ বিষয়ে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা। ছাত্রগণ অধ্যয়নান্তে যে-পথেই অগ্রসর হউক—কি ব্যবসা, কি কর্ম্মসংগ্রহ, সর্ব্বত্র তাহাদের যোগ্যতা ও সাফল্য পরীক্ষিত হইবে তাহাদের সাধারণ জ্ঞানের পরিমাণ দ্বারা। সভার একটী কার্য্যালয় আছে। বর্ত্তমান সময়ে ইহা কলিকাতার কেন্দ্রস্থল কলেজ স্কোয়ারে অবস্থিত। তাহাতে ৫০।৬০ জনের বসিবার ব্যবস্থা আছে। ছাত্রগণ যদি অগ্রণী হইয়া ইহাতে পরস্পরের মিলনের ব্যবস্থা করে তাহা হইলে সভা নানা বিষয়ে যাহাতে তাহাদের জ্ঞানের বৃদ্ধি হইতে পারে তাহার সুযোগ সৃষ্টি করিতে পারে। সভার নিজস্ব বাসভবন হইলে তাহাতে একটী হল থাকার ব্যবস্থা হইবে—তখন পরস্পরের মিলনস্থল আরও বৃহত্তর হইবে। আমি আশা করি আমার প্রিয় যুবকবৃন্দ এই বিষয়ে আগ্রহান্বিত হইবে। একটি কথা কখনও কখনও শুনা যায় যে ছাত্রগণকে উপযুক্ত সুযোগ দেওয়া হয় না। আমার বিশ্বাস এই কথার কোন ভিত্তি নাই। ত্রিপুরা হিতসাধিনী সভা অপেক্ষা করিয়া আছে ছাত্রগণ দলে দলে আসিয়া ইহাতে যোগ দেউক এবং সভার প্রধান প্রধান শাখাসমূহের ভার স্বহস্তে গ্রহণ করিয়া অধিক বয়স্কদিগের দায়িত্বভার লাঘব করুক।

আর একটি কার্য্যের ভারও আমি তাঁহাদের উপর অর্পণ

করিতেছি। অনেকের শীঘ্রই বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা শেষ হইয়া যাইবে এবং শীঘ্রই স্কুল-কলেজের দীর্ঘ অবকাশ আসিতেছে। এই সময় তাঁহারা পল্লীজননীর স্নেহশীতল ছায়ায় ফিরিয়া যাইবেন। আমি অনুরোধ করি তাঁহারা যেন এই দীর্ঘ অবসর কাল বৃথা নিদ্রা, গল্প ও খেলাধূলায় মত্ত থাকিয়া অপব্যয় না করেন। তাঁহারা মনে রাখিবেন কোন দেশ উন্নতি লাভ করিতে পারে না যদি শিক্ষার বিস্তার না হয়। আমাদের দেশে শিক্ষিতের সংখ্যা মুষ্টিমেয় তাহা তাঁহারা জানেন। নিরক্ষর পুরুষ ও নারীর সংখ্যা শতকরা ৯০টি। এরূপস্থলে নিরক্ষর-দিগকে শিক্ষা দিতে না পারিলে আমাদের দেশের উন্নতি হইতে পারে না। আজকাল পৃথিবীর সর্ব্বত্রই শিক্ষা প্রসার লাভ করিতেছে। ছাত্রগণ যদি নিরক্ষরদিগকে বর্ণজ্ঞান শিক্ষা দেন, তাহাদিগকে নিজেদের জ্ঞান বিজ্ঞানের অভিজ্ঞতা হইতে সহজ সরলভাবে বিবিধ বিষয়ে উপদেশ দেন তাহা হইলে দেশের প্রকৃত কল্যাণ হইবে। মানুষের শিক্ষা এমন হওয়া চাই যাহা তাহার জীবনে কাজে লাগে। আমাদের বাঙ্গালা দেশের অধিবাসীদের মধ্যে শতকরা ৮০ জন কৃষক। সুতরাং তাহাদের কাছে যদি ছাত্রেরা বিভিন্ন দেশের কৃষি-প্রণালীর কথা বলেন তাহা হইলে তাহারা উপকৃত হইবে; এইভাবে শিল্পপ্রধান স্থানগুলিতে শিল্পের কথা, কুটীর-শিল্পের বিষয় ও স্বাস্থ্য সম্বন্ধে উপদেশ দিলে বোধহয় আমাদের দেশের পুরুষ ও নারীগণ স্বাস্থ্যরক্ষা, শরীর পালন, আর্থিক উন্নতি, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ও চরিত্র গঠনের পথ খুঁজিয়া পাইতে পারে। ছোট বড় সকলের কাছে বর্ণপরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গে এই সব বিষয়ের উপদেশ

দিলে এবং সংবাদপত্র পড়িয়া পৃথিবীর বিবিধ সংবাদের সহিত পরিচিত করিলে বিশেষ মঙ্গল হইবে, তাহারা প্রকৃতভাবে দেশকে চিনিবে ও বুঝিবে এবং দেশমাতৃকার সেবায় উদ্বুদ্ধ হইবে। এই মহৎ কাজ সম্পাদনের পক্ষে আমি মনে করি আমার প্রাণপ্রিয়তম ছাত্রবন্ধুগণই আলোকবর্ত্তিকা হস্তে লইয়া অগ্রসর হইতে পারেন।

আজ আমি সভার কর্ম্মী ও যুবকবৃন্দকে দুইটি কথা বলিব। তাহারা যেরূপ অধ্যবসায়ের সহিত আমাদের কর্ম্মানুষ্ঠানটিকে সফল করিয়া তুলিতেছেন সেজন্য আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ দিতেছি। আমার মনে হয় আমাদের এই ত্রিপুরা হিতসাধিনী সভার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। আজ তাহাদের সমক্ষে নানারূপ আন্দোলন ও আলোচনার ঢেউ আসিয়া পড়িতেছে। সাহিত্য, সমাজ, রাষ্ট্র, বিজ্ঞান সর্ব্ব বিষয়েই এই যুগে একটা নূতন আদর্শ ও বিপ্লব দেখা যাইতেছে; এইরূপ ক্ষেত্রে তাহাদের প্রত্যেকটি কার্য্যে বিশেষ ধীরভাবে চিন্তা করিয়া অগ্রসর হওয়া উচিত।

ত্রিপুরা হিতসাধিনী সভার সম্পর্কে আমার আর একটী কথা মনে হয়। নানা উপায়ে অসংখ্য পন্থা দ্বারা লোককল্যাণ সাধন করা যায়। প্রত্যেকে একই প্রকার উপায় বা একই পন্থা অবলম্বন করিবে ইহা সম্ভব নয়। ত্রিপুরা হিতসাধিনী সভা কোন একটী উপায়—কোন একপ্রকার পন্থা নির্ব্বাচন করিয়া লইয়াছে। প্রত্যেক ব্যক্তি যদি এই চায় যে তাঁহার যে মত বা উপায় বা পন্থা মনোমত তাহাই সভার গ্রহণীয় তাহা হইলে তাহার ফল শুভ হইতে পারে না। সভা ৬৮ বৎসর

চলিয়া আসিয়াছে—একটা পন্থা তাহার পক্ষে স্বভাব হইয়াছে—আমি আজ এক কথায় সেই দীর্ঘকালের সংস্কার উড়াইয়া দিতে প্রবৃত্ত হইলে তাহা শুভবুদ্ধিসূচক হইবে না। আমাকে দেখিতে হইবে বাস্তবিক সভার গৃহীত পন্থাও বহুবিধ উপায়ের মধ্যে একটি উপায় কিনা। হইতে পারে তদপেক্ষা সুন্দর উপায় আছে, কিন্তু যতক্ষণ দেখিব যে সভা লোকহিতব্রতেই চলিয়াছে, ব্যক্তিবিশেষের স্বার্থে নিয়োজিত হইতেছে না, ততক্ষণ আমাকে ধৈর্য্যের সহিত অপেক্ষা করিতে হইবে, ক্রমে আমার কাছে যাহা অধিকতর শোভন মনে হয় তাহাতে সভার প্রীতি উৎপাদনের চেষ্টা করিতে হইবে। সভার অনন্ত জীবন, আজ যাহারা সভার কর্ণধার কাল হয়ত তাহারা অদৃশ্য হইয়া যাইবেন। আমি ত্রিপুরার প্রত্যেক নরনারীর প্রতি এই আবেদন জানাইতেছি যে আমরা যেন আমাদের অতি গৌরবের এই সুমহৎ প্রতিষ্ঠানটীকে নিত্য সঞ্জীবিত রাখিবার জন্য যত্নপর হই।

ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ, আমি জেলার একজন সাধারণ অধিবাসী মাত্র। আজিকার এই গৌরব আমার গৌরব নয়—ইহা আমার অতি প্রিয় ত্রিপুরা হিতসাধিনী সভার গৌরব। তাই আপনাদের সম্মুখে দাঁড়াইয়া আমার শুধু ত্রিপুরা হিতসাধিনী সভার কথাই মনে হইয়াছে এবং সভার কথাই বলিতে ইচ্ছা হইয়াছে। আমাদের সভার উৎসাহ চতুর্দ্দিকে প্রেরণা ছড়াইয়া দিতেছে। ইহাতে নূতন কত প্রতিষ্ঠান, কত নূতন কল্যাণসঙ্ঘের সৃষ্টি হইবে। এই উৎসাহ সঞ্চারিত হইয়াছে আমার নিজের কর্ম্মকেন্দ্রে। আমার নিজের অফিসের সুযোগ্য কর্ম্মচারীগণও

এই উপলক্ষে আমাকে সম্বর্দ্ধনা করিয়া আমাকে কৃতার্থ করিয়াছেন। এজন্য আমি তাঁহাদের প্রতি চিরকৃতজ্ঞ থাকিব। তাঁহারা যে অনুগ্রহ করিয়া আমার জিলার আদরের প্রতিষ্ঠানটীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন এবং এই প্রতিষ্ঠানটীর আরব্ধ উৎসবকে কেন্দ্র করিয়াই তাঁহারা আমাকে অন্ত শ্রদ্ধা ও ভালবাসা দান করিয়াছেন তাহাতে আমি অধিকতর সম্মান ও আনন্দ বোধ করিতেছি। তাঁহারা সকলে আমার জিলাবাসী নহেন, স্বতন্ত্র-ভাবে একটী অনুষ্ঠান করার ইচ্ছাকে প্রতিহত করিয়া তাঁহারা এখানে সমবেত হইয়াছেন—এজন্য তাঁহাদিগকে আমি বিশেষ-ভাবে ধন্যবাদ দিতেছি। কার্য্যক্ষেত্রে আমি হয়ত কখন কাহারও কাহারও প্রতি কঠোরতা অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছি, কিন্তু একথা নিঃসংশয়ে বলিতে পারি যে আমার যাঁহারা সহকর্ম্মী তাঁহাদিগকে আত্মজনস্বরূপই সর্ব্বদা মনে করিয়াছি। আমার পক্ষে ইহা একটা গৌরবের কথা যে আমার অফিসে অনেকে কৈশোর হইতে আজ প্রৌঢ়ত্বের সীমায় পৌঁছিয়াছেন এবং অনেকে সুদীর্ঘকাল কাজ করিয়া আজ পেন্সন ভোগ করিতেছেন। ফলতঃ তাঁহাদের বিশ্বস্ত এবং অনুগত কার্য্য দ্বারাই আমার কর্ম্মক্ষেত্রের গৌরব ও আমার জীবনের উন্নতি সাধিত হইয়াছে। এজন্য আমি তাঁহাদের ঋণ কদাপি বিস্মৃত হইব না। হে আমার প্রিয় সহকর্ম্মিগণ, আপনারা সর্ব্বদাই আমাকে শ্রদ্ধার চক্ষে, প্রীতির চক্ষে দর্শন করিয়াছেন, আজ আপনাদের অভিভাষণে যে সমস্ত প্রীতির কথা আপনারা বর্ণনা করিয়াছেন তাহা আমার বৃদ্ধ বয়সে একমাত্র আনন্দ ও উৎসাহের বিষয় হইবে। ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি যে প্রীতি ও স্নেহ

আপনারা আমাকে দান করিয়াছেন, তাঁহার নিকট হইতে আপনারা তাহাই লাভ করুন।

বন্ধুগণ, আজ আপনারা সকলে আমাকে নানারূপে যেরূপ প্রাণস্পর্শী ভাষায় অভিনন্দিত করিলেন, শ্রদ্ধা, প্রীতি ও ভালবাসা জানাইলেন তাহার উত্তরে আমি কি বলিব জানি না। আমার হৃদয় আজ আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়াছে। আপনারা জানেন যেখানে ভালবাসার গভীরতা বিদ্যমান সেখানে ভাষা নীরব। আজ আমার কণ্ঠে ভাষা নাই, আছে শুধু নীরব অভিব্যক্তি। আমি ঈশ্বরের নিকট এই বলিয়া প্রার্থনা করি, তিনি যেন আমাকে আপনাদের প্রশংসার যোগ্যরূপে গড়িয়া তুলেন। আমি যেন আমার অবশিষ্ট জীবনে আপনাদের এমনই প্রেম, ভালবাসা ও শ্রদ্ধার বরমাল্য কণ্ঠে ধারণ করিয়া বিজয় গর্ব্বে জীবনের শেষ দিন নির্ভীকভাবে বরণ করিয়া লইতে পারি। আপনারা আমার সশ্রদ্ধ প্রীতি, নমস্কার, প্রণাম ও আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করুন।

* * * *

আমরা এখানে ত্রিপুরা হিতসাধিনী সভার সভাপতিরূপে অবিনাশচন্দ্রকে তাঁহার জয়ন্তী উৎসব সভা উপলক্ষে যে অভিনন্দন প্রদান করিয়াছিলেন, তদুত্তরে তিনি সুললিত ভাষায় যে সুন্দর সুচিন্তিত অভিভাষণ প্রদান করেন, আমরা পূর্ব্বের কোন কোন অধ্যায়ে স্থান বিশেষে প্রয়োজনবোধে উহার সামান্য সামান্য অংশ উদ্ধৃত করিলেও এখানে তাহা পূর্ণাঙ্গরূপে প্রকাশ করিলাম, ইহা দ্বারা অনেক বিষয়েই তাঁহার চিন্তাশীলতা, দেশপ্রেম, শিশুসুলভ

সরলতা, যুবকের ন্যায় উৎসাহ-উদ্যম ও কর্ম্মপ্রবণতার পরিচয় পাইবেন। দেশের তরুণদের প্রতি যে তাঁহার কত বড় অনুরাগ ও হিত-প্রচেষ্টা ছিল, তাহার পরিচয়ও তাহাতে পরিস্ফুট রহিয়াছে।

পারিবারিক জীবন

অবিনাশচন্দ্র পারিবারিক জীবনে সুখী ছিলেন। সংসার ছিল শান্তিপূর্ণ। তিনি ছিলেন পত্নীবৎসল স্বামী, পুত্র ও কন্যাগণের প্রতি ছিল তাঁহার অসাধারণ স্নেহ ও ভালবাসা। তাঁহার ন্যায় স্নেহশীল পিতা বড় কম দেখা যায়। তাঁহার পুত্রকন্যাগণ সকলেই সুশিক্ষিত এবং পিতামাতার প্রতি চরিত্রপ্রভাবে বিনয়ী ও কর্ম্মনিপুণ হইয়া ব্যবসায়ক্ষেত্রে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীযুক্ত অমিয়কুমার সেন বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পর হইতে, নিজেদের ব্যবসায়-বাণিজ্য অত্যন্ত কৃতিত্বের সহিত পরিচালনা করিতেছেন। দ্বিতীয় পুত্র শ্রীযুক্ত প্রবোধকুমার সেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বি. এ. পরীক্ষায় পাশ করিবার পর, বিলাত যান এবং সেখান হইতে L. L. B. পরীক্ষায় কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতা হাইকোর্টে ব্যারিষ্টারি করিতেছেন। তাঁহার তৃতীয় পুত্র শ্রীযুক্ত অনিলকুমার সেন

পুত্র ও কন্যা

সিনিয়র ক্যাম্ব্রিজ অবধি অধ্যয়ন করিয়া নিজেদের ব্যবসায়ে নিযুক্ত রহিয়াছেন। কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ অনুপম সেন এম. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

অবিনাশবাবুর চারি কন্যা। সকলেই উচ্চ শিক্ষিতা ও বিবাহিতা। তাঁহার জ্যেষ্ঠ জামাতা বিক্রমপুর জৈনসার গ্রাম নিবাসী ডক্টর শচীন্দ্রকুমার দত্ত গুপ্ত, ক্যাম্ব্রিজের L. L. M. ও

অন্যান্য উচ্চ উপাধিধারী। বর্ত্তমানে গভমের্ণ্টের উচ্চ রাজপদে অধিষ্ঠিত আছেন। দ্বিতীয় জামাতা শ্রীযুক্ত অবনীকুমার গুপ্তও বিক্রমপুর বড়াইল গ্রাম নিবাসী Chartered Accountant. তৃতীয় জামাতা ফরিদপুর জিলার ডক্টর ইন্দ্রলাল সরকার এম. বি. ডি. পি. এইচ., কনিষ্ঠ জামাতা ফরিদপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ দাশ গুপ্ত এম. এ.। শচীন্দ্রবাবু কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের একজন প্রতিভাবান্ ছাত্র ছিলেন। প্রতিযোগী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ডাক-বিভাগের সুপারিণ্টেডেণ্ট পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, উপস্থিত ইনি উক্ত বিভাগের এক উচ্চ পদে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছেন।

অবিনাশচন্দ্র পুত্র-কন্যা, পৌত্র-পৌত্রী, দৌহিত্র-দৌহিত্রী সম্বলিত আনন্দ-কোলাহলপূর্ণ সংসারের সর্ব্বময়কর্ত্তা ছিলেন। শিক্ষিত বিনয়ী পরিবারের সর্ব্বাধিনায়করূপে তিনি কি বাহিরে, কি ঘরে সুপ্রতিষ্ঠিত নেতা ছিলেন।

সন্তানগণের শিক্ষার প্রতি তাঁহার কিরূপ অনুরাগ ছিল এবং কিরূপভাবে তিনি সেদিকে সর্ব্বতোভাবে লক্ষ্য রাখিতেন, তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র অমিয় ও দ্বিতীয় পুত্র নেরুর নিকট লিখিত যে পত্রখানি এখানে প্রকাশ করিলাম তাহা হইতেই উহা হৃদয়ঙ্গম হইবে।

Shillong
5. 11. '17.

My dear Amiya & Neru,

I hope you are making the best use of your holidays and trying your best to make up your deficiency in all subjects, so that after the vacation you may join your class as a good boy. If you give undivided attention to

your studies you will shortly find that it is hardly difficult to learn one's lessons. You know very well that a good and honest boy is not only liked by his parents but by every one of his friend and relations, and you will henceforth make it a point to please us all.

I understand you had fine weather last week, and I hope you made the best use of the same. If Sudhindra is thinking of coming down soon you may all come together. But as he had no loss of study before the holidays as both of you had owing to illness, I think he can remain there till the end of his holidays.

You must have heard that Dhiru has passed I. A. in the 2nd division and Paresh the Matriculation in the 1st division. The latter has got a chance of getting a scholarship. I am indeed very glad that I have got a good return for my money spent on them. It will be for you to show even better results and not to disappoint us.

With love to you both and Sudhindra who I believe is fully enjoying his holidays, and making himself fit for the hard work before him. Please write to me separately and let me know when you are coming down.

Your affectionate

Father.

শিক্ষার প্রতি তাঁহার যে কিরূপ অনুরাগ ছিল এই একখানি চিঠি হইতেই তাহা বুঝিতে পারা যায়, এইরূপ বহু পত্র তাঁহার রহিয়াছে।

শ্রীযুক্ত অমিয়কুমার সেনের পুত্র অবিনাশচন্দ্রের পৌত্র শ্রীমান্ প্রবীরকুমার সেন (Mr. P. Sen) ভারতীয় টেষ্ট খেলোয়াড় হিসাবে অষ্ট্রেলিয়ার দলের সহিত ক্রীকেট খেলিতে গিয়া সেখানে অসাধারণ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন, সেজন্য তিনি অত্যন্ত গৌরববোধ করিতেন এবং অষ্ট্রেলিয়ার সিড্নী সহরে তাঁহার প্রশংসার কথা শুনিয়া পিতামহ অবিনাশচন্দ্র যে উৎসাহব্যঞ্জক পত্র লিখিয়াছিলেন, উহাই তাঁহার শেষ পত্র, প্রবীরের নিকট হইতে সে পত্রের উত্তর পাইবার পূর্ব্বেই অবিনাশচন্দ্র সাধনোচিত ধামে প্রয়াণ করেন।

একাদশ অধ্যায়

আমরা যে কর্ম্মবীরের জীবন-কথা বিভিন্ন দিক্ দিয়া আলোচনা করিলাম, এইবার তাহার পরিসমাপ্তি করিতেছি। মানুষের জীবন—নশ্বর জীবন। জীবনধারণ করিলেই মৃত্যুকে বরণ করিতে হইবে। বিধাতার এই বিধানের বিরুদ্ধে কাহারও সাধ্য নাই যে অতিক্রম করিতে পারে। কবি সত্যই বলিয়াছেন :

'জন্মিলে মরিতে হবে,
অমর কে কোথা কবে,
চির স্থির কবে নীর হায়রে জীবন নদে!'

আমরা সম্পূর্ণ আকস্মিকভাবে তাঁহার মৃত্যুর কয়েক দিন পরে সুদূর পল্লীগ্রামে সংবাদপত্র পড়িয়া জানিতে পারিলাম—মহাপ্রাণ অবিনাশচন্দ্র পরপারে চলিয়া গিয়াছেন! এ-সংবাদে হৃদয়ে যে কিরূপ আঘাত লাগিয়াছিল তাহা বর্ণনীয় নহে।

তাঁহার শেষ দিনের কথা, আমার বিশেষ অনুরোধে অশ্রুভরা নয়নে শ্রীযুক্তা গিরিবালা দেবী যাহা লিখিয়া দিয়াছেন তাহা পড়িলে চোখের সম্মুখে এক শোক-দৃশ্য আসিয়া উপস্থিত হয়। এই মহাপ্রাণ মহাপুরুষের মৃত্যু-কাহিনী তাঁহার লেখা হইতেই সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিলাম।

মহাপ্রয়াণ

আজ ৪॥ সাড়ে চার মাস অতীত হয়েছে তিনি তাঁর অতিপ্রিয় সংসার-ধাম ছেড়ে চলে গিয়েছেন। এ-পর্য্যন্ত আমি কলম ধরতে পারি নাই। আমার অন্তরে একবারে অর্গল আঁটা। একটি কথাও মনে আসে নাই। আজ সুহৃদবর শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্তের বিশেষ অনুরোধে কলম ধরলাম ; জানি না কি লিখব।

৫।৪।৪৮

যখনই দুঃখ করতেন "আমি আর বাঁচলাম না গো"। আমি বলতাম, তোমার কিসের দুঃখ ? দুঃখ যদি থাকে তবে আমার জন্যেই থাকবে। তিনি বলতেন, "আমার যে তোমাদের ছেড়ে যেতে ইচ্ছা করে না"। এত অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাঁকে ছেড়ে যেতে হলো। বোধ হয় নোটীশ দিয়ে নিলে তিনি ব্যথা পাবেন, তাই বিশ্বমাতা তাঁর প্রিয় সন্তানকে খেলা দিতে দিতে "স্তন হইতে স্তনান্তরে" নিয়ে গেলেন। এরূপ মৃত্যু দেবতাদেরও কাম্য। তিনি সর্ব্বদা ইহাই কামনা করতেন। কাহারো কাছ থেকে সেবা নেওয়াকে অন্তরের সহিত ঘৃণা করতেন। বিছানায় পড়ে থেকে যেন কাহারো গলগ্রহ না হই ইহাই দৃঢ় মনের একান্ত সাধনা ছিল। মনের জোরে রোগকে দূরে সরিয়ে রেখেছিলেন। এই দীর্ঘ জীবনে শরীরে একটা সূইয়ের ঘা পড়ে নাই। এই নব বিজ্ঞান-সম্মত-যুগে এই দেহে একটি Injection পড়ে নাই বা ফোঁড়া কাটা উপলক্ষে ও অস্ত্রাঘাত পড়ে নাই। Dr. Senকে বলতেন, শেষকালে না জানি আপনারা কত ফুড়বেন। সব আতঙ্ক হতে অব্যাহতি দিলেন বিধাতা। শেষ দৃশ্য আমার চোখের সামনে ভাস্‌ছে। আমার

হৃদয়ের দৃশ্য ভাষায় প্রকাশ করতে পারি, সেই সাধ্য আমার নাই। কে-ই বা বুঝবে—কাকেই বা বলব। কাঁদবার স্থানও নাই। ভাইদাদা পর্য্যন্ত আগেই চলে গিয়ে সেখানে বন্ধুর প্রতীক্ষায় সপ্তাহ ধরে অপেক্ষা করছিলেন। দেখেই বোধ হয় বলেছিলেন আ-রে শত্রু! তুই আবার এখানে কোথেকে। এমন আশ্চর্য্য ব্যাপারও আর শুনেছি বলে মনে পড়ে না। কেউ কারো শোক-বার্ত্তা শ্রবণ করলেন না।

৮ই নবেম্বর সতীশ গেলো; সেই খবর তিনি পেয়েছিলেন। ৯ই নবেম্বর দাদা গেলেন। আমি সেই খবর ১৫ই দুপুরে পাই এবং তাঁকে বলব না বলে স্থির করি, ১৬ই সকালে ত তিনিই চলে গেলেন।

বৃহস্পতিবার সকালে বেড়িয়ে এসে, আমার পিঠে হাত দিয়ে বললেন, "আমি আর বাঁচলাম না গো"! আমি তখন আমার সদ্য-বিধবা বোন্ শৈলকে চিঠিখানি লিখে শেষ করেছি বোধ হয়। চেয়ার ছেড়ে ওঠে কাছে দাঁড়ালাম। জিজ্ঞাসা করলাম কি হয়েছে? বল্লেন শরীরটা আজ বড় খারাপ লাগছে, হার্টের কাছে একটা ব্যথা বোধ করছি। আমি বললাম, তুমি এত বেলায় বেড়াতে যাও, কত বারণ করি, এই ১১টায় রোদে শরীর খারাপ করে; আমি ত ৯টার রোদই সহ্য করতে পারি না। ৯টায় গিয়ে ফিরবার সময় গাড়ীতে আসতে বলি তাও কর না। বল্লেন রূপনাকে বলেছি Capt. Royকে আনতে। এই বলে গিয়ে নিজের বিছানায় শুলেন। আমি ঘুরে ফিরে জিজ্ঞাসা করলাম, রূপন কি গেছে ডাক্তারের কাছে? আমি ত তাকে বাড়ীতে দেখছি না। বল্লেন কি জানি, বলেছি ত

যেতে। একটু পরেই দেখি রূপন গাড়ী করে ডাক্তার নিয়ে এলো। দেখেই আমার মনে ঘা লাগলো। তা হলে শরীরটা কিছু বেশীই খারাপ হ'য়েছে। যে মানুষকে ঠেলে ডাক্তার দেখানো যায় না; তিনি যে একেবারে গাড়ী পাঠিয়ে দিলেন; মনে হলো ব্যাপার সোজা নয়।

ডাক্তার দেখে বল্লেন, আপনার পেটে বড্ড wind হয়েছে; এরূপ ত আগে, কখনও দেখি নাই। সেই জন্যই হার্টে অসোয়াস্তি বোধ করছেন। জিজ্ঞাসা করলেন কেমন লাগে? ব্যথা ও না যন্ত্রণাও না একটা অসোয়াস্তি বোধ করছি। আমি বললাম Blood pressureটা দেখুন? বললেন আমি ত যন্ত্র আনি নাই! আমি বললাম ওঁকে দেখতে এসেছেন, যন্ত্র আনেন নাই ত কি দেখবেন? তিনি বল্লেন যন্ত্রটা অন্য জনে নিয়ে গেছে, বাড়ীতে নাই; তাই আমি রূপনকে জিজ্ঞাসা করলাম কাকে দেখতে যাবো? বড় সাহেবকে? সে বলল "সাব ত আ ভি ঘুমকে আয়া।" আমি বললাম, সকালে আবার গাড়ী করেই যান, গিয়ে তাড়াতাড়ি যন্ত্রটা নিয়ে আসুন। তাই হলো কিছুক্ষণ পরেই ফিরে এসে দেখে বল্লেন, হাঁ? রক্তের চাপ একটু বেশীই আছে, তবে আপনার পক্ষে খুব বেশী নয়। পেট ফাঁপার ঔষধ ও লঘু পথ্যের ব্যবস্থা করে ডাক্তার চলে গেলেন। শুইয়ে থাকতেও বল্লেন না। কেবল আজ আর বিকালে বেড়াতে যাবেন না বললেন। তাই হলো। ১৩ই নবেম্বর বৃহস্পতিবার বিকালে আর বেড়াতে গেলেন না।

শুক্রবার সকালে আমি বেড়িয়ে ফিরছি; দেখি মিঃ

অষ্ট্রেলিয়ার বিখ্যাত ক্রিকেট খেলোয়াড় ডন ব্র্যাডম্যান ও পৌত্র প্রবীর সেন

মল্লিকএর সঙ্গে উনিও আসছেন। আমাকে দেখে হু'জনেই থামলেন। মিঃ মল্লিক বল্লেন যে এই দেখুন না Mrs. Sen. বারণ করতে করতেও তিনি এতটা চলে এসেছেন; আমি আজ আর তাঁকে আমার বাড়ী নিয়ে যাব না। আপনি তাঁকে সঙ্গে করে নিয়ে যান। উনি ত ঠাট্টা করেই চলেছেন। "আমি বুঝি এমনি ইনভেলিড হলাম যে একজনকে সঙ্গে করে নিয়ে যেতে হবে"। দার্জ্জিলিংএ আমি আগে আগে চলে যেতাম, উনি পেছনে পড়ে থাক্‌তেন; আর এখন তিনি তার শোধ নিচ্ছেন! যাক্ একটু পরেই মিঃ মল্লিকের সঙ্গে বিদায় নিয়ে আমরা বাড়ীমুখো হলাম। তখন ত ভাবি নাই যে এই শেষ!—একসঙ্গে বেড়ানো। উনি ত সর্ব্বদাই একসঙ্গেই বেড়াতে চাইতেন আমিই এড়িয়ে যেতাম। সন্ধ্যার সময় উপাসনা ফেলে তাঁর সঙ্গে ড্রাইভে যেতে চাইতাম না। যেদিন যেতাম সেদিন কত খুশী হতেন।

"দণ্ডে দণ্ডে পলে পলে টুটিছে গরব।
তবু প্রেম কিছুতে না মানে পরাভব"।

চলা সুরু হলো। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, আজ ব্যথা নাই ত? বল্লেন, না। কিছুদুর এসেই বল্লেন এই ত আবার ব্যথা আরম্ভ হয়েছে। আমি বল্লাম তবে তুমি একটু দাঁড়াও আমি বাড়ী গিয়ে গাড়ীটা পাঠিয়ে দেই। বল্লেন না! এ আবার হাঁটা নাকি? এই ত গড়িয়ে গড়িয়ে চল্‌ছি। আস্তে আস্তে বেশ ত হেঁটে হেঁটে চল্‌ছি। কত কথা বলে যাচ্ছেন। সংসারের কথা। দুর্দ্দিন পৃথিবীতে ক্রমেই ঘনিয়ে আসছে এসব

কথা। যুদ্ধের আরম্ভ থেকে ত পৃথিবীতে শৃঙ্খলার কোন বালাই নাই। মানুষের অশান্তিরও শেষ নাই।

তারপর স্নান আহারের পর বিকাল বেলা কলকাতা আসার পরামর্শ চলতে লাগল। উনি ত জিদ্ ধরে বসলেন মোটরে আসবেন। ছেলেরা ও জিদ ধরেছে কিছুতেই মোটরে আসতে দিবে না। সন্ধ্যার সময় নেরু গিয়ে ডাক্তার নিয়ে এলো এবং সারা রাস্তা বুঝিয়ে আনল যেন তিনি কিছুতেই মোটরে আসতে Allow না করেন। ডাক্তার বলেছিলেন যে তিনি ভালই আছেন; Heartএর কোন দোষ ত পাচ্ছি না; যেতে চান, যান না মোটরে। নেরু বল্লো না, তা আপনি কিছুতেই রাজি হবেন না। তাদের চলে আসবার কথা; কিন্তু এই অবস্থায় আমাদের একা রেখে তারা এখন কিছুতেই আসবে না। সে জন্যে দিন পিছিয়ে দিল। শুক্রবার রাত্রে ডাক্তার আসলেন, দেখে বললেন ভালই ত আছেন। Pressureও কমে গেছে। কলকাতা আসবার সম্বন্ধে কথা-বার্ত্তা হচ্ছে। তিনি জেদ্ ধরলেন মোটরে আসবেন, ডাক্তার বললেন, না ট্রেনেই যান। বল্লেন কেন? এই ত বল্‌ছেন আমি ভাল আছি; Heartএ কোন দোষ নেই তবুও মোটরে যেতে দিচ্ছেন না কেন? স্থির হলো ট্রেণে আসা; তখন বললেন তবে অনিলকে আসতে বল; সে এসে ট্রেনে নিয়ে যাবে; তোমরা মোটরে যাও। অনিলকে টেলিগ্রাফ্ করা হবে, কি লিখা হবে তাই নিয়ে অমিয়, নেরু মিলে কথাবার্ত্তা বলছে; উনি বল্লেন লিখে দাও না "Father wants you" "তবেই ত সব চুকে যায়; নতুবা সে মনে করবে, তারা দু'জন ওখানে রয়েছে আবার আমাকে নিয়ে টানাটানি করছে।"

অনিলকে প্রথমে পোষ্টআফিশ থেকে টেলিফোন করা হবে, না পেলে টেলিগ্রাফ করা হবে স্থির হলো এবং নেরু ডাক্তারের সঙ্গেই বের হয়ে পড়লো। আমাদের Phoneটা ভাল কাজ দিচ্ছিল না। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় যে শেষ কাজের সময় সে মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় কাজ দিয়েছিলো।

নেরু চলে গেলো, আমরা সকলে খেতে বসেছি; তখন আবার তাঁর অসোয়াস্তি; "নেরু কেন গেলো, Phone পেতে কত দেরী হবে; তার ৮॥টার মধ্যে খেয়ে অভ্যেস; শরীরটা তার ভাল নেই" এই সব বলতে বলতেই নেরু এসে উপস্থিত। আমি মনে করলাম Phone পায় নাই। কিন্তু জিজ্ঞাসা করাতে বলল যে অত অল্পক্ষণের মধ্যেই পেয়ে গেলাম, অনিল বাড়ী ছিল না; মিনুকে পেয়েছি, এবং সব বলে দিয়েছি। অনিল কাল সকালে তুফান মেলে রওয়ানা হয়ে সন্ধ্যার সময় আসবে।

অনিলের জন্যে শনিবার বিকালে গাড়ী যাবে কিনা সে সব কথা হচ্ছে। উনি বল্লেন আস্‌বে কিনা ঠিক্ নেই। নেরু বল্লে ঠিক্ আস্‌বে, তুমি ব্যস্ত হয়ো না। অনিলকে যে Phoneএ পাওয়া যায় নাই; তার সঙ্গে কথা হয় নাই, সেই অনিশ্চয়তাই তাঁর মনে জাগছিল।

শনিবার সকালে উঠে, নিয়মিতভাবে চা ইত্যাদি খাওয়া শেষ করে, বড় কৌচের উপর গায়ে মাথায় শাল মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছেন। দেখে আমার ভাল লাগলো না। এমন নিস্তেজ ভাব জীবনে দেখি নাই। কাকেও এইরূপ নিষ্প্রভ দেখলে কত ঠাট্টা করতেন, এই সব আমার মনে হতে লাগল এবং প্রাণে

আঘাত দিতে লাগল। মনে হতে লাগল জীবন-দীপ নির্ব্বাপিত হয়ে আসছে; কিন্তু ভাবি নাই যে এত শীঘ্রই ফুরিয়ে যাবে।

একটু পরেই মিঃ মল্লিক আসলেন এবং তাঁর সঙ্গে বেশ স্বাভাবিক ভাবেই আলাপ করতে লাগলেন দেখে আমি বেশ খুসী হলাম। তারপর একে একে আরও লোক আসল তাদের সঙ্গেও বেশ আলাপ করলেন। ভূতাদের জ্ঞাতি একজন সেখানে আছেন। এবার তার সঙ্গে দেখা হয় নাই বলে অস্থির হয়ে তার সন্ধানে একদিন নিজেই গিয়েছিলেন। তার ছেলে আশু দত্ত রায় তখন এসেছিলো।

সে সম্প্রতি দিল্লি থেকে এসেছে। রেণু বলে দিয়েছে, আমার বাবা মায়ের সঙ্গে গিয়ে দেখা করে আমাদের কুশল বার্ত্তা দিবেন। তার সঙ্গে অনেক আলাপ করলেন। আমাকে ডেকে নিয়ে পরিচয় করিয়ে দিলেন। তাকে বার বার বলছিলেন; তোমার বাবার সঙ্গে আর আমার দেখা হলো না। সে বল্লে কেন? বাবার একটা অপারেশন হয়েছে, তাই তিনি এখন আসতে পারলেন না। আবার আসলে দেখা হবে। বল্লেন না, আমার বয়স হয়েছে; আর দেখা হবে না। সে কত বল্লে বয়স হয়েছে তাতে কি? আপনি বেশ ভাল আছেন। তখন সে কিম্বা আমরা কেহ মনে করি নি যে আগামী কাল এই সময়ই তাকে আবার আসতে হবে; নিতান্ত ভগ্ন-হৃদয় নিয়ে।

তারা সব চলে যাওয়ার পর ডাক্তার আসলেন। দেখে ভালই বল্লেন। অমিয় বলল, আপনি আবার সন্ধ্যার সময়

আসবেন। তিনি বললেন, ভালই ত আছেন আর কেন আসব। অমিয়কে ডাক্তার বললেন—দরকার হলে খবর দিবেন।

সেই শনিবার দুপুরে ভাইদাদার মৃত্যুসংবাদ পেলাম। তাঁকে জানাবোনা ঠিক্ করে বুকে পাথর চাপা দিয়ে দিন কাটাচ্ছি। তখনও ভাবি নাই যে এই শেষ রজনী!!!

আর কি লিখব? লিখ্‌তে ত আর পাচ্ছিনা! রবিবারে প্রভাত-সূর্য্য যে তীক্ষ্ন তীরের মত আমার বুকে বিদ্ধ হল, তা কি করে লিখব? আমার ৫৬ বৎসরের সুখের স্বপ্ন ভেঙ্গে দিয়ে, সে যে রুদ্র-মূর্ত্তিতে আজ আমার সাম্‌নে দাঁড়ালো এযে আমার একান্ত অপরিচিত। তাহার এই কঠোর মূর্ত্তির সঙ্গে ত আমার কখনো পরিচয় ছিল না। দুঃখের আঘাত সংসারে অনেক এসেছে, শান্তির স্থান ও ত ছিল!!!

সকাল ৭টা ৩৫ মিনিট।

গত ১৯৪৭ সালের ১৬ই নবেম্বর রবিবার সকাল ৭টা ৩৫ মিনিটের সময় তিনি নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করে স্বর্গধামে চলে গিয়েছেন।

আমার চিরদিনই অভ্যাস ভোর ৪টায় উঠে তাঁর ঘর ছেড়ে আমার নিজের ঘরে আসি এবং মুখ হাত ধুয়ে উপাসনায় বসি। এই ক'দিন তাঁর শরীরটা অসুস্থ থাকায় আমি তত ভোরে তাঁকে একা ফেলে আসি না। কিন্তু শনিবার দাদার মৃত্যু খবরে বুকে যে পাথর চাপা রয়েছে তাহার ভার একটু না নামিয়ে আর পারছিলাম না। ভোর ৪টায় আমার ঘরে এসে মুখ হাত ধুইয়ে যখন উপাসনায় বসি তখন ৫টা। ৫টা থেকে ৭টা পর্য্যন্ত প্রাণভরে ভগবানকে ডাকলাম, কিন্তু

আলো দেখতে পেলাম না। বললাম, ভগবান আমাকে আরও বিপদের সম্মুখীন হতে হবে, বুঝতে পারছি; কিন্তু আমাকে শক্তি দিও। দুর্ব্বল করো না; অক্ষম করো না। তোমার আদেশ যেন বহন করতে পারি সেই শক্তি তোমার কাছে ভিক্ষা চাই !!! এই বলে প্রার্থনা শেষ করেই তাঁর কাছে আসলাম। কিন্তু ভাবি নাই যে আধ ঘণ্টার মধ্যেই আমার সর্ব্বনাশ হবে।

তিনি সকালে উঠে ঠাণ্ডা জল খেয়েছেন, ত্রিফলার জল খেয়েছেন এবং একটু বাড়ীতে বাহিরে বেড়িয়ে এসে চা পান করে গুড়গুড়ি খাচ্ছেন। আমি এসে জিজ্ঞাসা করলাম, কেমন আছ? বল্লেন ভাল না। কাল ও রা'ত ৩॥ টায় ঘুম ভেঙ্গে গেছে। আমি বল্লাম ৪টায় ত রোজই ভাঙ্গে আজ না হয় আধ ঘণ্টা আগেই ভেঙ্গেছে; ব্যথাটা কেমন আছে? বাঁ দিকে হাত দিয়ে বল্লেন, সেই রকমই ত আছে। আমি বল্লাম বাড়েনিত? বল্লেন, না। বল্লেন, কাল যাওয়া ত? আমি বল্লাম হাঁ? সব ঠিক হয়েছে ত? আমি বল্লাম হচ্ছে, হবে। এই বলে আমি চা খেতে চলে গেলাম। চা খেয়ে মুখ ধুইয়ে দুখানি চিঠি লিখে, (একখানি রেণুকে ও একখানি ধীরুকে) Packing করতে লাগবো এই ভেবে চেয়ারখানি টান দিয়ে চিঠি লিখতে বসতে যাবো, তখনই মনে কেন হলো যে আবার দেখে আসি। আবার এসে দেখি তিনি কৌচ থেকে পাশের বড় চেয়ারে বসে লেবুর রসে সোডা মিশিয়ে ডান হাতে ঘাঁটছেন এবং বাঁ হাতে গুড়গুড়ির নল। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, তুমি চা খেয়েছো? ২।৩ বার জিজ্ঞাসা করাতে বললেন খেয়েছি ত; এত ত কম খাই তবুও ত ভাল থাকি না। আমি বল্লাম, এত

কম খাও কেন? Windএর মধ্যে এত কম খাওয়া ত ভাল না। বল্লেন কোথায় কম খেলাম, কাল ত ভাত ভাল্লই খেয়েছিলাম। আমি একটু পাশে দাঁড়িয়ে আছি; ছাড়তে কেমন মনটা সরছে না, অথচ যেতে হবে। একটু পরেই বল্লেন "আজ কিন্তু আমার শরীরটা বড়ই খারাপ।" এই কথা বলতেই আমি পাশের চেয়ারে বসে পড়লাম; এবং বল্লাম তবে কি করবো? ডাক্তারের জন্ত গাড়ী পাঠাবো? বল্লেন আর ডাক্তার কি করবে। লেবুর রস খাচ্ছেন; একটু পরেই ডান হাতখানি আমার দিকে মেলে দিয়ে—মা! মা! মা! তিনবার ডাক দিয়েই চোখ উল্টে গেলো, মাথা চেয়ারে ঢলে পড়লো। আমি কিগো! কিগো! বলে বুকে সাপটে ধরলাম, অমিয় কি বাবা! কি বাবা! বলে খাবার ঘর থেকে বের হয়ে এলো, এদিক থেকে শোবার ঘর থেকে বেয়ারা বের হয়ে এলো। অমিয়র ডাক বোধ হয় কাণে গিয়েছিলো একবার তার দিকে তাকালেন, তখনি সব শেষ হয়ে গেলো!!!

চারিদিকে ডাক হাঁক পড়ে গেলো। অনিল-অনিল ডাক পড়লো; অনিল ছিল বাথরুমে, সে বেরিয়ে এলো। ওষুধ, ডাক্তার আর কার কি? অমিয় গাড়ী নিয়ে ডাক্তারের জন্যে চলে গেলো। নেরু ১০ মিনিট আগে বেড়াতে বের হয়ে গিয়েছিলো। সে বল্ল আমি এই বাবাকে দেখে গেলাম তামাক খাচ্ছেন!!! এখন আর লিখতে পারছি না!!!

"যাও রে অনন্তধামে মোহ মায়া পাসরি,
যায় যেথা দানব্রত, সত্যব্রত পুণ্যবান।"

আজ ৫ মাস পূর্ণ হলো। আবার কলম ধরলাম। আধ

ঘণ্টার মধ্যে চারিদিকে হৈ-চৈ পড়ে গেলো। মণি Mr. Mallickকে Phone করে দিল; আপনি গাড়ী করে এখুনি আমাদের বাড়ী চলে আসুন। সেদিন Phoneটাও আশ্চর্য্য কাজ করেছিলো। কলকাতায়ও আধ ঘণ্টার মধ্যেই খবর পৌছে গিয়েছিল। হাজারিবাগে চারিদিকে খবর ছড়িয়ে পড়লো। মন্মথবাবু রাঁচি যাবার জন্যে বাসে উঠেছিলেন, খবর পেয়ে তক্ষুনি নেমে পড়লেন এবং আমাদের এখানে আসলেন। তিনি একটু ভগবানের নাম করলেন। তারপর শ্রীযুক্ত রজনী দাস মহাশয় আসলেন, তিনিও একটু সুন্দর উপাসনা করলেন। "এই মুহূর্ত্তে যিনি স্ত্রী, পুত্র, পরিবেষ্টিত হয়ে ইহলোকে ছিলেন; মায়ের ডাক পড়বা মাত্রই জীর্ণ বস্ত্রবৎ দেহখানি ছেড়ে মায়ের কোলে চলে গেলেন।" এমন সুন্দরভাবে, বিনা ক্লেশে দেহত্যাগ অতি ভাগ্যবান ও পুণ্যবানের ভাগ্যেই হয়ে থাকে।

সুরথবাবুকে খবর দেওয়া হলো। তিনি আসলেন এবং সব সুবন্দোবস্ত করলেন। বাড়ীতেই রাখা স্থির হলো। আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধবের কোন অভাব হলো না। তাঁর বন্ধু-প্রীতির শেষ নিদর্শন চক্ষে দেখলাম ও অন্তরে অনুভব করলাম। সমস্ত কাজ সুশৃঙ্খলার সঙ্গে তাঁরা সারাদিন অক্লান্ত পরিশ্রমে সুসম্পন্ন করলেন। মন্মথবাবুও সারাদিন ছিলেন। মিঃ মল্লিককে সেদিন সেখান থেকে সরানো গেলো না। ছেলেরা কতবার গিয়ে অনুরোধ করল, আপনি এই রোদে দাঁড়িয়ে থাকবেন না; তা কি তিনি শোনেন! তিনি বল্লেন আজ থাকবো না ত কবে থাকবো?

দুই বন্ধুতে একসঙ্গে বেড়ান, কথাবার্ত্তা গল্পগুজব আমোদ-আহ্লাদে দিন কাটাতেন আজ তাঁর প্রাণের বেদনা অসীম।

হাজারিবাগের কাজ শেষ করে সোমবার রাত্রের ট্রেনে কলিকাতা রওয়ানা হয়ে মঙ্গলবার দুপুরে এসে বাড়ীতে পৌঁছলাম। যে পরিবার দীর্ঘকাল হিমালয়ের আশ্রয়ে লালিত-পালিত, পরিপুষ্ট তাঁহারা আজ নিরাশ্রয় !!! মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়েছে !!! দাঁড়াতে পা কাঁপে; মনে হচ্ছে যেন পায়ের নীচু থেকে পৃথিবী সরে যাচ্ছে !!! যার আদেশে অঙ্গুলি সঙ্কেতে এই বৃহৎ পরিবার চালিত হত; তাদের আজ কথা বলবার স্থান নাই !!!

আত্মীয়স্বজন বন্ধু-বান্ধব সকলেই আমাদের সঙ্গে সম-বেদনাশীল !!! সকলেই আসা যাওয়া করছেন এবং চিঠিপত্র টেলিগ্রামে নিজেদের মর্ম্মবেদনা জ্ঞাপন করছেন। সকলেই একবাক্যে বলছেন আমরা পরম সুহৃদ ও বন্ধু হারালাম। সকলের মুখেই এক কথা; আমাকে অত্যন্ত ভালবাসতেন; অত্যন্ত স্নেহ করতেন !! এত দিন এত পেয়েই যাহা বুঝতে পারি নাই আজ এই শোকের ভিতর দিয়ে সেই বিরাট অন্তরের পরিচয় যেন স্বতঃ বিচ্ছুরিত হয়ে পড়ল। অমিয় ত চীৎকার করে কেঁদে উঠলো; "মা? তিনি যে এত মহৎ ছিলেন তা ত আমি বুঝতে পারি নাই। তাঁর এত উচ্চতা ত আমি এতদিন ধরতে পারি নাই।"

দেশের লোক আত্মীয় স্বজন ও পুরোহিত আনা হলো এবং ১০ দিনে শ্রাদ্ধ-কার্য্য যথারীতি সুসম্পন্ন হয়ে গেল।

দিন যায় কিন্তু প্রাণ আর ফিরে আসে না। আসে; তবে সেই রূপের এত পরিবর্ত্তন হয় যে তাহা সাধারণের বোধগম্য নহে।

ভগবানের উপাসনায় বসলেও যেই মূর্ত্তি আগে চক্ষের সম্মুখে এসে দাঁড়াতেন এবং পূজা না নিয়ে সরতেন না, নশ্বর দেহের সঙ্গে সঙ্গে তিনি কখনো অন্তর হতে বিলুপ্ত হতে পারেন না !!! জীবনে সতত অন্তরে কাছে রাখতে প্রাণ ব্যাকুল ছিল; আজ সেই ব্যাকুলতা দ্বিগুণ হয়ে গেলো। অন্তরে বেদনা আছে; কিন্তু অভাব নাই !!! পরিপূর্ণতা নিয়ে তিনি আমার অন্তর ভরে রয়েছেন !!! তিনি যে আমাদের ছেড়ে যেতে চান নাই !!!

৮ই নবেম্বর সতীশ মারা গেলো। সেই খবর তিনি পেয়েছিলেন। আমি আমার সন্ত-বিধবা বোনকে যে সান্ত্বনাপূর্ণ চিঠি লিখেছিলাম, যতটা মনে আসছে তা লিপিবদ্ধ করতে চেষ্টা করব; কিন্তু তখন ভাবি নাই যে ৮ দিন পরই আমারও এই দিন উপস্থিত হবে !!!

১৭।৪।৪৮

এতদিন চিঠির কথাগুলি সব মনে ছিল, আজ আর মনে করতে পারছি না, তবে এইটুকু মনে আছে :

Girivilla
Hazaribagh Town;
12. 11. 47.

প্রাণের বোন শৈল;

আজ তোমার দারুণ দুঃখের দিন। দীর্ঘ ৫২ বৎসরের জীবন সঙ্গীর বিচ্ছেদ বেদনা অসীম ও অসহনীয়। তুমি

নিষ্ঠাবতী হিন্দু মহিলা; নিশ্চয়ই বিশ্বাস কর যে এই দেহের বিচ্ছেদ কখনো আত্মার বিচ্ছেদ করতে পারে না। যিনি এতদিন সমানে অন্তর-বাহির ঘিরিয়া একনিষ্ঠ দেবতা-রূপে পূজা নিয়ে এসেছেন, তাঁহাকে হারানো সম্ভব নহে। সতীশ দীর্ঘ দিন রোগে ভুগিতেছিল; তাহার দেহ সেই রোগ-যন্ত্রণা হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছে। প্রিয়জনের দুঃখ কষ্টকর এবং সুখ শান্তিদায়ক !!!

আজ বাল্যস্মৃতি আমাকে ঘিরিয়া সেই অতীতকে বর্ত্তমানে পরিণত করিয়া ফেলিয়াছে। সেই পিতা-মাতার স্নেহ-নীড়, সেই তোমাতে আমাতে বালসুলভ চঞ্চলতাময় খেলা, একে একে সব আমার মনে ভাসিয়া উঠিতেছে। ভগবানের দানে আমরা পরম সৌভাগ্যবতী, দীর্ঘ দিনের একত্র বাস ইহার সূচনা করে। জীবনের আরম্ভ গ্রহণে ও শেষ দানে।

পিতা-মাতা-জ্যেঠা খুড়াদের অসীম স্নেহ আমরা দীর্ঘ দিন ভোগ করিয়াছি। দানের ক্ষেত্রে আমাদের স্বল্প পরিসর নহে। আজ ভগবানের আশীর্ব্বাদে আমাদের সন্তানগণ সুপ্রতিষ্ঠিত। ভগবান সকলের কল্যাণ করুন !!! ইতি

আং

বড়দিদি

গণেশ বলেছিলো মাসীমা! কি সুন্দর চিঠিখানি আপনি মাকে লিখিয়াছিলেন। আট দিন পরই এই দুঃখ ছিল?

২।৫।৪৮ ঠিক মনে পড়িতেছে না খুব সম্ভব আমরা ১৪।১০।৪৭ ১৪ই অক্টোবর এখান থেকে মোটরে হাজারিবাগ গিয়াছিলাম। সমু আমাদের সঙ্গে

গিয়াছিল। রূপনকে হাজারিবাগ থেকে আনান হইয়াছিল। নেরু, বুটুন তাহারা আগেই গিয়েছিল। উনি যখন মোটরে কলিকাতা ফিরিবার জন্যে জিদ্ ধরিয়াছিলেন, তখন আমি বলেছিলাম, আসিবার সময় ত ছেলেরা বারণও করে নাই এবং কেউ সঙ্গেও আসে নাই। আমার সঙ্গেইত তোমাকে পাঠিয়েছিল। তারপর শান্ত হলেন। তবে বিধাতা হাসিতে-ছিলেন। বেয়ারা আমাদের সঙ্গে গিয়েছিল। লেখার ইচ্ছা দমে গেছে তাই আর কিছু পারিতেছি না।

বৃদ্ধ বয়সে অবিনাশচন্দ্র সেন

শেষ অর্ঘ্য

স্বর্গীয় অবিনাশচন্দ্র সেন মহাশয়ের শ্রাদ্ধবাসরে ভক্ত ও গুণমুগ্ধদের শ্রদ্ধানিবেদন

স্বর্গীয় অবিনাশচন্দ্র সেন মহাশয় ত্রিপুরা জেলার অন্তর্গত চুন্টা নামক একটী বর্দ্ধিষ্ণু গ্রামের একটী সম্মানিত বৈদ্য বংশের সন্তান। তাঁহার পিতা স্বর্গীয় কৃষ্ণমোহন সেন একজন সরকারী কর্ম্মচারী হিসাবে নোয়াখালিতে নিযুক্ত থাকা কালে সেই স্থানে বিগত ১৮৬৯ সালে অবিনাশচন্দ্রের জন্ম হয়। অবিনাশচন্দ্রের পিতা 'বড়লোক' না হইলেও তাঁহার পরিবার-বর্গকে মোটামুটিরূপ সুখ-স্বচ্ছন্দ্যে রাখার মত তাঁহার অর্থসঙ্গতি ছিল। কিন্তু পিতামাতার সান্নিধ্য এবং স্নেহ ভালবাসা ভোগ করিবার সৌভাগ্য অবিনাশচন্দ্রের হয় নাই। তাঁহার প্রথম জীবনের অবস্থা তিনি নিজেই অতি করুণভাবে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন—"আমার ন্যায় দুর্ভাগ্য অতি অল্প লোকের জীবনেই হইয়া থাকে। আমার বয়স যখন দশ মাস মাত্র সেই সময়ে আমি স্নেহময়ী জননীকে হারাই। মাতৃস্নেহ লাভ আমার ভাগ্যে ঘটে নাই। তারপর আমার বয়স যখন বারো বৎসর সেই সময়ে আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মৃত্যু হয়। কৈশোরের এই গুরু ব্যথা ভুলিবার পূর্ব্বেই ষোল বৎসর বয়সে আমাকে পিতৃহীন হইতে হইয়াছিল। আমার বাল্যে ও কৈশোরে, পৃথিবীতে আপনার প্রিয়জন বলিতে যাঁহাদিগকে বুঝাইয়া থাকে, তাঁহাদের আমি হারাইয়াছিলাম। ষোল বৎসর বয়স্ক এই

তরুণের নিকট এই অসহায় অবস্থা ও গুরুতর অর্থকৃচ্ছ্রতা চতুর্দ্দিকে বিপদের কালো মেঘই ঘনীভূত করিয়া তুলিয়াছিল।

এই সমস্ত দুর্দ্দৈবের সহিত সংগ্রাম করিয়া আমাকে বিদ্যাভ্যাস করিতে হইয়াছিল। কাজেই যৌবনের প্রথম প্রভাতেই আমাকে কলেজ প্রাঙ্গণ হইতে বিদায় গ্রহণ করিতে হয়।"

কিন্তু জনক জননী ও অগ্রজের স্নেহ ভালবাসার বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া জীবনের প্রারম্ভে অবিনাশচন্দ্র নিঃসম্বল অবস্থায় জীবন-সংগ্রামে ঝাঁপাইয়া পড়িতে বাধ্য হইলেও তিনি পরাজয় স্বীকার করিলেন না। বরং সাহসের সহিত এই সংগ্রামের সম্মুখীন হইলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠতাত-শ্বশুর জগৎচন্দ্র দাশ মহাশয় আসাম গবর্ণমেণ্টের অধীনে একজন একষ্ট্রাএসিষ্টেণ্ট কমিশনার ছিলেন। তাঁহার সাহায্যে আসাম গবর্ণমেণ্টের সেটলমেণ্ট বিভাগের অধীনে একটী চাকুরী গ্রহণ করিয়া তিনি স্বপ্রতিষ্ঠ হইবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু তাঁহার ন্যায় শক্তিমান ব্যক্তির কাছে সরকারী চাকুরীর সঙ্কীর্ণ কর্ম্মক্ষেত্র অল্পদিনের মধ্যেই তুচ্ছ বলিয়া প্রতিভাত হইল। তাঁহার নিজের কথায়—"প্রত্যেক মানুষের জীবনেই একটী লক্ষ্য থাকে। আমার জীবনেও একমাত্র কামনা ছিল স্বাধীনভাবে ব্যবসায় ও বাণিজ্য দ্বারা প্রতিষ্ঠা লাভ করিব এবং জীবনের সর্ব্ববিষয়েই স্বাবলম্বন দ্বারা আপনার জীবনকে গড়িয়া তুলিব।" অবিনাশচন্দ্রের এই উচ্চাকাঙ্ক্ষা চরিতার্থের সুযোগও ঘটিল। সরকারী চাকুরী ত্যাগ করিয়া স্বর্গত দুর্গামোহন দাশ মহোদয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র ব্যারিষ্টার সত্যরঞ্জন দাস মহাশয়ের সহিত তিনি ব্যবসায়ে
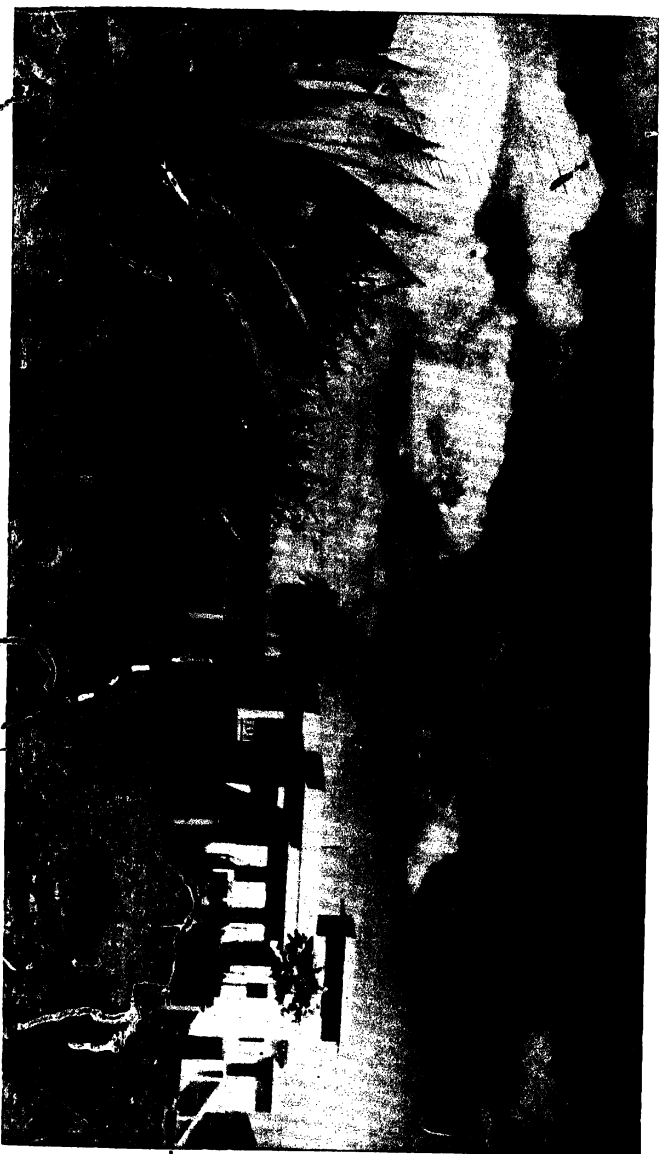
যোগদান করিলেন। অবিনাশচন্দ্রের ব্যবসাজীবনের উহাই সূত্রপাত। এই সূত্র ধরিয়া অবিনাশচন্দ্র কি ভাবে প্রথমে ন্যাশন্যাল এজেন্সী কোম্পানী এবং তৎপর ডি, এম দাস এণ্ড এন্স লিঃর কর্ণধার হইলেন, তাঁহার অনন্যসাধারণ ব্যবসায়-বুদ্ধি ও কর্মকুশলতার গুণে কি ভাবে সমস্ত বাঙ্গালা, বিহার, উড়িষ্যা ও আসামে এম্পায়ার অব ইণ্ডিয়া লাইফ ইনসিউরেন্স কোম্পানীর কর্মক্ষেত্রের প্রসার হইল এবং কি ভাবে তিনি ক্রমে ৬।৭টী লাভজনক চা বাগানের পরিচালনা ভার গ্রহণ করিয়া ব্যবসা ও শিল্পের ক্ষেত্রে অসাধারণ সাফল্য অর্জ্জন করিলেন তাহা বিস্তৃত ভাবে আলোচনার ইহা স্থান নহে। ভবিষ্যতে যিনি বাঙ্গলায় বাঙ্গালীর ব্যবসায়িক প্রচেষ্টার ও ব্যবসায় সাফল্যের ইতিহাস রচনা করিবেন এবং যিনি অবিনাশচন্দ্রের ন্যায় কৃতী বাঙ্গালী ব্যবসায়ীদের জীবনচরিত রচনায় আত্মনিয়োগ করিবেন তিনি উহা বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিবেন সন্দেহ নাই। তবে অবিনাশচন্দ্রের ব্যবসায় সাফল্যের মূল কারণ কি তাহা তিনি নিজেই বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন—"আমার জীবনে যদি কিছু আত্মোন্নতি ও সাফল্য হইয়া থাকে তবে তাহা আমার আজীবন কঠোর সাধনা ও সংযম দ্বারাই সম্ভবপর হইয়াছে। আমি যে বিফলমনোরথ হই নাই তাহার কারণ সৎ ও সাধু সঙ্কল্প লইয়া আমি কর্ত্তব্য কার্য্যে প্রাণ ঢালিয়া দিলাম। আমার বিশ্বাস জীবনের উন্নতির মূলে একান্ত আবশ্যক—ঈশ্বরে বিশ্বাস, সাধুতা কঠোর পরিশ্রম ও সূক্ষ্ম পর্য্যবেক্ষণ শক্তি।"

ভগবদ্বিশ্বাস, সততা, সংযম ও কঠোর পরিশ্রম—উহাই ছিল অবিনাশচন্দ্রের জীবনের মূলমন্ত্র। তাঁহার এই কয়টী

গুণের কথা মনে রাখিলে মানুষ হিসাবে অবিনাশচন্দ্রকে বুঝিতে কষ্ট হয় না। সত্য সত্যই কোটপ্যাণ্ট পরিহিত কৃতী ব্যবসায়ী মিঃ এ সি সেনের অপেক্ষা তাঁহার কলারের নীচে যে অবিনাশচন্দ্র সেন নামক খাঁটী বাঙ্গালী ভদ্রলোকটী ছিলেন, তিনি ছিলেন অনেক বড়, অনেক মহান্। বস্তুতঃ অবিনাশচন্দ্রের জীবনে সততা, সংযম ও কর্ম্মনিষ্ঠার কি অপূর্ব্ব সমন্বয়ই না আমরা দেখিয়াছি। অবিনাশচন্দ্র যে ভাবে বিশিষ্ট ভারতীয় ও অভারতীয়দের শ্রদ্ধা ও আস্থা অর্জ্জন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন আধুনিককালে এরূপ শ্রদ্ধা ও আস্থা অর্জ্জন করিবার সৌভাগ্য কোন বাঙ্গালীর হইয়াছে কি না তাহা আমরা জানি না। অবিনাশচন্দ্র ইচ্ছা করিলে এই শ্রদ্ধা ও আস্থাকে—ইংরাজীতে যাহাকে exploit বলে—তাহা করিয়া অগণিত ব্যবসা ও শিল্পপ্রতিষ্ঠান স্থাপন করতঃ উহার অধিনায়করূপে বহুগুণ অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারিতেন। ব্যাঙ্ক, চটকল, কাপড়ের কল কিছুই তাঁহার ক্ষমতার অতীত ছিল না। কিন্তু পাছে এই ধরণের ব্যবসায়ে তিনি যথোপযুক্ত সময় ও শ্রম বিনিয়োগ করিতে না পারেন, পাছে ব্যবসায়ে ক্ষতি হইয়া অন্যের প্রদত্ত অর্থের অপচয় ঘটে এই ভয়ে তিনি তাঁহার নিজ ব্যবসায়ের অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র গণ্ডী ত্যাগ করিয়া অন্য পথে অগ্রসর হন নাই। ধর্ম্মভীরুতা ও সংযমই তাঁহাকে এই কার্য্য হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিয়াছে। অবিনাশচন্দ্রের জীবনের এই দিকটী বিশেষভাবে অনুধাবন করিবার আজিকার দিনে বাঙ্গালীর একটা বড় প্রয়োজন হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

আরও একটী দিক হইতে আমরা অবিনাশচন্দ্রের জীবনের

একটা বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি করিতে পারি। তিনি ব্যবসায়ে প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছেন এবং উপার্জ্জিত অর্থের একটা উল্লেখ-যোগ্য অংশ জনকল্যাণমূলক কাজে ব্যয়ও করিয়াছেন। কিন্তু স্বোপার্জ্জিত অর্থের সাহায্যে নিজেকে নেতৃত্বের আসনে প্রতিষ্ঠিত করিবার কোন চেষ্টা তিনি করেন নাই। ইচ্ছা করিলে তিনি অনায়াসে কর্পোরেশন কাউন্সিলে প্রবেশ করিতে পারিতেন। কিন্তু খ্যাতিলাভের এই সমস্ত সহজ পন্থা কোনদিন তাঁহাকে আকর্ষণ করে নাই। যে কারণে তিনি অর্থের কাছে বিবেক বিসর্জ্জন দেন নাই ঠিক সেই কারণেই তিনি নামযশের কাঙ্গাল বলিয়া নিজেকে প্রতিপন্ন করেন নাই। তিনি যে বেঙ্গল ন্যাশানাল চেম্বার অব কমার্স, ত্রিপুরা-হিতসাধিনী সভা ইত্যাদির সভাপতি পদে বৃত হইয়াছিলেন উহা তাঁহার চেষ্টালব্ধ ফল নহে। তাঁহার সততা, কর্ম্মকুশলতা ইত্যাদির জন্য আপন শ্রদ্ধাবশেই দেশবাসী তাঁহাকে—সম্ভবতঃ তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে—এই সব পদে বরণ করিয়াছিল। তাঁহার দান ছিল বিস্তর, কিন্তু এই সব দানের কথা সংবাদপত্রে ঘটা করিয়া প্রচার করিবার তিনি বিরোধী ছিলেন। এই সব কারণেই তিনি "নেতা" না হইয়াও অগণিত ব্যক্তির শ্রদ্ধার আসনে সুপ্রতিষ্ঠ হইয়াছিলেন। আজিকার দিনের বাঙ্গলায় কাজ অপেক্ষা কোলাহলের, সেবা অপেক্ষা সেবার বিলাসের প্রাচুর্য্যই বেশী দেখিতেছি। এই সময়ে অবিনাশচন্দ্রের নীরব কর্ম্মনিষ্ঠা ও নিঃস্বার্থ ত্যাগের বিষয় ধ্যান করিলে আমরা উপকৃত হইব।

বঙ্গজন্দ্র যে অবিনাশচন্দ্র মাত্র কয়েকদিন পূর্ব্বে আমাদিকে ত্যাগ করিয়া সকলের নিন্দাস্তুতির উর্দ্ধলোকে চলিয়া গেলেন

তিনি একজন অনন্যসাধারণ ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার চরিত্রের এরূপ একটা বৈশিষ্ট্য ও মাধুর্য্য ছিল এবং তাহা এতই সমুন্নত ও ভাস্বর ছিল যে, অন্য কাহারও সহিত তাঁহার তুলনা করা চলে না। ইংরাজী ভাষায় বলিতে গেলে—He was a type by himself. এমন অমায়িক, মিষ্টভাষী, ধর্ম্মভীরু, কর্ত্তব্যপরায়ণ, সততাসম্পন্ন ও স্নেহপ্রবণ ব্যক্তি আমরা খুব কমই খুঁজিয়া পাই।

হে অবিনাশচন্দ্র, আমরা তোমার আশীর্ব্বাদ কামনা করি। স্বর্গ হইতে তুমি আমাদিগকে কল্যাণের পথে নিয়োজিত কর। তোমার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া আমরা সকলে যেন আমাদের সততা, কর্ম্মনিষ্ঠা, সংযম ইত্যাদির দ্বারা নিজের ও জাতির হিতসাধনে সমর্থ হই তোমার শ্রাদ্ধবাসরে আমাদের উহাই নিবেদন। আমরা তোমার স্বর্গগত আত্মার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিতেছি।

শ্রাদ্ধবাসর ২৬শে নবেম্বর, ১৯৪৭	তোমার গুণমুগ্ধ ও শোকাতুর ব্যক্তিগণ।

শোক জ্ঞাপক চিঠিপত্র

পরিশিষ্ট (ক)

অবিনাশচন্দ্রের মৃত্যুর পর শোক-জ্ঞাপক শত শত চিঠিপত্র তারবার্ত্তা এবং চিঠিপত্রাদি আসিয়াছিল। সে সমুদয় প্রকাশ করিতে গেলে একখানা স্বতন্ত্র পুস্তক হইয়া পড়ে, আমরা এখানে অল্প কয়েকখানি পত্র মাত্র প্রকাশ করিলাম।

২৮।১১।৪৯

৯৩ আপার সারকুলার রোড,

কলিকাতা।

কল্যাণীয়াসু

কতকদিন পূর্ব্ব হইতেই আপনাদের কথা মনে হইতেছিল এবং আপনাদের সঙ্গে কি করিয়া দেখা হয় সে কথা ভাবিতেছিলাম। হঠাৎ দার্জ্জিলিং থেকে ফিরিয়া আসিয়াই আমাদের পরম বন্ধুর পরলোক গমন সংবাদ শুনিয়া স্তম্ভিত হইলাম। আমাদের সহিত তাঁহার অপূর্ব্ব স্নেহময় ব্যবহার, আদর যত্ন দু'জনের প্রতি আকৃষ্ট করিয়াছিল। তাঁহার তিরোধানে নূতন করিয়া বন্ধু ও পরামর্শদাতা হারাইলাম।

আপনাদের সহিত কলিকাতা দেখা হইবার সুযোগ হইতনা কিন্তু হাজারীবাগ আপনাদের বাড়ী আমাদের একটা বড় সহায় ছিল।

আমার অসুখের সময় দিদির অসুখের সময় আপনাদের দুজনের সান্নিধ্যে কত আরাম পাইতাম। আমাদের সেই অকৃত্রিম

বন্ধুকে আর দেখিব না মনে হইলে বড় কষ্ট পাই। আজকাল-কার দিনে তাঁহার মত লোক বিরল। আপনাকে আর কি বলিব।

আপনি ধীর স্থির বুদ্ধিমতী। ভগবান আপনাকে সহ্য শক্তি দিয়াছেন। তিনি পূতচরিত্র ছিলেন তাই কোন কষ্ট না পাইয়া সজ্ঞানে পরম পিতার কোলে আশ্রয় লইলেন। আমার শক্তি নাই যে আপনাকে গিয়া দেখি এবং এই বিষয়ে কথা বলিয়া আপনাকে সান্ত্বনা দেই। তাঁহার অভাবে আপনি হয়ত নিজেকে অসহায় মনে করিতেছেন তবে ইহাও বিশ্বাস করি যে ভগবৎচরণে আপনার অগাধ বিশ্বাস ও তিনি আপনার সহায়।

আপনার গুণমুগ্ধ
শ্রীঅবলা বসু

[অবিনাশচন্দ্রের সহধর্ম্মিণী শ্রীযুক্তা গিরিবালা দেবীকে লিখিত।]

ওঁ

Santinikatan
৮ই অগ্রহায়ণ, ১৩৫৪

ব্যথিত নিবেদন মেতৎ,

শ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণ পত্র এই মাত্র পাইলাম। খবরের কাগজেই এই বার্ত্তা শুনিয়া মর্ম্মাহত হইয়াছিলাম। তোমাদের পিতৃদেবের মৃত্যুতে তোমরাই ক্ষতিগ্রস্ত হও নাই, দেশ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে, আমরা একজন সুহৃৎ হারাইয়াছি।

তাঁহার জন্য প্রতি প্রভাতেই স্মরণ করিতেছি। পরন্তু দূর হইতে বিশেষ ভাবে মনে মনে তাঁহার পারলৌকিকে যোগ দেব। তাঁহার ক্রিয়া সুসম্পন্ন হউক এই প্রার্থনা করি।

সমব্যথী
ক্ষিতিমোহন সেন
T. N. J. College, Bhagalpur.
২০ শে নভেম্বর, ১৯৪৭

[শ্রীযুক্ত অমিয়কুমার সেনকে লিখিত।]

পরম প্রীতিভাজনেষু,

আপনার শ্রদ্ধেয় পিতাঠাকুরের লোকান্তর প্রাপ্তির সংবাদ কাগজে পড়িয়া মর্ম্মাহত হইলাম।

তাঁহার বিয়োগে ব্যক্তিগতভাবে আমি এবং আমাদের পরিবার যে অকৃত্রিম অকুণ্ঠ স্নেহ ও সৌজন্য হইতে বঞ্চিত হইল তাহার তুলনা হয় না। কিন্তু তিনি যে শুধু আত্মীয়-পরিজনের পরম সহায় ও আশ্রয় ছিলেন তা ত নয় তাঁর তিরো-ভাবে ত্রিপুরা তাঁর এক মহাপ্রাণ কর্ম্মবীর সুসন্তান হারাইল। আর সমগ্র বাংলা হারাইল এমন এক স্বাবলম্বী কর্ম্মীর সুদীর্ঘ জীবনের প্রাণবন্ত অভিজ্ঞতা ও আর্থিক জগতে নির্ভীক অভিযানের এমনি এক গরিমময় জীবন্ত দৃষ্টান্ত যার প্রয়োজন আজ দেশের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। তাঁর কীর্ত্তি অবশ্য দেশের অমূল্য ও অক্ষয় সম্পদ হইয়া থাকিল। আর তাঁর কর্ম্মজীবনের কাহিনী হইবে দেশের সকল অভিনব শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের প্রাণ-প্রতিষ্ঠায় মন্ত্রস্বরূপ।

তাঁহার জীবনের সমস্ত কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়া তিনি যথা সময়েই চির শান্তির আলয়ে ফিরিয়া গিয়াছেন কাজেই শোক করিবার কিছুই নাই এদিক থেকে দেখতে গেলে। তবু প্রিয়জন বিয়োগ যে কত মর্ম্মন্তিক তা ভুক্তভোগী ভিন্ন কেউ জানে না। এ বিয়োগে আমার সশ্রদ্ধ সমবেদনা নিবেদন করিতেছি। আপনার শ্রদ্ধেয় মাতাঠাকুরাণীকে আমার সভক্তি প্রণাম জানাইতেছি—ইতি।

আপনাদের

সত্যেন্দ্র

শ্রীশ্রীদুর্গা

সহায়

শ্রীচরণেষু জ্যেঠিমা!

এইমাত্র টুকনুর পত্রে দুঃসংবাদ পাইলাম।

এই চরমতম আঘাত অপ্রত্যাশিত রূপে আসিয়া আমাদের আর একবার স্মরণ করাইয়া দিল যে আমরা কত অসহায়।

আপনাকে আমি আর কি বলিব! শুধু এই কথা মনে হইতেছে যে মরণ সকলের কাছেই আসে কিন্তু এইরূপ দুর্লভ মরণ বোধ করি দেবতারও কাম্য, সাধারণ মানুষের যাহা স্বপ্ন তাহা তিনি পাইয়াছিলেনই—আদর্শ মানুষের যাহা সাধনা তাহাতেও তিনি জয়লাভ করিয়াছিলেন। ধন-জন-গৌরব এইরূপ কয়জন পায়? হয়ত তাহাও কেহ পায় কিন্তু সেই চারিত্রিক মহিমা কোথায় দেখিব?

GIRI VILLA,
HAZARIBAGH TOWN.

[illegible]

শ্রীযুক্ত অখিলবন্ধু দত্ত মহাশয়ের নিকট লিখিত পত্র – বাঙ্গালা হস্তলিপি

TEL HAZARIBAGH 22.

GIRI VILLA.
HAZARIBAGH TOWN.
5th Nov. 1947.

My dear Baby,

You must have received congratulations from every quarter for your great performance at Adelaide in stumping the world's greatest batsman so quickly. I am indeed very glad at this great feat of yours which I learned thro' the Radio the same day.
[illegible] God that you may succeed to
[illegible] perform
[illegible]
of the coming Test matches.

We came here on the appointed day i.e. 17th Oct. & intend to return to Calcutta just 3 weeks after. The weather here is nice & cool & in every respect pleasant. I am feeling much better.

I am sure you are taking advantage of this Tour in improving yourself in every respect, & devoting all your energies to the game. Please remember me to [illegible] & affectionate [illegible] compliments to Pankaj.

With love & blessings — Yours affly Dadu
[signature]

Sri P. Sen, Australia.

পৌত্র প্রবীরকুমারকে পত্র—ইংরাজী হস্তাক্ষর

তাঁহার স্থির গাম্ভীর্য্য, বিরাট ব্যক্তিত্ব এবং অকলঙ্ক শুভ্রতা আমাদের গিরিরাজ হিমালয়ের কথা অনিবার্য্যরূপে স্মরণ করাইয়া দেয়।

শুধু তাহাই নয়, সেই স্নেহশীল পিতৃহৃদয়ই কোথায় দেখিব? আমরা যখন কলিকাতা হইতে আসি তিনি টুকনুর মাথায় হাত রাখিয়া কাঁদিয়া বলিয়াছিলেন, "আর বোধ হয় তোমাকে দেখিব না।" বিরাট পুরুষের সেই হৃদয়োচ্ছ্বাস দেখিয়া, প্রথম অনুভব করিয়াছিলাম যে "বজ্রের মত কঠোর এবং কুসুমের মত কোমল" শুধু কবির কল্পনাতেই থাকেনা।"

ভগবান তাঁহাকে শান্তি দিন। আপনি আমাদের শুধু আশীর্ব্বাদ করুন যেন তাঁহার জীবন হইতে আমরা চিরদিন অনু-প্রেরণা লাভ করি এবং তাঁহার চারিত্রিক স্থৈর্য্য যেন আমাদের জীবনের পথে কখনও পথভ্রষ্ট হইতে না দেয়। ইতি

তাং ২০।১১।৪৭

ক্যাম্প মোরাদাবাদ, স্নেহের—শশাঙ্ক।

শ্রীদুর্গা।

১. ১২. ৪৭

শ্রীযুত বাবু অমিয়কুমার সেন
২৮, ডালহউসী স্কোয়ার,
কলিকাতা।

প্রিয় অমিয় বাবু,

পূর্ণিমার শুভ্র চন্দ্র সম, কীর্ত্তি-দীপ্তিমান্ আপনার পুণ্যশ্লোক পিতা শ্রীযুত বাবু অবিনাশচন্দ্র সেন মহাশয়ের

মৃত্যু যেন বজ্রাঘাত তুল্য। আমরা আশ্রয়হীনতার শূন্যতা বক্ষে অনুভব করিতেছি।

আপনার যশস্বী জনক কত লোকের কত উপকার যে করিয়াছেন তাহার গণনা নাই। 'দানবীর', 'দাতাকর্ণ,'—ইত্যাদি উপযুক্ত বিশেষণ তাঁহার নামের পূর্ব্বে সর্ব্বদাই ব্যবহৃত হইত। কত মেধাবী-দুঃস্থ ছেলেদের বিদ্যার জন্য, কত দরিদ্র কঠিন রোগগ্রস্থ রোগের চিকিৎসার জন্য, কত কন্যার বিবাহের জন্য, কত সহায়হীনা বিধবার সহায় সংস্থানের জন্য—তিনি কত কত অজস্র দান অকুণ্ঠিত চিত্তে করিয়াছেন, তাহার গণনা নাই। Charitable এবং Public institution এর জন্য দানেও তিনি সর্ব্বদা মুক্ত হস্ত ছিলেন। ভাগ্যহীন আমরা।

সেই পুণ্যশ্লোক পিতার উপযুক্ত পুত্রগণ পিতার সম্মান ও পিতার যশ লাভ করেন, শ্রীভগবানের নিকট প্রার্থনা করি।

চুণ্টার লোকের জন্য তাঁহার দ্বার সর্ব্বদা উন্মুক্ত ছিল। আমাদের ভরসা, তাঁহার উপযুক্ত পুত্রগণ তাহা বিস্মৃত হইবেন না।

আপনাকে কি বলিয়া সান্ত্বনা দিব? আমরা নিজেও যে শোকাকুল এবং নিজেদেরে ভাগ্যহীন, আশ্রয়হীন মনে করিয়া হৃদয়ে বেদনাময় শূন্যতা অনুভব করিতেছি।

সান্ত্বনা এই—কীর্ত্তি যাঁহার, তিনি অমর পুণ্যশ্লোক—বাবু অবিনাশচন্দ্র অমর।

তাঁহার আত্মার সদগতির জন্য শ্রীভগবানের শ্রীচরণে প্রার্থনা করি। আপনাদের কল্যাণপ্রার্থী—

অরুণময় সেনগুপ্ত

Aryasthan Insurance Building,
15, Chittaranjan Avenue,
Calcutta-13.
November 17, 1947.

My dear Probodh,

I am shocked to learn from today's newspaper that your illustrious father has suddenly died at Hazaribagh. It is needless for me to recount the cordial relations that I had with him. You also know very well that he was a good patron to me in my activities and his help and guidance has largely contributed to whatever success I have achieved. I hasten to extend to you and other members of the bereaved family my sincere condolence on this death.

Yours sincerely,
(S. C. Roy).

P. K. Sen, Esqr., Bar-at-Law,
3. New Road, Alipore, Calcutta.

In a meeting of the Executive Committee of the Tripura Hitasadhani Sabha held on 18. 11. 47 in the premise of United Press of India, Calcutta, the following resolution was unanimously taken :—

The Executive Committee of the Tripura Hitasadhini Sabha expresses its deep sorrow at the death at Hazaribagh of Mr. A. C. Sen, President of the Sabha for more than 20 years. Having been connected with the Sabha for about half a century Mr. Sen has rendered invaluable services to the Sabha specially for furthering its welfare activities.

Having by started his career as a petty clerk, Mr. Sen rose to a very high position in the business world by honest, devoted and hard work.

Nature's born gentleman, he endeared himself to all by his transparent honesty of purpose and sweetness of temparament.

He was a giver to good causes and since the Swadeshi days he has contributed his mite to many national institutions.

Besides establishing a girls' M. E. School and H. E. School for boys and charitable dispensary in his village home at Chunta, he financed the establishment of an X-Ray aparatus in Comilla Medical Hospital for benifit of the people of his district.

By his death, the district of Tipperah has suffered an irreparable loss and the province of Bengal has lost an worthy son.

The Sabha conveys its sincerest and hearfelt sympathy to Mrs. Sen and the members of the bereaved family.

Sd./- B. Sen Gupta.
Chairman.

10, Sovabazar Street,
Calcutta.
The 17th Novr. 47.

Dear Mr. Sen,

I am extremely grieved to learn from today's News Paper that your revered father died at Hazaribagh. We were known to each other for a pretty long time. I have great respect for him and specially for his business capabilities.

Please accept my sincere condolence at your sad bereavement and convey the same to your revered mother and brothers.

Yours Sincerely,
Jadunath Roy.

A. K. Sen, Esq.,
Alipore.

I9, Strand Road,
Calcutta.
November 19, 1947.

Dear Mr. Sen,

I was very sorry to learn of the sudden death of your father, Mr. Abinash Chandra Sen. I have lost a friend whom I have admired for his amiable and charitable disposition as well as love of the country and the contribution he has made to its industry.

Please accept my heartfelt condolence in your bereavement and convey the other members of the bereaved family.

Yours sincerely,
(Sir Abdul Halim Ghuznavi)

A. K. Sen,.Esq.,
3, New Road; Alipore,
Calcutta-27.

Cossimbazar House
302, Upper Circular Road,
Calcutta.
November 18, 1947.

My dear Mr. Sen,

I am deeply grieved to learn the sad news of the death of your father. Please accept my sincerest condolences in your great bereavement. May the departed soul rest in peace !

A self-made man of great organising abilities the late Mr. Sen's life was an inspiration to many. His loss will be deeply mourned by his countrymen.

Yours sincerely,
S. C. Nandy
Maharaja of Cossimbazar

A. K. Sen, Esqr.,
3, New Road,
Alipore, Calcutta.

3, Upper Wood Street.
Calcutta.
November 18, 1947

My dear Sen,

Will you and your Mother and all the family please accept my deepest sympathy in your great bereavement.

Yours sincerely,
Asoka K. Roy.

A. K. Sen, Esq.,
3 New Road,
Alipore,
Calcutta.

Central Municipal Office :
Calcutta, the 17th Decr.,
1947.

Mrs. A. C. Sen,
3, New Road,
Alipore, Calcutta.

Madam,

I am directed to forward the accompanying copy of a resolution passed by the Corporation at their meeting held on the 10th instant, expressing their deep sense of sorrow at the death of your husband, the late Mr. A. C. Sen.

Yours faithfully,
M. Roy.
Secretary.

BM.
Enclosure.

Central Municipal Office

CORPORATION MEETING :

10th December, 1947,

Resolved :—

(i) That this Corporation places on record its deep sense of sorrow at the death of Mr. Abinash Chandra Sen, who was a prominent Bengali businessman of the City and a philanthropist.

(ii) That a message of condolence be sent to his bereaved family.

M. Roy
Secretary to the Corporation.
17. 12. 47.

SYLVAN LODGE,
Hazaribagh, Novr 24th.

Dear Mr. Sen,

We are in receipt of your thoughtful request to join in the Sradh ceremonies for your dear lamentnd Father and extremely regret our inability to be present.

We may assure Mrs Sen and the family of our deep sympathy, even though it has remained unexpressed. Words convey little in the depth of sorrow that has befallen your household. Though sudden & tragic it was an enviable end to pass out so quietly and peacefully without the long suffering that precedes life's departure. God knows best and it being His Divine will we must resign ourselves to it. It is this thought that should illumine the darkness and blank that overtakes us in the depth of our sorrow. God rest his soul and give Mrs Sen and the family the strength to bear this great loss.

Yours sincerely,
M. Morris.

15, Lansdowne Road,
Calcutta.
17. 11. 47.

My dear Sen,

Kindly accept and convey to your brothers and other members of your family my heartfelt sympathy in your great bereavement. Though your father has past away full of years and honours it can never mitigate the

poignancy of your grief. I hope his life will be a source of inspiration to you all and God will give you strength to follow in his foot-steps and to bear the shock.

With deepest sympathy,

I am,
Yours sincerely,
B. N. Singh-Roy

A. K. Sen, Esq.

Park House,
Jamtara, E. I. R.
18. 11. 1947

My Dear Mr. Sen,

I am very sorry to read in the newspaper to-day about the demise of your revered father. It is an irreparable loss to the business community and a personal loss to his friends. One can never forget his amiable disposition and other qualities. We worked together for a long time in the Bengal National Chamber of Commerce and I keenly fell the loss.

May the departed soul rest in peace.

Yours sincerely,
N. Law

A. K. Sen Esq.
3, New Road,
Alipur, Calcutta.

12, Misson Row,
Calcutta
18th November, 1947

১২/১ডি, গোয়াবাগান ষ্ট্রীট,
কলিকাতা। (৬)
নভেম্বর ১৭।১৯৪৭

অদ্য সংবাদপত্রে শ্রদ্ধেয় অবিনাশবাবুর পরলোকগমনের সংবাদ পাইয়া ব্যথিত হইলাম।

প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দীর পরিচয়ে তাঁহার বিনয়, সাধুতা, উদারতা, কর্ম্মনিষ্ঠা—এই সকল অনন্যসাধারণ গুণে মুগ্ধ ছিলাম।

তোমরা তোমাদিগের এই শোকে আমার সমবেদনা জানিও। ইতি

শুভার্থী
শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

12, Mission Row, Calcutta.
18th. November, 1947

My dear Amiya,

I was shocked to hear of your revered father's death. You know I had high regards for him. With his death greater responsibility falls on you.

I know no amount of condolence will console your mother's and your minds in the irreparable loss you have suffered, and I hope and pray that God will give you strength to bear it.

Yours sincerely,
Biren Mukherjee

A. K. sen, Esq.,
3, New Road,
Alipore, Calcutta.

আগড়তলা
ত্রিপুরারাজ্য
২১।১১।৪৭

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

ত্রিপুরার স্বনামধন্য সুসন্তান ও কর্ম্মবীর আপনার পিতৃদেবতার স্বর্গারোহণের সংবাদ সংবাদপত্রে অবগত হইয়া মর্ম্মাহত হইলাম। তিনি আপনার মত সুসন্তানগণকে জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত দেখিয়া পরিণত বয়সে লোকান্তরিত হইয়াছেন ইহাই একমাত্র সান্ত্বনা। আপনাদের পরমারাধ্যা মাতৃদেবীসহ আপনারা আমার আন্তরিক সমবেদনা গ্রহণ করুন। শ্রীগভবান লোকান্তরিত আত্মার চিরশান্তিবিধান করুন ইহাই সর্ব্বান্তঃকরণে কামনা করি। ইতি। ভবদীয়

শ্রীদ্বিজেন্দ্রচন্দ্র দত্ত

101, Clive Street,
Calcutta
17th November, 1947

My dear Mr. Sen,

Please accept my heartfelt condolences on your sad bereavement and my deepest sympathies in your irreparable loss. I hope you will find some consolation in the thought that the entire community which he served throughout his long life would share your feeling of loss and grief at the passing of such a kind-hearted man and leader of society like your lamented and revered father.

Yours sincerely,
M. Moulick

A. K. Sen, Esq.,
28, Dalhousie Square,
Calcutta.

অবিনাশচন্দ্রের মৃত্যু সংবাদ জানিয়া—শত শত ব্যক্তি শোক-প্রকাশক পত্রাদি প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের লিখিত সমুদয় পত্রাদি প্রকাশ করিতে গেলে, একখানা গ্রন্থ হইয়া পড়ে, সেজন্য অতি অল্প সংখ্যক মাত্র পত্রের সারাংশ প্রকাশ করিতে পারিলাম, ইহা হইতেই বুঝিতে পারা যায়, তিনি কিরূপ জনপ্রিয় ছিলেন, এবং নিজ সহৃদয়তা ও ভালবাসা স্নেহ ও প্রেম দ্বারা কিরূপে শত শত লোকের হৃদয় জয় করিতে পারিয়াছিলেন।

এখানে অবিনাশচন্দ্রের জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীযুত অমিয়কুমার সেন ও তাঁহার মাতার নিকট যাঁহারা শোকজ্ঞাপক পত্রাদি লিখিয়াছিলেন, তাঁহাদের আরও কয়েকজনের নামোল্লেখ করিলাম।

বীরেন গুপ্ত—বার্ণপুর :—His death is a great loss to Bengal and we all mourn his demises. Our heartfelt sympathy and condolence goes to you and to the bereaved family.

অশ্বিনীকুমার চক্রবর্ত্তী—Deputy Director of Food accounts. Govt. of C. P. Berar :—We are deeply mortified to learn that our highly respected and beloved son is no more...... may his soul rest in peace and may you be able to bear his loss.

জে, এন, তালুকদার—এলবার্ট রোড, কলিকাতা :—Nobody will forget him, who has come in contact with him and seen his kind manners and noble bearing.

কালীকচ্ছ পাঠশালার ছাত্র ও শিক্ষকগণ শোক প্রস্তাব করেন। কুমিল্লা জনসাধারণের সভায় গৃহীত দীর্ঘ প্রস্তাবে উল্লিখিত হয় :—His passing away is an irreparable loss to the country. The citizens of Comilla convey their heartfelt condolence to the members of bereaved family.

তাঁহার বাসপল্লী চুণ্টা লাইব্রেরীর একটি বিশেষ সভায় প্রস্তাব গৃহীত হয় যে—অবিনাশচন্দ্রের মৃত্যুতে এই প্রতিষ্ঠানের ও গ্রামের যে ক্ষতি হইল তাহা অপূরণীয়। সভা তাঁহার আত্মার সদ্গতি কামনা করিতেছে ও তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছে।

এস, এস, আলি, সিকিউরিটি হাউস, ক্লাইভ ষ্ট্রীট :—He was indeed a great man, and his death is a loss not only to you, but to the entire Bengali community......please allow me to convey to you and yours brothers and sisters my deepest sympathies.

Indian Insurance Institute, ব্রাহ্মণবাড়িয়া মিউনিসিপালিটি, আর্য্যস্থান ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানী, Calcutta Insurance Limited, Hindusthan Co-operative Insurance Society Limited, চুণ্টা গ্রামের অধিবাসীবৃন্দ, প্রভৃতি বিবিধ সভা-সমিতি ব্যতীত বহু আত্মীয়-স্বজন ও বহু ব্যক্তি শোকজ্ঞাপক পত্র লিখিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে জষ্টিস্ এ, এন, সেন, শ্রীযুক্ত এস, জে, গুপ্ত, ডি, এন, গুপ্ত, শ্রীযুক্ত আর, সি, রায়, ১০১ শোভাবাজার ষ্ট্রীট হইতে শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ রায়, ৯২নং শোভাবাজার ষ্ট্রীট হইতে স্যার হরিশঙ্কর পাল লিখিয়াছেন :—I am extremely sorry to learn from the newspapers about the passing away of your revered father. The gap left by him will be difficult to cover up. Kindly accept my sincere condolence and convey same to others in the family.